তারাশঙ্কর অন্বেষা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

রত্না প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রচ্ছদশিল্পী সোমনাথ ঘোষ

বিক্রয়কেন্দ্র :

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

পুস্তক বিপণি ২৭, বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৭০০০০৯

দে বুক স্টোর ১৩, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

অমুপরঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক রমা প্রকাশনীর পক্ষে ৭৯।৪।২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৫ থেকে প্রকাশিত। পুলিনচন্দ্র বেরা কর্তৃক দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলিকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

স্বর্গতা মাধুরীলতা রায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

আত্মদীপ তারাশঙ্কর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"Douleur, je t'a'ime !
Tristesse. sois mon dia'deme !"

'যন্ত্রণা, তোমাকে আমি ভালবাসি। দুঃখ তুমিই হও আমার রাজমুকুট'—ভিক্তর য্যুগোর এই কথা যেন আজ তারাশঙ্করের অন্তরেরও প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রায় প্রতিটি সাম্প্রতিক রচনায় আজ এই বেদনার বন্দনা, এই যন্ত্রণার অভিষেক তারাশঙ্কর আজ সেই শিল্পলোকে উত্তীর্ণ', যেখানে তিনি আত্মদীপ, নিজের দুঃখ-মহিমার আলোকে একাকী ধ্যানমগ্ন।

সাধারণ রসবোধের মানদণ্ড নিয়ে তাঁর সেই স্বমহিমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে স্বভাবতঃই আজ আমাদের কুণ্ঠা হয়। অন্ততঃ গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি শিল্পসৃষ্টিতে ক্রমশঃ স্পষ্ট রেখায় ব্যক্তিক হয়ে উঠেছেন। যে তারাশঙ্কর "অগ্রদানী", "তিনশূন্যে"র মত গল্পে নিরাসক্ত নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'আগুন,' এমন কি 'ঝড় ও ঝরাপাতা'র মত উপন্যাসেও যাঁর নির্বিকার কঠোর রূপ আমরা দেখেছিলাম, সেই লেখক আজকের অসমাপ্ত 'নব দিগন্ত' কিংবা 'কীর্তিহাটের কড়চা'তেও ব্যক্তিকতার দ্বিতীয় মূর্তিতে উদ্ভাসিত। এবং যদি ভুল বুঝে না থাকি তা হলে য্যুগোর বাণীই তাঁর ধ্রুবপদ : Tristesse Sois mon dia'deme !"

কিন্তু এই পরিণতি কি আকস্মিক ? তারাশঙ্করের চিন্তায় কি সত্যিই কোন মৌল পরিবর্তন ঘটেছে ? একি সেই স্বাভাবিক বয়োধর্ম, যা মানুষকে আত্মমুখ এবং তত্ত্বভিক্ষু করে তোলে ?

দুঃখের মত অনুপ্রেরক সাহিত্যের আর নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক কিংবা ব্যক্তিক—যে কোন বেদনার উৎস থেকেই মহৎ সাহিত্যের আবির্ভাব, বাল্মীকির প্রথম শ্লোক, ট্রয় ধ্বংসের কাহিনী, গ্রীক ট্রাজিডি—সে তালিকা অফুরন্ত। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিস্তৃতিতে লাভ নেই। একালের লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকেই মনে পড়ল। তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলি সেই

স্মৃতিতেই সকরুণ যখন তিনি দেখেছেন তাঁর গ্রাম্য চিকিৎসক পিতৃদেব স্থূল যন্ত্রপাতি দিয়ে অপারেশন করছেন একটি রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক ; প্রথম দেহ চেতনার দিনের সেই সঙ্গিনী—কণ্টকপত্র শয়নে যার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ; নদীতে ছিপ ফেলবার সেই শৈশব—যেখানে বড়শীবিদ্ধ মাছটার যন্ত্রণা তিনিও সমানভাবে আস্বাদন করে চলেছেন। এরই পরিণামে কিলিমন্‌জেরোর তুষার শীর্ষে তাঁর মৃত্যুতীর্থের স্বপ্ন, এর উপসংহারে সমুদ্র-ধীবরের শিকার সেই সার্লেন মাছটির ইতিহাস।

দুঃখ চেতনার প্রথম পর্যায় বাইরের জগতে প্রতিফলিত ; নানা চরিত্র, বিবিধ ঘটনা, বিচিত্র মানুষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিচারে সেই দুঃখের উপস্থাপনা। তখন দেখা নয়, দেখানো। স্রষ্টা তখন নিষ্ঠুর, নৈর্ব্যক্তিক বহির্মুখ। তখন তার নিষ্ঠুরতা ছুরির ফলার মত আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করে। তখন ব্যথিত পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হয়: "আনা কারেনিনার মৃত্যু আমি চাইনি, কিন্তু কী করব—সে যে আমার কথা না শুনেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।"

রেসারেক্‌শন তখনও অনেক দূরে।

তারও সময় আসে। তখন বিচিত্রমুখী দুঃখ আর টুকরো টুকরো ছবির অ্যালবাম থাকে না, একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্রকাহিনীর মত অখণ্ড তাৎপর্য সন্নদ্ধ হয়। লেখক তখন দার্শনিকের সিদ্ধিতে উপনীত হন, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বেদনা যন্ত্রণাকে একটি সমগ্রতার ঐক্যে দেখতে পান। তখন বহির্গামী দুঃখ প্রদর্শন, শিল্পীর অন্তরালোকে দুঃখ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিপূর্ণতা এলে শিল্পী আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেন না। তাঁর অনাসক্তির আবরণ সরে যায়—এতক্ষণ বেলাভূমিতে বসে সমুদ্রের যে তরঙ্গ লীলা দেখে চলেছিলেন, এইবারে আসে তারই অতলে তাঁর আত্মসজ্জনের পালা।

তলস্তয় তাই-ই করেছিলেন, হেমিংওয়ের শেষ পর্যায়েও তাই।

তারাশঙ্কর সম্পর্কেও এই কথাই আমার বারবার মনে পড়েছে। মনে পড়েছে তাঁর অধুনাতন রচনাগুলো সম্পর্কে।

তারাশঙ্কর এসেছিলেন 'কল্লোলে'র কলধ্বনির ভেতর। তখন বুদ্ধিজীবী তরুণ মনের ক্ষোভ-যন্ত্রণা নৈরাশ্য প্রতিবাদ এক নতুন নেতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছে। গ্রামের মানুষ তারাশঙ্কর এই আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন না। সংক্ষিপ্ত একটি সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত করে দেশের দুঃখীজনের

সেবাব্রতের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু সাহিত্য সাধনায় তিনি:ব্রতী। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক সত্তার প্রথম বোধন ঘটল এই কল্লোলীয়দেরই একটি গল্পে। গল্পটির নাম 'পোনাঘাট পেরিয়ে' লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তৎক্ষণাৎ তারাশঙ্কর এই নতুন লেখকদের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ অনুভব করলেন।

সেই সংযোগ কিসের? মুখ্য কল্লোলীয়দের বুদ্ধিবাদী জীবন সমালোচনার? বিদেশী সাহিত্য পঠন পাঠনের উজ্জ্বল মনস্বিতার? সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের?

না, সেখানে নয়। আসলে কল্লোলীয়দের রচনায় জীবনের যে নিষ্ঠুর কঠিনতার উদ্‌ঘাটন ছিল, মানুষের বিড়ম্বিত ব্যর্থতার যে পরিচর্যা ছিল, প্রকৃতি-বাদী দৃষ্টিতে যে অনাবৃত আদিমতার উৎস সন্ধান ছিল, তারাশঙ্কর সেইখানেই সত্যিকারের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। দুঃখচেতনাই ছিল এই সহমর্মিতার নিগূঢ়তম কারণ।

তবু তারাশঙ্কর কল্লোলের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্তই পৌঁছেছিলেন—ভেতরে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে তারাশঙ্কর নিজের স্মৃতিকথায় কিছু লিখেছেন, অচিন্ত্যকুমার তাঁর জনপ্রিয় সুখপাঠ্য বইটিতে তার উত্তরও দিয়েছেন কিন্তু এগুলির সবই বাইরের ব্যাপার। যোগসূত্র যতখানি ছিল, ব্যবধান ছিল তার চাইতেও অনেক বেশী।

তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা, তাঁর জীবন-চিন্তা, তাঁর নিজস্ব পরিবেশ—সবই এই ব্যবধানের হেতুমূল। তিনি তো উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধির মাধ্যমেই তাঁর বক্তব্যে এসে পৌঁছন নি, নৈরাশ্য তাঁর ছিল—কিন্তু গ্রাম-সমাজের সংস্কারে বিশ্বাসে পালিত তারাশঙ্কর নৈরাজ্যকে তখনও মেনে নিতে পারেন না। তাঁর দুঃখ-চেতনা প্রত্যক্ষ রূঢ় অভিজ্ঞতার ফল। অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন আধিব্যাধিতে বিড়ম্বিত পল্লীবাংলার ব্যাপক অবক্ষয়, আদিমতা আর হৃদযাবেগে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের হৃদয়, জ্ঞান-অজ্ঞানকৃত নিরুপায় পাপ এবং তার ওপর বিধাতার নির্মম দণ্ডাঘাত, আর পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত: 'মানুষ নিজের কাছে কী অসহায়, সংসারে কী নিদারুণ বঞ্চনা, হৃদয় কী কঠোর ভাবে অপমানিত, দারিদ্র্য কী ভয়ঙ্কর, মৃত্যু কী ক্ষমাহীন, পাপের জন্য কী করাল দণ্ড সমুদ্যত।' এককথায় তারাশঙ্করের দুঃখবোধ ক্লাসিক লক্ষণাক্রান্ত—তার ব্যাপ্তি যেমন বিরাট, তাঁর উপলব্ধি তেমনি সুদুঃসহ।

'চৈতালী ঘূর্ণি', 'পাষাণপুরী', 'আগুন', 'নীলকণ্ঠ'—দুঃখের পথেই

তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-যাত্রা। আর সেই বিপুল দুঃখের মহিমাকে আশ্রয় করেই বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠার শিলাভিত্তি রচনা করলেন।

'কল্লোলে'র নৈরাজ্যবাদে তারাশঙ্কর অংশীদার হতে পারেন নি, সে-কথা ঠিক। (কিন্তু নিরাশা এবং প্রকৃতিবাদী প্রবণতা তাঁকে বারে বারে বর্ণহীন শূন্যতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তবু তাঁর মধ্যে এর অতিরিক্ত আরও কিছু ছিল; সে হল তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের দীক্ষা, তাঁর সেবাব্রতী সত্তা অর্থ-নৈতিক জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিন্তা-চেতনা।)

এর ফলে তাঁর দুঃখবোধ বিস্তৃততর ক্ষেত্রের সন্ধান পেল। 'ধাত্রীদেবতা' লিখলেন, 'কালিন্দী' লিখলেন, এল 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', দেখা দিল 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা'। দুঃখদহনের কালিন্দী দুঃখবরণের ঔদার্যে তারাশঙ্করের ব্যাপকতর মহত্ত্বকে তুলে ধরল। যন্ত্রণা দেখা দিল দ্বৈতরূপে। রামেশ্বরের আত্মনিগ্রহ আর বসনের বেদনার পাশাপাশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিবনাথ-অহীন্দ্র-সীতারাম পণ্ডিত-নিতাই কবিয়াল; ব্যক্তিদুঃখ আর আত্মবিসর্জনের মহান দুঃখ—"Human agony" আর য়্যুগোর "Douleur" দ্বিস্বরে ঝঙ্কৃত হল।

ধীরে ধীরে আরও বেশী সমাজ-সচেতন এবং রাজনীতি সংসক্ত হয়ে উঠতে লাগল তারাশঙ্করের রচনা। যা তাঁর স্বভাবধর্ম নয়, সেইদিকেই ঘটল পদক্ষেপ। তারাশঙ্কর অ্যাকাডেমিক হতে চাইলেন। আত্মবিরোধ দেখা দিল, তৃপ্তি পেলেন না পরিক্রমা করতে লাগলেন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর আশ্রয়ে ছায়াছত্র সন্ধান করলেন, হয়তো কিছু আশ্রয় পেয়েও থাকবেন, কিন্তু তারাশঙ্করের সমগ্র শিল্পিসত্তা বারবার বলতে লাগল: তবু রাজনীতি চিরদিনই রাজনীতি। অর্থ নৈতিক দুর্গতি হয়তো সে খানিকটা দূর করতে পারে, হয়তো অনেকখানিই পারে, কিন্তু সেইখানেই কি মানুষের সব দুঃখের অবসান? এইভাবেই কি সব বেদনার নিরসন?

অতএব—'আগে কহ আর।'

তখন মনে হল এর শেষ কোথাও নেই।

দেখা গেল, পেছনে ফেলে আসা মানুষগুলোকে আবার নতুন করে মনে পড়ছে। তর্ক-তত্ত্বের জালে, রাজনীতির ভাবনায়, নাগরিকতার অভ্যাসে, তারাশঙ্কর যে সর্বব্যাপী দুঃখের বস্তুতান্ত্রিক সমাধান খুঁজেছিলেন তা তাঁর কাছে ক্রমশঃ অবাস্তব হয়ে আসছে। 'বিচারকে'র জ্ঞানেন্দ্র 'সপ্তপদী'র কৃষ্ণস্বামী 'যোগভ্রষ্টে'র নায়ক সেই বিরাট দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—যা অনন্তকাল ধরে

জীবন-বহ্নি হয়ে জ্বলছে, নিত্যযুগ ধরে মানুষকে যাতে আহুতি অর্পণ করতে হবে, যে উর্ধ্বশিখার দহন আমাদের নিয়তি আর যে দহনে আমাদের শাশ্বত শুদ্ধি।

এই উপলব্ধি যখন পরিপূর্ণ হতে থাকে, তখন আর তারাশঙ্কর প্রাণরঙ্গ ভূমির নিরনুভব স্রষ্টা মাত্র নন; তখন আর স্রষ্টার বিবিক্ততার 'অহং'-এর বৃত্তে বন্দী নন তিনি। তখন কাউন্ট আর কাতুসার পাপে এবং প্রায়শ্চিত্তে, তখন সার্লেন মাছের মৃত্যুযন্ত্রণায় আর ধীবরের উপলব্ধিতে তাঁরও একাত্মতা এসে যায়। আর নৈর্ব্যক্তিক থাকা সম্ভব হয় না—রচনার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন, বারে বারে পাঠকের কাছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার তপ্ত উপস্থিতি অনুভূত হয়। আর—

আর—'এ আমার, এ তোমার পাপ।' যে যন্ত্রণা মানুষের, সে যন্ত্রণা আমারও। যে প্রায়শ্চিত্ত মানুষের, সে প্রায়শ্চিত্ত আমাকেও করতে হবে। আজ যদি সত্যের অমর্যাদা কোথাও ঘটে থাকে, তাহলে আমার নিজের মিথ্যাকেই সর্বপ্রথম জবাবদিহি করতে হবে। যে আত্মবর্জনের প্রেরণা, নিজের জীবন তুচ্ছ করে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে কলেরা মহামারীর কালে সেবাব্রতে তাঁকে ডাক পাঠিয়েছিল, সেই প্রেরণাই তাঁকে বিশ্বব্যাপী মহাদুঃখের মুখোমুখি নিয়ে এল।

যা বাইরে ছিল, এল ভিতরে; সব খণ্ডিত বিচ্ছিন্নতা একটি পরিপূর্ণ ঐক্যের মধ্যে এসে সংহত হল। শিল্পী বসলেন তপস্যার আসনে। আত্মদহনে দীপিত হয়ে তিনি বললেন, "Douleur, je t'a'ime !"

এই তপস্যার জগতে কৌতূহলী হয়ে, বিশ্লেষণের রূঢ়তা নিয়ে, পদপাত অনধিকার। এই উর্ধ্বমুখী শিখার ব্যক্তি-মন্দিরে বিনম্র শ্রদ্ধাই বোধ হয় একমাত্র প্রবেশপথ।

জানি না, ভুল হল কিনা। কিন্তু আমি এইভাবেই তারাশঙ্করকে বুঝতে চেয়েছি।

তারাশঙ্করের কবি, পুনর্মূল্যায়ন

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

'কবি উপন্যাসে কবিয়াল নিতাইচরণের কবিত্বশক্তির উন্মেষ ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য করেই তারাশঙ্কর মূলত উপন্যাসের গতিবিধি ঠিক করেছেন)। তার উন্মেষপর্বটি একটু নাটকীয়, তবে অস্বাভাবিক নয়। নিতাইচরণ নিচুজাতের ডোমবংশের ছেলে। শহরঅঞ্চলে ডোম বলতে যাদের আমরা জানি নিতাইয়ের পূর্বপুরুষেরা ঠিক সে জাতের নয়। এরা লেঠেলের জাত। নবাবী আমলে পল্টনে থেকে এরা বীরত্বের খ্যাতি কুড়িয়েছিল। কোম্পানি-আমলে নবাবের আশ্রয়চ্যুত হয়ে এরা যুদ্ধ-ব্যবসা ছেড়ে ডাকাতি করতে শুরু করে। তাই নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর, ঠাকুদা ছিল ঠ্যাঙাড়ে—নিজের জামাইকে হত্যা করেছিল, মামা ছিল ডাকাত, মা-র বাবাও ছিল খুনী। এহেন কীর্তি-মান বংশের ছেলে নিতাই চেহারায় দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ ও কালো হলেও দৃষ্টিতে তার সকরুণ বিনয়। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশে থেকে নিতাই যে কার উৎসাহে বা কোন প্রেরণায় কবিদলের আসরে বসে থাকতো, দোয়ারদের দলে মিশে বসে পড়তো, কাঁসি বাজানো আর দোয়ারের কাজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করতো তার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক দেন নি। তবে খানিকটা আছে।

যাই হোক, কবিত্ব শক্তি তো পেশা মানে না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে ফেরে। নিতাই জীবনে কখনো চুরি করে নি। পূর্বপুরুষের নিশাচর বৃত্তি নিতায়ের স্বভাবে নেই। এজন্যে সে পরিবারেও ঘৃণা কুড়িয়েছে। অবহেলা পেয়েছে। (অবহেলিত হয়েই বোধহয় অন্য মানুষ হয়েছে।) নৈশ-বিদ্যালয়ে জমিদার কাপড় দেবে এই লোভে অনেক বীরবংশী ডোমের ছেলেদের সঙ্গে নিতাই ভরতি হয়েছিল। বছর তিনেক পাঠশালায় পড়েছিল। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কাপড় জামা গামছা পুরস্কার ও পেয়েছে। পাঠশালায় পড়া

রামায়ণ মহাভারতের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প তার মুখস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে সব ছেলের তো পড়বার মন থাকে না, পারিবারিক অনুকূল পরিবেশও থাকে না। একা নিতাইকে নিয়ে পাঠশালা চলে না। তাই পাঠশালা উঠে গেল।

ইতিমধ্যে নিতাইয়ে মন গেছে কবিগানে। গ্রামাঞ্চলের কবিগানে অশ্লীলতা একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নিতাইয়ের মন আছে পুরাণ ও কবিতায়। পাঠশালার পাঠ চুকে গেলে নিতাইয়ের মামা বলেন তাকে ডাকাতের দলে ভিড়তে। নিতাই রাজি নয়। তার খাতা বই টান মেরে মামা ফেলে দিলে নিতাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এক গোঁসাইয়ের বাড়িতে মাহিন্দারের চাকরি নিলে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝলে গোঁসাই পরের ধান চুরি ক'রে নিজের গোলা বোঝাই করে। তখন চাকরি ছেড়ে সে চলে এলো বন্ধু-স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান—রাজা মুচির ঘরে। এই ঘরে রাজা ও তার ছেলের সঙ্গে যেদিন এসে সে ঢোকে সেদিনই রাজার শালী পনেরো ষোলো বছরের কিশোরী মেয়েকে সে দেখেছে। পাশের গ্রামে তার শ্বশুর বাড়ি। এ গ্রামে সে ঘড়ির কাঁটার মতো সময় ধরে দুধ দিতে আসে। নিতাই যখন এসেই রাজার স্ত্রী ও ছেলেকে লক্ষ্য করে গান ধরেছিল তখন তার হাস্যোচ্ছল শ্রী ও সহজ ভঙ্গি নিতাইকে আকর্ষণ করে।

ক্রমশঃ নিতাই পয়েণ্টস্‌ম্যান রাজার ঘরের পাশেই থাকে। স্টেশনে মোট বয়। রাজার শালী ঠাকুরঝি তারও ঠাকুরঝি। তার কাছ থেকে সে দুধ নেয়। স্টেশনের স্টলের আড্ডায় ভেণ্ডার 'বেনে মামা', বিপ্রপদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হাসিঠাট্টার গানে নিতাইয়ের যে পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তাতে মনে হয়, কবিগান-যাত্রাগান ও মেলায় মেতে ওঠা স্বপ্নময় কবিপ্রাণ একটি মানুষ সকলেরই স্নেহের পাত্র। সেই দিক থেকে তার রুচিবোধে ও কবিদৃষ্টিতে ঠাকুরঝিকে দেখার বিস্ময় ও প্রতিক্রিয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঔপন্যাসিক কাহিনীর বক্তা হলেও ঠাকুরঝিকে দেখার বর্ণনায় গ্রাম্য কবি নিতাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আনতে পেরেছেন: 'দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুইচাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মতো একটি অপরূপ শ্রী।' এই বিস্ময় নিতাইয়ের মনে যে শ্রদ্ধা জাগিয়েছে তাতে শালীর রূপ নিয়ে রাজার ঠাট্টার সহযোগী সে হতে পারে না: 'তাহার সর্বাঙ্গে' কচিপাতার মতো যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই।'

রোজই একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরঝি আসে পাশের গ্রাম থেকে। পয়েন্টের কাছে বা লাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিতাইয়ের চোখে ঠাকুরঝির আসার যে ছবিটি লেখক দিয়েছেন তা মনে রাখার মতো। শুধু ছবি হিসাবে নয়, উপন্যাসের তাৎপর্যের দিক থেকেও এই দেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। এবং শুধু নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝির সম্পর্ক-পর্যায়েই নয়, নিতাইয়ের জীবনের দুটি পর্বের সামগ্রিক যোগফলেও এই দেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। নিতাইয়ের সচেতন ও অবচেতন মনের যোগসূত্র হিসেবেও এই দেখা ও দেখার স্মৃতিটি কাজ করেছে। এই কাজটি দেখাবার জন্যেই ঔপন্যাসিক এই ছবিটিকে বারবার এনেছেন। সেইজন্যেই প্রথম বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণনাটি অনেকটা ফিল্মের জুম-শটের মতো :

'রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে, নিতাই নিবিষ্ট মনে যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। ক্রমশ সেটি পরিণত হয় একটি মানুষে। তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁট সাঁট করিয়া পরা একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। তাহার মাথায় একটি তকৃতকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটি। ঘটিটি সে ধরে না—এক হাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলা-ক্রমে চলিয়া আসে।'

এই শারীরিক ছন্দের অবলীলা নিতাই কোনোদিনই ভোলে নি, হয়তো বসনের সঙ্গে তার সম্পর্কের পর্বে ঠাকুরঝির সঙ্গ-স্মৃতি একটু বেশিদিন প্রচ্ছন্ন ছিল তার অবচেতনে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কবিগানের আসরে নিতাইয়ের হঠাৎ প্রতিষ্ঠার পর তার চেনাশোনা লোকজনের মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এমনকি নিতাই-এর বাড়ির লোকজন তাকে বাড়িতে থাকতে বলেছে। কিন্তু সে গেল না। তাতে তার সঙ্গী রাজা আরও খুশি। এবং ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য যে-ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের সম্পর্ক তৈরি করা সেই ঠাকুরঝি তো সব চেয়ে খুশি। সে খুশির সঙ্গে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধাও ছিল। ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য যে ঠাকুরঝির সঙ্গে নিতাইয়ের 'ঘনিষ্ঠতা'র পরিবেশ তৈরি করা। তার প্রমাণ কবিগানের আসরে নিতাইয়ের উপস্থিত জবাবে ঠাকুরঝির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাতেই চোখে পড়ে : 'ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাস ও অসম্বৃত।'

এই ছবিতেই ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত আছে। যাই হোক নিতাইয়ে এই আকস্মিক প্রতিষ্ঠা স্মৃতির অনুষঙ্গে অন্য এক বিখ্যাত কবিয়াল তারণ কবির কথা যেমন মনে করিয়ে দিয়েছে তেমনি প্রথম অভিজ্ঞতার অসতর্ক ও অপ্রস্তুত অবস্থাটাকে কাটিয়ে উঠতে সে সংকল্প করেছে। ভবিষ্যৎ কবিগায়ক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্যে সে পুরোনো পুঁথির পাতা ওল্টাতে শুরু করেছে, ছোট কাজ ভেবে কুলিগিরি ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা ইয়ার্কিকে সে ক্ষমা করতে শুরু করেছে। জীবিকার সঙ্গে তার প্রতিভা-সচেতন মনের লড়াই শুরু হয়েছে। কুলিগিরি ছেড়ে দোকান করার সংকল্প করেছে। কিন্তু বিয়ে করে সংসার করার ইচ্ছে তার নেই। কারণ সে ভালোই জানে, ডোমের মেয়ে কবিয়ালের কদর বুঝবে না। তাছাড়া কবির স্বপ্নের মেয়ে তো ডোমেদের মধ্যে পাওয়াই মুসকিল।

ঠিক এই রকম বিষন্ন স্বপ্নময় মানসিক অবস্থায় নাটকীয়ভাবে ঠাকুরঝিকে ঔপন্যাসিক হাজির করেছেন? (রাজা আর নিতাই দুজনেই যখন সুন্দরী তরুণীর কল্পনা করছে (রাজার কাছে পূর্বস্মৃতি, নিতাইয়ের কাছে কবি-কল্পনা।) সেই সময় ঔপন্যাসিক নিতাইয়ের সামনে সেই পুরোনো 'শট'-টি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। দুটি লাইনের বাঁকের মুখে একটি বিন্দুর ওপর চলন্ত একটি শাদা কাশফুলের রেখা। রেখাটির মাথায় সোনার ফোঁটা।) তারপরই রাজার ঠাট্টায় আহত ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের মনে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগলো। এবং সেই সহাভূতির আবেগে নিতাইয়ের মুখে এলো আশ্চর্য একটি গানের কলি 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।' নিজের গানের কলিতে নিজেই মুগ্ধ নিতাই একদিকে যেমন জীবিকা ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে একটু ক্ষুন্ন অন্যদিকে তেমনি ঠাকুরঝির সঙ্গে নিঃসংকোচ সমবেদনার প্রকাশে খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। দুজনেই দুজনের অভিমান ভাঙিয়ে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ ঘোমটা-খসা ঠাকুরঝির কালো চুলে লাল জবা দেখে নিতাইয়ে কবিপ্রাণ জেগে উঠেছে। গানের দ্বিতীয় কলিটিও এই সূত্রেই হঠাৎ-পাওয়া। কিন্তু সম্পর্ক সহজ হয়েও হয় না। একদিকে কবির প্রাণে জোয়ার। সামনে ছুটন্ত কিশোরী ঠাকুরঝির স্বপ্ন, অন্যদিকে কুলিগিরি-ছাড়া একবেলা-খাওয়া দুর্বল শরীরের কষ্ট, আর একদিকে ঠাকুরঝির সঙ্গে তার হাসি ঠাট্টা চা খাওয়া দেখে রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ন বিদ্রূপ এবং আর্থিক প্রত্যাশায় নিয়ে মোহন্তের কাছে প্রত্যাখ্যান—সব মিলে নিতাইয়ের মনে এক বেপরোয়া ভাব নিয়ে এসেছে।

কবি হওয়ার চেয়ে কুলিগিরি করাই ভালো বলে মনে হয়েছে তার।

ঠিক এই মানসিক অবস্থায় আরেকটি নাটকীয় মোড় এলো। নিতাই কবির বায়না পেলো। এবং সেই সুখবরটিও মুগ্ধ ঠাকুরঝির প্রায় সামনেই। পাঁচদিন বাদে যখন গায়ে চাদর দিয়ে পায়ে জুতো পরে সে গাঁয়ে এলো তখন সে সকলেরই মুগ্ধ প্রশংসা কামনা করেছিল। কিন্তু তেমন কিছু নেই দেখে উদাস হয়ে যখন তার ঘরের কাছে তারই বাঁধা গানের কলি 'কালো যদি—' শুনলো এবং চাদর-গায়ে জুতো-পায়ে কবিয়ালের প্রশংসা পেলো ঠাকুরঝির কাছে তখন সে ঠাকুরঝিকে চোখ বুজতে বলে তার গলায় একটি কেমিকেলের সুতাহার পরিয়ে দিয়েছে সে দৃশ্যের লজ্জা, সংকোচ, মুগ্ধতা ও ভাববিনিময়ের আঞ্চলিক ভাষারূপ এবং দুজনের দিক থেকেই রাজার সামনে এই ভাববিনিময় গোপন করার চেষ্টার দৃশ্যটি ভোলবার নয়। এবং এখন থেকে নিতাইয়ের মনের জগতে ঠাকুরঝি-কেন্দ্রিক মানসিক আবেগের সঙ্গে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল একটি প্রতীকী উদ্ভাস হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে দুজনের দুরকম প্রতিক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক খুব অল্প আঁচড়ে ধরেছেন। গলায় হারটি পরে ঘরের পথে আত্মমুগ্ধ ঠাকুরঝি ছোট নদীর স্থির জলে নিজেকে দেখেছে। তারপর ঔপন্যাসিকের ভাষায় তার মানসিক প্রতিক্রিয়া : 'কি বলিবে, সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই,তবে তিরস্কার সহ্য করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।' অন্যদিকে ফাগুন মাসের উতলা বাতাসের দুপুরে বয়ে চলা ধুলোর আস্তরণের চাঞ্চল্যের মধ্যে অস্থির নিতাইয়ের মন ঠাকুরঝি চলে যাবার পরেও 'সেই রহস্যময় আস্তরণের মধ্যে এখনও যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে।' এর পরেই তার মনে গান ঘনিয়ে এসেছে। (উপন্যাসের সমস্ত মধুর তীব্র তিক্ত ও মত্ত অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে অন্তর্জগতের এই উদ্ভাসগুলি উপন্যাসটির কাব্যিক রেশটিকে ধরে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের সারল্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নানা স্বপ্ন ও কাল্পনিক সংলাপ এই কাব্যিক মেজাজের সঙ্গে একসুরে বাঁধা। মেলা-যাত্রা-পাগল এই মানুষটি যতই উন্মনা হোক, একটি খুঁটিতে সে বাঁধা পড়েছে। সে খুঁটি ঠাকুরঝি।) জীবিকাহীন নিতাই যখন দারিদ্র্যে পড়ে দুধ নিতে চায়নি তখন ঠাকুরঝি এমনিই দুধ দিয়েছে, একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে, গল্প ক'রে চলে গেছে। কবিয়ালের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা যেমন নিতাইকে দুধ নিতে বাধ্য করেছে, গরিব নিতাই তাকে ফুল দিয়ে তার আন্তরিক শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। এই ভালোবাসার রক্তিম আবেগের মুহূর্তে একটি অস্বস্তি নিতাইয়ের মনে

জেগেছে। ঠাকুরঝি পরস্ত্রী। যেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই রূপান্তরিত একটি ঘটনার পুনরাভিনয় হতে চলেছে। বন্ধ ঘরে নিতাইয়ের মনে হয়েছে ঘরের সর্বত্র ঠাকুরঝির অশরীরী উপস্থিতি তার মনের খোঁজ খবর নিচ্ছে। ঘরের জানালা খুলতেই মনে হয় ঠাকুরঝি যেন রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে দেখছে নিতাই তাকে ডাকে কি না। এক গ্রাম্য কবির মনে অভিমানী কিশোরী প্রেমিকার আনাগোনার এই ছবি এঁকে তারাশঙ্কর যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনের বড় কাছাকাছি এসে গেছেন। (নিতাইয়ের চোখে ঠাকুরঝি যেন নষ্ট চাঁদের সৌন্দর্য। কলঙ্ক থাকলেও তার অমোঘ টানে নিতাই তার পাপবোধ ভাসিয়ে দিলে। কিন্তু ঠাকুরঝিকে যদি কুৎসা শুনতে হয় তবে চাঁদ হাতে নেওয়ার দরকার নেই। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাক। তাকে শুধু দেখতে হবে।

নিতাইয়ের এই সংযম ঠাকুরঝিকে অভিমানী করেছে। এই প্রায় নীরব আদান-প্রদানটি চলছে কিন্তু এক বিপরীত পরিবেশে—ঔপন্যাসিক কৌশলে, রাজা ও তার স্ত্রীর রূঢ় ও তীব্র দাম্পত্যকলহের মধ্যে।)

২.

এই বিচিত্র আবেগঘন প্রেমের একটি বিশেষ মুহূর্তে সংযত নিতাই যখন দূরত্বে সরে আসতে চায়, আর অভিমানী কিশোরী ঠাকুরঝি খুবই অল্প কথায় দূরত্বের ব্যাখ্যা চায় সেই দূরত্বের ফাঁকে এসে হাজির হয় এক ঝুমুরের দল, যে দলের মূল আকর্ষণ হলো বসন্ত। ঔপন্যাসিক বসন্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শাণিত-দীপ্তি ছুরির তুলনাটাই বেশি। (অন্যদিকে ঠাকুরঝি সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে সতেজ পত্রপল্লবের ছবিই সর্বত্র। দু-এক জায়গায় ঋতুগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ও তার ভাবান্তরের তুলনা আছে। কখনো সে ভুঁই চাঁপার ডাঁটা, কখনো তার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত একটি কোমল ঘনশ্যামশ্রী, কখনো তার দৃষ্টিতে কালো জলের স্বচ্ছতা। তার ভাবান্তরে কখনো বর্ষার ঘনশ্যামপত্রশ্রী, কখনো পাণ্ডুর হেমন্তশ্রী। অন্যদিকে 'দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী বসনের দৃষ্টিতে সাদা আগুনের শিখার মধ্যে কালো দুটি পতঙ্গ মরণজয়ী কালো দুটি ভ্রমর। চোখের সাদা ক্ষেতে ছুরির ধার; মুখে হাসে না, সর্বাঙ্গে হাসে। হাসির ধারে মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।'

ঝুমুরের এই দলটি ভ্রাম্যমান। আসর পেতে গান করে, দলের মেয়েরা দেহের ব্যবসাও করে। বসন এদলের বেপরোয়া নায়িকা। এই রসিক ও ধারালো মেয়েটিকে পেয়ে রসিক কবিয়াল নিতাই রসিকতার যোগ্য পাত্রী পেয়েছে। তার মুখে গান আসে, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ ঠিকরে পড়ে, যোগ্য উত্তরও পায়। গাছ-তলায় বসা ঝুমুর দল নিঃসঙ্গ কিন্তু আগ্রহী নিতাইকে দলে যোগ দিতে বলে। রাজি হতে গিয়ে মনে বাধা আসে। বন্ধু রাজা আর রাজার শালী ঠাকুরঝি এই দুটি বাধা। যে বিদ্রূপের খোঁচায় ঠাকুরঝির চোখে হয়তো জল আসতো, সেই বিদ্রূপ সমান দীপ্তিতে ফিরে আসে। আসর বসলে সকলের অনুরোধে নিতাই গান ধরে, তালে তালে নাচে। বসনের দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটতেই বসন চলে যেতে চায়। গান থামিয়ে নিতাই তাকে আটকায়। তার পর তার গানের শেষে বসনের নাচ শুরু হয়। একবার নাচ সেরে মদ খেয়ে আবার নাচে। তারপর জ্বর গায়ে আসর থেকে বেরিয়ে নিতাইয়ের ঘরে ঢোকে। নিতাই খুঁজতে খুঁজতে ঘরে ঢোকে। অসুস্থ বসন তার মাথা টিপে দিতে বলে নিতাইকে। হঠাৎ জানলার পাশ থেকে কে যেন সরে যায়। নিতাই জানলার ধারে এসে একটি কাশফুল দ্রুত চলেছে, মাথায় সোনার বিন্দুটি কেবল নেই। আসর থেকে আর একটি মেয়ে উঠে এসে তার পিছু পিছু এসেছে এবং সেই মেয়েটির মাথায় ঘোমটা আছে—বসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী অব্যর্থ উপস্থিতি ধরা পড়েছে। সে নিতাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ।নিতাইয়ের কবিদৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটাই তার ডোম-বংশে জন্মের মতো অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে হয়েছে।। (ঠাকুরঝির প্রতি যে আসক্ত সে কোন গূঢ় আবেগে বদ্ধ ঘরে অসুস্থ বসনের প্রতি মায়াবশত তার মাথা টিপেছে তা যেন নিজের কাছেই রহস্যময় বলে মনে হলো।

নিতাইয়ের এই আচরণে একটু শিল্পগত ত্রুটি আছে বলে মনে হয়। একটু আগেই যে নিতাই ঠাকুরঝিকে পরস্ত্রী ভেবে নিজেকে পাপবোধে দূরে সরিয়ে নিতে চেয়েছে সে কী করে একটি বেপরোয়া পতিতার অভিমান ভাঙাতে বদ্ধ ঘরে তার মাথা টিপতে শুরু করেছে তা একটু দুর্বোধ্য বলেই মনে হয়। একি কেবল নিতাইয়ের গানে বসন মুগ্ধ হয়েছে বলে? বসনের প্রশংসার নিতাইয়ের গোপন প্রতিপত্তিলাভের বাসনা চরিতার্থ হতে চলেছে বলে?) এরকম একটা ইঙ্গিত বসন-নিতাইয়ের সংলাপের মধ্যে পাওয়া যায় অবশ্যই। কিন্তু সমস্ত

ব্যাপারটাকেই সে মন দিয়ে ঈশ্বরের খেলা বলে ধরে নিলে। ডাকাতের বংশে জন্ম হলেও সৎ, বিনয়ী, সহনশীল এবং পাপবোধে পীড়িত এই প্রেমমুগ্ধ মানুষটি একটু আত্মসচেতন বলেই বন্ধ ঘরে অসুস্থ হলেও বসনের মতো মেয়েকে নির্দ্বিধায় সেবা করবার অনিবার্য অন্য ব্যাখ্যা যে হতে পারে সে সম্পর্কে তার সচেতন হবারই কথা। সচেতন হলে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল তা হয়নি। এর পরেও গাছতলায় পড়ে-থাকা-মত্ত অসম্বৃত বসনকে যে-ভাবে সে সেবা করেছে তাতেও পূর্ব প্রেমের কোনো ছায়ামাত্র নেই। কিন্তু বসন্ত সরে যেতেই ট্রেন চলে যাবার পরে দুটি লাইনের মিলিত বিন্দুতে চোখ পড়লে নিতাই সচেতন হয়। সেই স্বর্ণবিন্দু শোভিত শুভ্ররেখাটি যেন এখুনি দেখা দেবে। (যে মানুষ কিশোরী মেয়ের আকর্ষণে প্রথম মুগ্ধতার স্পর্শ পেয়েছে সে একটু ধারালো ছুরির কাছে সোজাসুজি আত্মসমর্পন করলো এইটেই আশ্চর্য। বসনের সামনে নয়, বসনের আড়ালে ঠাকুরঝির প্রত্যাশা জাগে—এখানেই একটু অসঙ্গতি।)

ইতিমধ্যে তিনদিন ঠাকুরঝির দেখা না পেয়ে নিতাইয়ের উদ্বেগ বেড়েছে। রাজার কাছে খবর পেয়েছে ঠাকুরঝির মূর্চ্ছা হচ্ছে। তার আগে সংসারে স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে গালিগালাজ করেছে। অপদেবতার ভর ছাড়াতে তাকে কালীমায়ের ভবনে দাঁড় করানো হবে। নিতাইয়ের মনে হয়েছে অপদেবতা বোধ হয় ঝুমুর দলের স্বৈরিনী বসন। ভবনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরঝি যখন নিতাই কবিয়ালের নাম করেছে তখন ঠাকুরঝির দিদি—রাজার শালী ফিরে এসে নিতাইকে শাপ-শাপান্ত করেছে। এই ঘটনায় বোঝা যায় বসনের সঙ্গে নিতাইয়ের ঘনিষ্ঠতার সূত্রে এক ধরনের পাপবোধ নিতাইয়ে মনে নিশ্চয় কাজ করছিল, নইলে ঠাকুরঝির মানসিক উৎক্ষেপের কারণ হিসেবে বসনকেই অপদেবতার মতো মনে হবে কেন। যাই হোক অপবাদে নিতাই অপরাধীর মতো চুপ করেই থেকেছে। মনে মনে সে এই লজ্জা থেকে মুক্তি খুঁজেছে।

এই মানসিক সংকটে আলিপুরের মেলা থেকে নিতাইয়ে বায়না এলো। নিতাই যেন মুক্তির পথ পেলো। রাজা ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে নিতাইকে। ঠাকুরঝির ঘর ভাঙতে চাইলে না নিতাই। যদিও সে স্বীকার করলে, ঠাকুরঝির প্রতি তার ভালোবাসার কথা। কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে নষ্ট করে নি। বোঝা যায়, নিজের পাপবোধ থেকে মুক্তিপাওয়ার জন্যে সে রাস্তা খুঁজছিল। বসনের প্রতি আকর্ষণ এখন স্পষ্ট নয়, কিন্তু কবিখ্যাতির লোভ তায়

আছে। তাই গ্রাম ছেড়ে সে ঝুমুর দলে যোগ দিলে। ট্রেনে উঠে পুরানো গ্রাম ও সঙ্গ-অনুষঙ্গের স্মৃতি তার মনে যে গানঘনিয়ে তুলেছে তাতেও তার পাপবোধ ও মুক্তি-চেষ্টার কথা আছে। ঠাকুরঝির সূত্রে তার মনে হয়েছে 'ছোঁয়ার সাধে কাজ নাইক – সোনারঅঙ্গে লাগবে কালি। / না না, তাও করো মার্জ্জনা—আজ থেকে তাও দেখবো না—/ জানতাম না কে এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।' সেইজন্যেই তার সিদ্ধান্ত 'তাই চলেছি দেশান্তরে আপনার খুঁজেই ফিরব ঘুরে।' তবু টান তো রয়েই গেল। তার প্রমাণ, 'কাকের মুখে বাত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।'

৩.

ঝুমুরের দলে নিতাই যোগ দিলে। সে গাইবে, বসন্ত নাচবে। নিতাইকে তার অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে ঔপন্যাসিক একেবারে টেনে-ছিঁড়ে আনেন নি। "ঠাকুরঝি, রাজন, বোবরাজ, কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের পিছনের দীর্ঘ ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে।' কবিখ্যাতির প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তার পুরোনো স্মৃতিকে ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। নিতাইয়ের জীবনে এই নতুন পর্বান্তরের মানসিক টানাপোড়েনের চমৎকার ছবি আঁকা হয়েছে। নিতাইয়ের পুরোনো রুচির টানও কীভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে তারও বহিরাশ্রয়ী ছবি দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ঝুমুরের দলে এসেও তার রুচিবোধে সে ভাবে ঝুমুর গানে সে 'রঙ' দেবে না। মদই সবাই ভালোবাসে. দুধে অরুচি একথা সে বিশ্বাসই করে না। ঝুমুর দলের গান-বাজনা ও আলোর নিচে যে অন্ধকার দেহ ব্যবসার বিলাস তাতে নিতাইয়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে তার মন ঠাকুরঝিকে খুঁজছে। পরমুহূর্তে ঠাকুরঝির প্রতি শুভেচ্ছা পোষণে তার মন ভরে উঠেছে। ঠাকুরঝি তাকে ভুলে যাক।

ঝুমুর দলে ঢুকে দুটি পরস্পর বিরোধী মানসিকতার একত্র সহাবস্থান নিতাইকে বিস্মিত করেছে। মেলার পাশেই বৈষ্ণব মন্দিরে গিয়ে তার প্রাণ জুড়োয়. আধ্যাত্মিক শান্তি মেলে। দলের মেয়েদের নাচ-গানের পারদর্শিতায় তাঁদের প্রতি নিতাইয়ের যেমন সম্ভ্রম ছিল তেমনি মনের গোপনে ঘৃণাও ছিল। মেলার বিচিত্র জনতা রাত্রিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়, দিনের বেলা স্নান সেরে নিকোনো-

মাঠিতে পুজো করে, উপবাস করে। ব্রতকথায় মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়। মহাজন চণ্ডীদাসের গান করে। প্রবৃত্তিনিবৃত্তির এই অদ্ভুত সহাবস্থানে নিতাই বিস্মিত হয়। দেহ ব্যবসার পাশে মন্দির এবং একই মানুষ রাত্রে পতিতা, সকালে পুজো-ব্রতকথার মুগ্ধ শ্রোতা—এ দুয়ের মধ্যে গোপন যোগসূত্রটি নিতাই যেন দেখতে পায়। এদিকে গানের পালা শুরু হলে নিতাইয়ের রুচি-মাফিক গান ও বসনের নাচ ঝিমিয়ে পড়ে। আসর থেকে রঙ চড়াবার দাবি আসে। বিপক্ষ দলের অশ্লীল গালিগালাজের দক্ষতায় নিতাইয়ের ঝুমুর দল পরাস্ত হয়। নিতাইয়ের এই রুচিরক্ষার পুরস্কার হিসেবে বসন্তের একটি চড় তার কপালে জোটে। অপমানের জ্বালায় নিতাই প্রথম মদ খেয়ে পরের আসরে বীরবংশী রক্তের উগ্রতার শিকার হয়। চরম অশ্লীলতায় আসর মাত করে বসন্তের ঘরে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। বসন্তের ঘরেই সে রাত কাটায়। এই নাটকীয় বর্বর জাগরণের পর থেকে নিতাই বসন ও দলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এই উন্মত্ততার জন্যে নিজের ওপরেই ঘৃণা জন্মায়। দল ছাড়ার সংকল্প করলেও বসনের কাছে তার গোপন অভিপ্রায় ধরা পড়ে। বসনের তীব্র কঠিন বাঁধন সে বুঝতে পারে। তার ভেতরকার নারীত্বকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়। দেহব্যবসা শেষ হলে অসুস্থ রুগ্ণ এই মেয়েটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য হবে। শরীর নষ্ট করে যে মেয়েটি দুরারোগ্য রোগকে তুচ্ছ করে অতি সচেতন ভাবে অন্তিম পরিণতিতে এগোচ্ছে সেই মৃত্যুচেতনার প্রেক্ষাপটে বসনের সঙ্গে নিতাই গভীর মমত্ববোধে গাঁটছড়া বাঁধে। ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ অথচ গভীর জীবনবোধ মৃত্যুর বিষণ্ণ আলোয় জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধনসূত্রটিকে চিনিয়ে দিয়েছে।

দলের মেয়ে-পুরুষের বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে নিতাই সহজ হয়ে গেছে। প্রয়োজন মতো শ্লীল-অশ্লীল গান রচনা করে ও গেয়ে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। দলের লোকের মতোই অন্য সময় স্বাভাবিক থাকলেও অশ্লীল খেউড়ে সে এখন বীরবংশী ডোমের ছেলে। দলের বিচিত্র জীবনযাত্রার একটু অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়াছেন নিতাই ধীরে ধীরে তার ঠাকুরঝি-পর্ব ছেড়ে বসনের সঙ্গে আদানপ্রদানে, গানের লেনদেনে যেন স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু নিতাইয়ের স্বভাবে যে উদাসীনতা তাকে ঘরবাড়ি ছাড়া করেছিল, ঠাকুরঝির অকল্যাণ আশঙ্কায় যে দূরত্ববোধ সে তৈরি করেছিল, ঔপন্যাসিক

সেই উদাসীনতাকে নষ্ট হতে দেন নি। তাই বসনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার পর্বেই এক গভীরতা তাকে আচ্ছন্ন করে। দুপুরে মাঠে চাষী-বউদের মাথায় ঘটি দেখলেই তার মনে পড়ে কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। সেই রোদ ঝলসানো সোনার বিন্দুটি দেখলেই ঠাকুরঝির ছবি ভেসে আসে। তার কবি-সত্তাটি সেইনা-পাওয়ার বেদনাটিকে ওই প্রতীকী আভাসে 'এক ঝলকে দেখতে পায়। নিতাইয়ের মনে একদিকে বন্ধন আর দিকে অপ্রাপ্তি—দুয়ের টানা পোড়ন শুরু হয়। এই টানা পোড়েনের ছবিটি নিতাইয়ের আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক চমৎকার ভাবে ধরেছেন। এককালে ঠাকুরঝি সঙ্গ কাটাতে যে বায়না গাওয়াকে সে মুক্তি মনে করেছিল এখন সেই মুক্তিকেই সে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধন ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। এক লীলাকে অসমাপ্ত রেখে আর এক লীলাতে সে ডুবে গেছে। আর ফিরে যাবার সময় নেই। জীবন সত্যিই ছোট।

মনের গভীরে উদাসী হলেও নিতাই এখন অভ্যস্ত। দলের জীবনযাত্রায়, বসন্তের রোগশয্যায় সে অভ্যস্ত সঙ্গী। নিতাইকে এই জীবনে অভ্যস্ত করাবার জন্যেই ঝুমুর দলের জীবন যাত্রার ছবিতে ঔপন্যাসিক ডিটেল এনেছেন। বসন্তের সমস্ত মান অভিমান রাগ-ক্রোধের সে লক্ষ্য, মাঝে মাঝে শিকারও বটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে বসন্ত আবার অসুস্থ হলো। অবধারিত মৃত্যুর সামনে দুর্দান্ত সাহসী সেই ক্ষুরধার মেয়েটি এখন ভীরু। নিতাইকে সে বলেছে, 'কেনে তুমি দলে এসেছিলে, তাই আমি ভাবছি। মরতে আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর নয় মরতে মন চাইছে না।' এক গভীর রাত্রিতে ভগবানের বিরুদ্ধে অজস্র নালিশ করে নিতাইয়ের কোলে বসন ঢলে পড়লো। ঘনিষ্ঠ মানুষের মৃত্যুকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় নিতাই মেনে নিতে না পারলেও তার দার্শনিক মন বসনের অশরীরী উপস্থিতিকে মন ভরে নিলে।

বসন্তের মৃত্যুর পরেকার পর্বটি উপন্যাসের পক্ষে অনিবার্য বলে মনে হয়না। দল ভেঙেছে নিতাই ঠাকুরঝির স্মৃতি এড়িয়ে দেশান্তরের পথে রওনা দিয়ে কাশী এসেছে। কাশীতে এক বাঙালী বিধবার কাছে গেছে, বিশ্বনাথ দর্শন করেছে। কিন্তু অনভ্যস্ত পরিবেশে সে উদাসীন হয়েছে। নিজের গ্রাম, মেলা, বন্ধুবান্ধব কৃষ্ণচূড়ার গাছ ঠাকুরঝি তার মন জুড়ে বসেছে। বন্ধন ছাড়া একটি মানুষের এই উদাসীন পরিক্রমা উপন্যাসের নতুন কোনো মাত্রা হিসেবে গণ্য

করবার মতো নয়। বৈরাগী নিতাইয়ের পক্ষে তার অস্থির মানসিকতাকে খানিকটা সাময়িক সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া সংক্ষিপ্ত হলেও এই পর্ব আর কতটুকু তাৎপর্য এনেছে ?

কিন্তু তীর্থ থেকে বাঙলাদেশে নিজের গ্রামে ফেরার শেষ পর্বে ঘরে ফেরার যে মাদকতা দেখা দিয়েছে নিতাইয়ের মনে, তার মধ্যে একটা অন্য মাত্রা আছে। সেটি হলো অভ্যস্ত অনুষঙ্গে ফিরে যাবার গভীর টান। যে অভ্যস্ত ছাঁচ থেকে ঘটনাচক্রে সে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল এক নাটকীয় মানসিক সংকটে এবং নিজের কবি খ্যাতির লোভের তাড়নায় সেই ছাঁচে সে ফিরে আসছে একটু অন্য মানসিকতা নিয়ে। অভ্যস্ত পরিবেশ ও বন্ধুসঙ্গের টান তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে জন্মভূমির টান, নিজের গ্রামের 'ধুলো মাটির স্পর্শে লালায়িত' হবার ইচ্ছে। এই জন্মভূমির টানটুকু যেন মনে হয় নিতাইয়ের ওপর আরোপিত, কাশীতে নতুন যা-কে দেখে যে টানের শুরু। নিতাইয়ের জীবন যখন ঝুমুর দল ও বসনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তখন থেকে মাঝে মাঝেই সে গ্রামের কথা ভেবেছে, চলন্ত কাশফুলের ওপর সোনার টোপর হয়ে ঠাকুরঝি তাকে তার ছেড়ে আসা জীবনকে টেনেছে, এক সময়ে রুচির মান রাখতে গিয়ে বসন্তের চড় খেয়ে সে চলেও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু কাশীতে গিয়ে অনভ্যস্ত পরিবেশে নিজের গ্রাম, নদী, মাঠ, ঠাকুরঝি, বসন ও অন্যান্য সঙ্গস্মৃতি তাকে যে ভাবে বাঙলাদেশে নিজের গ্রামে টেনেছে তাতে ঔপন্যাসিকের স্বদেশী ভাবনা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে তুলনায় নিতাইয়ের গভীর গোপন অপরিমেয় ভালোবাসার টানটি গৌণ হয়ে গেছে। যেন মাতৃভূমির অনেক অনুষঙ্গের মধ্যে দুটি আবেগঘন পর্ব একাকার হয়ে গেছে। বসনের মৃত্যুর পর নিতাই যদি গ্রামে ফিরে আসতো তবে অশরীরী দুটি মানুষের স্মৃতি নিয়েই সে ফিরতো। কিন্তু তাকে তীর্থে ঘুরিয়ে তার মনের মধ্যে বাঙলাদেশ ও তার নিজের গ্রাম যেভাবে এসেছে তাতে বসন্তের 'কেয়াফুল' আছে, ঠাকুরঝির 'কাশফুল' ও আছে কিন্তু তাদের ছাপিয়ে ধুলোমাটির পুণ্য স্পর্শও আছে। ঠাকুরঝি ও বসন্তের সূত্রে নিতাইয়ের যে টেন্‌শন্ উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করেছে তার সঙ্গে এই পুণ্য মাতৃভূমির-চেতনা সমান্তরাল বিন্যাসে গাঁথা নয়। ঠাকুরঝি-বসন্ত ছাড়াও আরও নানা চরিত্র ও পরিবেশের অনুষঙ্গে তার জন্মভূমি যে সামগ্রিক পুণ্যভাব এনেছে তার মনে, তাকে যদি

নিতাইয়ের প্রেমের সাব্‌লিমেশন বলি, তাহলেও মনে হয়, এই সাব্‌লিমেশনের প্রয়োজনীয় ধীর প্রস্তুতি উপন্যাসে নেই। শেষ পর্বের তীর্থ ভ্রমণেই তার হঠাৎ সূচনা। এবং সেইজন্যেই যতই তার উত্তরণ ঘটুক দুটি প্রেমের টেনশনে বিদীর্ণ নিতাইকে যেভাবে 'Sadder and Wiser' করে তুলেছে তাতেই উপন্যাসের প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে। সোনার টোপর পরা চলন্ত কাশফুলে যে প্রেমের উদ্ভাস কাঁটায় ঘেরা কেয়াফুলের মন-মাতানো গন্ধে তার গভীর পরিণতি। (ঠাকুরঝি নিতাইয়ের স্বপ্ন, বসন্ত নিতাইয়ের অভ্যস্ত নেশা। নেশা হলেও স্বপ্ন যায়নি। বসন্ত এলেও ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। দুটিতে মিলে-মিশে নিতাইয়ের কবি জীবন। প্রেরণা এবং কবিতা। কবির কাছে দুটিই সত্য। তাই মৃত্যুর পরেও ঠাকুরঝি আছে, বসন্তও আছে। কবির কাছে এই দুয়েরই মৃত্যু নেই। উপন্যাসটির মূল সৌন্দর্য এখানেই।)

তারাশঙ্করের 'রাইকমল'

মানস মজুমদার

১ ··

'রাইকমল' (১৩৪১) কথক তারাশঙ্করের কথকতা-নৈপুণ্যের এক স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোরম ও তৃপ্তিকর, বুঝি বা কিঞ্চিৎ নেশা সঞ্চারীও। কথকের মনটি পদাবলী-রসে অভিষিক্ত, বাউলের একতারায় উন্মনা, মালতী মাধবী কুসুম-সৌরভে সুরভিত।

··২···

উপন্যাসের নাম 'রাইকমল'। নামকরণ নায়িকার নামে। এ উপন্যাসের কাহিনী নায়িকা রাইকমলের চিত্ত-জাগরণের কাহিনী; আসক্তি আর বন্ধন মুক্তির কাহিনী; সসীম জগত থেকে অসীম জগতে পাড়ি জমানোর কাহিনী।

কাহিনীর একাধিক পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে হরিদাসের কুঞ্জকে কেন্দ্র করে কমলের ছ'সাত বছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর বয়সের কাহিনী পরিবেশিত। কমলের আকর্ষণীয় রূপ, সুমিষ্ট সুন্দর গানের গলা, চাপল্য চাঞ্চল্য, প্রতিবেশী কিশোর রঞ্জনের সঙ্গে তার অনুরাগ-বিরাগময় সখ্য-প্রণয়, রঞ্জন-জনকের আত্যভিমানহেতু উভয়ের প্রণয়-মিলনে প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা। জননী কামিনী ও বাউল রসিকদাসের সঙ্গে কমলের গ্রামত্যাগে এ পর্যায়ের পরিসমাপ্তি। কমলেরসদ্যজাগ্রত প্রেম অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ-বাণাঘাতে যন্ত্রণাদিগ্ধ: "দুইটি কিশোর আর কিশোরী। বিচিত্র এর রীতি। কেমন করিয়া যে কোথায় বাঁধন পড়ে! পরান ছাড়িলেও এ বাঁধন ছেঁড়ে না!" (পৃ. ৩৮৭)

দ্বিতীয় পর্যায় নবদ্বীপ-জীবন। প্রণয়-অভিশপ্তা, মর্মপীড়িতা, পূর্ণযৌবনা কমল প্রণয়লিপ্সু একাধিক যুবকের প্রণয়ানুরাগ অগ্রাহ্যকরে। জননীর অকাল-

বিয়োগে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় বৃদ্ধ রসিকদাসকে স্বামিত্বে বরণ করে। অসমবয়সী নর-নারীর দাম্পত্য-সম্পর্কে জটিলতা দেখা দেয়: "ধীরে ধীরে দুইটি নরনারীর জীবন কেমন একটা স্পন্দহীন গুমটে অসহনীয় হইয়া উঠিল।" (পৃ. ৪০৩) শেষপর্যন্ত নবদ্বীপ-ত্যাগে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা পথ-পরিক্রমায়। পর্যটনসূত্রে রসিকদাসসহ কমল স্বগ্রামে ফিরে আসে। দাম্পত্য-সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ততর হয়ে উঠে: "রুদ্ধ ঘরের মধ্যে মহান্ত প্রৌঢ় বাউল অন্তরবাসী গোবিন্দের পায়ে মাথা কুটিতেছিল, গলার মালা আমার মাথায় তুলে দাও প্রভু, মাথায় তুলে দাও।" (পৃ ৪১৩) গ্লানিজর্জর রসিকদাস শেষপর্যন্ত অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমায়। কমল অস্বস্তিকর বাঁধন থেকে মুক্তি পায়।

চতুর্থ পর্যায়ে কেঁদুলির পথে রঞ্জনের সঙ্গে কমলের অভাবিতপূর্ব সাক্ষাৎ, পূর্বস্মৃতির প্রাবল্যে রঞ্জনের কণ্ঠে কমলের মাল্যার্পণ, রঞ্জনের আখড়ায় উভয়ের প্রত্যাবর্তন এবং মিলন-মধুর দাম্পত্য-জীবনের স্বাদ-গ্রহণ: "একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনের গাঢ় আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য দিয়া দিবারাত্রিগুলি স্বচ্ছন্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মত বহিয়া যায়। মিলনের আবেশে চোখের নিমিখ নামিয়া আসে, সে নিমিখ খুলিতে খুলিতে রাত্রি আসে। আবার রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হয়।" (পৃ. ৪৩১)

পঞ্চম পর্যায়ের সূচনা রঞ্জনের কমল-বিতৃষ্ণায়: "দোলের দিন রঙ-খেলায় সে আর তেমন করিয়া মাতে না। ঝুলনের দিন বকুলশাখায় ঝুলনা আর ঝুলানো হয় না।" (পৃ. ৪৩২) কমলের অজ্ঞাতসারে নতুন এক সাধন-সঙ্গিনী নির্বাচন করে রঞ্জন। তাকে আখড়ায় নিয়ে আসে। স্বেচ্ছা-বিদায় গ্রহণ ক'রে শ্যামকিশোরের সন্ধানে পথে বের হয় কমল: "পথ—অজয়ের কূলে কূলে পথ। ঘাট, মাঠ, মাঠের পর গ্রাম।···বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে।" (পৃ. ৪৩৮)

রাইকমলের কাহিনী ঘর ও পথের দ্বন্দ্বের কাহিনী। জীবনের প্রথম পর্বে পথের মাঝখানে যে খেলাঘর গড়ে তোলে কমল, পরবর্তীকালে নানানতর ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে বহু পথ অতিক্রমের পর সে ঘর বাস্তব হয়ে ওঠে তার জীবনে। বাস্তব হলেও কমলের জীবনে সে ঘর কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। ঘর ছেড়ে সে তাই পথের বুকেই আশ্রয় নেয়।

মিলন-বিরহপূর্ণ এই প্রণয়-কাহিনী রচনায় আমাদের পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের মাঝখানটিতে তারাশঙ্কর যেন এক অতিকথার জগত নির্মাতা।

একাধিক আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি। কমলের প্রথম গ্রাম ত্যাগ, রসিকদাসকে পতিত্বে বরণ, কেঁদুলির পথে রঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, রঞ্জনের কাছ থেকে বিদায়-গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনায় যে আকস্মিকতার চমক আছে তারই সাহায্যে তারাশঙ্কর কাহিনীর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। কমলের জীবন-কাহিনী এই সমস্ত আকস্মিক ঘটনার দ্বারা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত। শিল্পশাস্ত্রের যুক্তিক্রম হয়তো এসমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত নয়, কিন্তু আকস্মিক উপাদান সন্নিবেশের সীমায়াত সংযমও তর্কসাপেক্ষ। কমলের জীবন-পরিণতি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গড়ে উঠে না। তারাশঙ্করের ভূমিকা এখানে বস্তুবাদীর নয়, ভাববাদীর। কমলের কাহিনীকে তাই পুরোপুরি বাস্তব বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা জাগে, আবার পুরোপুরি অবাস্তবও বলা চলে না। এ উপন্যাসে মাঝে মাঝেই ঔপন্যাসিকের সঙ্গে কবির দ্বন্দ্ব-বিরোধ বেধেছে। আবার সহযোগিতার নিদর্শনও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

...৩...

'রাইকমল' নায়িকা প্রধান উপন্যাস। নায়িকা রাইকমল কল্পনা আর বাস্তবের মিশ্রণে সৃষ্ট এক অপূর্ব চরিত্র। তারাশঙ্করের সে মানস-কন্যা, রাঢ়-বাংলার মাটি জলে তার বিকাশ। আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য আর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সে অধিকারিণী। জাত-বৈষ্ণবের কন্যা।

প্রেম-সরোবরের কমলিনী সে। বাল্য-কৈশোরের ক্রীড়াসঙ্গী রঞ্জনকে ভালোবাসে কমল। রঞ্জনের সে 'চিনি', রঞ্জন তার 'লঙ্কা'। সদ্যোন্মেষিত এ প্রণয় রঞ্জনের অভিভাবককুলের কাছে লাঞ্ছিত হয়। রঞ্জনের প্রতি আত্যন্তিক ভালোবাসাই রঞ্জনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় কমলকে। কামিনীর প্রতি তার উক্তি স্মরণযোগ্য: "চল মা......আমরা চলে যাই। সন্তান হারানোর অনেক দুঃখ মা। নন্দরাণীর দুঃখের কথা ভেবে দেখ।" (পৃ.৩৮৭) এ ভালোবাসা কিন্তু লুপ্ত হয় না, সুপ্ত থাকে। নবদ্বীপে প্রণয়লিপ্সু আত্মসমর্পণেচ্ছু যুবাবৃন্দের প্রতি তার আচরণ তাই আপনজনের অন্তরঙ্গতার পরিবর্তে নিতান্তই আতিথ্য-সংকারে পর্যবসিত। পরিস্থিতি বিপর্যয়হেতু আত্মরক্ষার প্রেরণায় সে

বৃদ্ধ রসিকদাসকে পতিত্বে বরণ করে, কিন্তু ভালোবাসে না। রসিকদাসের সঙ্গে তার দাম্পত্য-জীবনের দিনগুলি প্রাণোত্তাপবর্জিত।

পরবর্তী কালে রসিকদাসের বন্ধনমুক্ত কমল শ্যামসুন্দরের পট-পূজায় আত্মসমর্পণ করেও তৃপ্তি পায়নি: "ছবি পূজায় দীর্ঘ দুইটি বৎসর তাহার কাটিয়া গেল, কিন্তু মূক ছবি মূকই রহিয়া গেল। কোনদিন তো সে হাসিল না, স্বপ্নেও কোনদিন সে দেখা দিল না। কল্পনায় একটি কিশোর-মূর্তি মনে করিতে গেলে ফুটিয়া উঠে চঞ্চল কিশোর সখার রূপ।" (পৃ ৪১৯) রঞ্জনের পুনরাবির্ভাবে তার উপবাসী চিত্ত উন্মুখ হয়ে ওঠে, সুপ্ত প্রেম সোৎসাহে আত্মপ্রকাশ করে। কমল তাই রঞ্জনকে বলে: "বাউল বল, দেবতা বল, সবার ভেতর দিয়ে তোমাকেই চেয়ে এসেছি এতদিন।" (পৃ. ৪২৪)

রঞ্জনকে সে পায়, আবার হারায়ও। রঞ্জনকে ভালোবাসে বলেই রঞ্জনের নতুন সঙ্গিনীকে মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে বরণ করে নেয়। তার রক্তে বৈষ্ণবের উত্তরাধিকার। বিবাদেও প্রবৃত্ত হয় না, রঞ্জনের নতুন জীবনের বোঝাও হয়ে ওঠে না। কিন্তু প্রেমের লাঞ্ছনায় ঘর ছাড়ে, শ্যাম-কিশোরের সন্ধানে পথ হাঁটে। কিশোর রঞ্জনের যে মূর্তি একদা তার চিত্তপটে অধিকার বিস্তার করেছিল, সেই মূর্তি শ্যাম-কিশোরে রূপান্তরিত হয়। রাইকমলের প্রেম দৈবী চরিতার্থতা খোঁজে। অন্তহীন তার অভিসার।

রঞ্জন আত্মকেন্দ্রিক, প্রবৃত্তিতাড়িত, আধিপত্যপ্রবণ। সে জাত-বৈষ্ণব নয়, দীক্ষিত বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রাবল্যহেতু সে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেনি, পিতামাতার প্রতি আক্রোশবশত এবং বিধবা পরীকে অধিকারের জন্যেই ভেকধারী হয়েছে। পিতামাতার প্রতি ঐ আক্রোশের উপলক্ষ অবশ্য কমল। কমলের প্রতি তার আকর্ষণ জীবনের প্রথম পর্বে মিলনে চরিতার্থ হ'লে তার জীবনাচরণ ও জীবনদৃষ্টি হয়তো ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। কিন্তু অভিভাবককুলের তর্জনগর্জন ও বাধা দানে এবং কমলের আকস্মিক গ্রামত্যাগে প্রবৃত্তিতাড়িত রঞ্জন প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে উঠেছে। প্রবৃত্তি তাড়নাতেই সে পরবর্তী কালে পরী বর্তমানে কমলকে জীবনসঙ্গিনী করেছে, আবার কমল বর্তমানেই আর একটি তরুণীকে সাধনসঙ্গিনী করেছে। বৈষ্ণব ধর্মে তার দীক্ষাকে রঞ্জন যেন এভাবেই স্থূল স্বার্থসাধনে কাজে লাগিয়েছে। স্বভাবতই কমলের প্রতি তার প্রেমের আন্তরিকতায় সংশয় জাগে। স্মরণ-যোগ্য কামুর প্রতি তার উক্তি: "ছেলেবেলার খেলাধূলার কথা ছেড়ে দাও।

বয়সের সঙ্গে তফাত হলেই সব ভুলে যেতে হয়।" (পৃ. ৪০৯) যৌবন-উত্তীর্ণা কমলের প্রতি তার বিতৃষ্ণা অতীতের কমল আসক্তিকে রূপসৌন্দর্যলিপ্সার নিদর্শন হিসেবেই যেন চিহ্নিত করে। এমনও মনে হতে পারে যে, রঞ্জনের প্রথম যৌবনের প্রণয়-ব্যর্থতা তার অবচেতনে কমল-বিদ্বেষের সূচনা করেছিল, যা ছিল নিছকই সুপ্ত, তাই সময় ও সুযোগ মতো প্রকট হয়ে ওঠে।

রঞ্জন কৃষক-সন্তান। দেহে তার কৃষকের রক্ত। মহান্ত-জীবনেও তার পূর্ব সংস্কার সে ত্যাগ করতে পারে নি। স্মরণযোগ্য কমলের স্বগত চিন্তা: "রঞ্জন আখড়ার জমি-জমা লইয়া বড় বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছে। কাজের আর অন্ত নাই।" (পৃ. ৪৩২) মানসিকতায় কমলের সঙ্গে তার বিস্তর ব্যবধান।

কামিনী বিধবা বৈষ্ণবী। স্নেহ বাৎসল্যময়ী জননী। কমলসর্বস্ব জীবন তার। কমলের কীর্তন-দীক্ষা তারই কাছে। বৈষ্ণবীয় আদর্শ-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে কমলের অনুরাগ সঞ্চারেও তার অগ্রণী ভূমিকা। রঞ্জনের সঙ্গে কমলের বিচ্ছেদ-সংঘটনে সে দুঃখ পায়, কিন্তু রঞ্জন-জনকের আর্তি ও ব্যাকুলতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে তাই বলে: "মেয়ের চোখের উপর রঞ্জনকে আমি রাখব না মোড়ল। আমি ভিখারী, কিন্তু মেয়ে তো আমার কম আদরের নয়। আর বোষ্টম জাত, পথই তো আমাদের ঘর গো।" (পৃ. ৩৮৬) কামিনী কথা রাখে। কন্যাসহ নিঃশব্দে গ্রাম ত্যাগ করে। মর্যাদা-সচেতন সে। মহেশ্বরের সম্পত্তির প্রলোভন তাকে তাই আকৃষ্ট করে না "টাকা দোব আমি, তোমার মেয়েকে কিছু জমি লিখে দোব আমি কামিনী।"—মহেশ্বরের এই উক্তির উত্তরে সে তাই বলে: "ছি, আমার মেয়ের কি ইজ্জত নাই মোড়ল ?" (পৃ.৩৮৬)

বৃদ্ধ রসিকদাস তারাশঙ্করের আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কমল তার কাছে 'রাইকমল', আর সে হ'ল কমলের 'বগবাবাজী'। চিরকুমার রসিকদাস স্বভাব-উদাসীন, ভবঘুরে। ঘটনাচক্রে কামিনী-কমলের জীবনের সঙ্গে সে যুক্ত হয়। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমলের মালা-চন্দন তাকে গ্রহণ করতে হয়। এ ঘটনা তার নিস্তরঙ্গ জীবনকে আবর্তসঙ্কুল করে তোলে। চিরকুমার বৃদ্ধ বাউলের উপবাসী চিত্তে যে আলোড়ন-প্রাবল্য দেখা দেয় তা তার সংযম বিনষ্ট করে, সুখ বিনষ্ট করে, শান্তি বিনষ্ট করে। প্রবৃত্তিতাড়িত বৃদ্ধ বাউল আত্ম-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়: "রক্ত মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

নিশ্চল মূক—নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি তাহার। চোখের কোলে কোলে দুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন ধরা তটরেখার মত বিগত-বন্যার বার্তা যেন তাহাতে পরিস্ফুট।" (পৃ.৪০১) শেষপর্যন্ত রসিকদাস অজানার উদ্দেশে একাকী পাড়ি জমায়। কমল তার প্রকৃতই স্নেহের পাত্রী। কমলকে সে তাই বাঁধে না, মুক্তি দেয়। উপন্যাসের উপসংহারে কমল যে পথে বের হয় সে পথের সন্ধানদাতাও রসিকদাস; "কমল শুকায়, কিন্তু রাইকমল, সে তো কখনও শুকায় না।" (পৃ.৪৩৬)

কানু কমলের বাল্য সঙ্গিনী। কটুভাষিণী, কলহ-পরায়ণা। এই নারীটি কমলের এক বড়ো আশ্রয়। কমলকে সে ভালোবাসে, কমলকে সে তিরস্কার করে, আবার কমলের পক্ষ নিয়ে অন্যের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হয়। কমলের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। কমলের গোপন কথা কানুর কাছেই প্রকাশ পায়। স্মরণ করা যেতে পারে কমলের প্রতি তার উক্তি: "মা হ'স নাই তুই বউ, নইলে বুঝতে পারতিস, খাঁটি ভালোবাসায় মানুষের কাছে মানুষের কিছু গোপন থাকে না। কথা-না-ফোটা ছেলে কাঁদে। মা বুঝতে পারে, কোনটা তার ক্ষিদের কান্না, কোনটা রোগের কান্না, কোনটা রাগের কান্না। চোখের জল তোর গাল বেয়ে ঝরল না, কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, সে-জলে বুকের ভেতর তোর সায়র হয়ে গেল।" এবং কমলের প্রতিক্রিয়া: "কমল নতমস্তকে এ তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইল। এতক্ষণে চোখের জল মুক্তধারায় পায়ের তলার মাটি সুসিক্ত করিয়া তুলিল।" (পৃ.৪১০) সেদিক থেকে চরিত্রটির উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

রঞ্জন-জনক মহেশ্বর হিসেবী গৃহস্থ, পুত্র-স্নেহান্ধ পিতা। কমলের জীবনে তার আবির্ভাব নির্মম নিয়তিতুল্য।

পরী খেলার সংসারে এবং সংসারের খেলায় উভয় ক্ষেত্রেই পরাজিতা। সীমাহীন ব্যর্থতার বিপুল বেদনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে সে। কিন্তু নারীত্বের অবমাননা নীরবে সহ্য করেনি। রঞ্জনের সীমাহীন নির্লজ্জতাকে ধিক্কার জানিয়েছে। পরীর মৃত্যুকালীন উক্তি স্মরণযোগ্য: "তোমার মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। সরে যাও তুমি। আমি একা থাকব।" (পৃ,৪৩১) উত্তরকালে প্রণয়লাঞ্ছিতা কমলও কৃতজ্ঞচিত্তে তার কথা স্মরণ করেছে।

৪ ..

পরিবেশ-পটভূমি-চিত্রণে তাবাশঙ্করের নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। রাঢ-প্রকৃতি যেন এ উপন্যাসে জীবন্ত। রাঢের মাটি-জল, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখির সমন্বযে এমন এক সমগ্রতার সৃষ্টি হযেছে যা এই প্রণয়-আখ্যানের সৌন্দর্য-মাধুর্য বৃদ্ধি করেছে। রাঢ-প্রকৃতি সম্পর্কে লেখকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতার শিল্প-নিপুণ প্রকাশ উপন্যাসকে করে তুলেছে আকর্ষণীয। মনে হয, রাঢের মৃত্তিকা-বসে অভিসিঞ্চিত লেখনী-সহায়তায লেখক এ উপন্যাস বচনায় মনঃসংযোগ করেছেন।

উপন্যাসের পটভূমি অজয তীরবর্তী রাঢ-অঞ্চল। লেখকের কথায়: "অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এখানে 'কানু বিনে গীত নাই।' 'ধীরে সমীরে যমুনা তীবে' যে বাঁশি বাজে সে বাঁশির সুর এখানে ধ্বনিত হয। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষও জানে, 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায তারই ঠাঁই।' লোকে কপালে তিলক কাটে, গলায় ধারণ করে তুলসী কাঠের মালা। পুরুষেরা শিখা রাখে, মেয়েরা চূডা করে চুল বাঁধে। রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শুনে এ অঞ্চলের এক সন্তানের জননীরা জলগ্রহণ কবেনা। পুত্র-বিরহাতুবা যশোদার কথা মনে পডে যায়। হলুদমণি পাখি এখানে 'কৃষ্ণ কোথা গো' বলে ডেকে চলে। এ অঞ্চলে—"অধিকাংশই চাষীর গ্রাম। দশ-বিশখানা গ্রামের পরে দুই-একখানা ব্রাহ্মণ এবং ভদ্র সম্প্রদায়েব গ্রাম পাওয়া যায়। চাষীর গ্রামে সদ্‌গোপেরাই প্রধান, নবশাখার অন্যান্য জাতিও আছে। সকলেই মালা-তিলক ধারণ করে, হাত জোড করিয়া কথা বলে, 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারী 'রাধে-কৃষ্ণ' বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়; বৈষ্ণবেরা খোল-করতাল লইয়া আসে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়; বাউলেরা আসে একতারা বাজাইয়া। মুসলমান ফকিরেরা পর্যন্ত বেহালা লইয়া গান গায়—পুত্র-শোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব আখড়ায় পদাবলী গান হয়, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়, ঘরের খ'ড়ো বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিক পাখি 'রা-ধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রা-ধা, গো—পী ভজ' বলিয়া ডাকে। লোকে শখ করিয়া মালতী মাধবী ফুলের চারা লাগায়। প্রতি পুকুরের পাড়েই কদমগাছ আছে।

কদমগাছ নাকি লাগাইতে হয়। বর্ষায় কদমগাছগুলি ফুলে ভরিয়া উঠে, সেই দিকে চাহিয়া প্রবীণেরা অকারণে কাঁদে।" (পৃ.৩৭৩)

চাষীদের ছোট একখানি গ্রামে আমাদের নিয়ে যান লেখক। সেখানে—"মাটির ঘর, মেটে পথ, পথের দুই ধারে পতিত জায়গায় ভাঁটিফুল ফোটে, কস্তুরীফুল ফোটে, নয়নতারা অর্থাৎ লাল সাদা ফুল চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকে, অজস্র 'বাবুরি' অর্থাৎ বনতুলসী গাছের জঙ্গল হইতে তুলসীর গন্ধ উঠে। ছোট ছোট ডোবায় মেয়েরা বাসন মাজে, কাপড় কাচে; পাড়ের উপরে বাঁশবনে সকরুণ শব্দ উঠে; কদম, শিরীষ, বকুল, অর্জ্জুন, আম, জাম, কাঁঠাল বনের ঘনপল্লবের মধ্যে বসিয়া পাখি ডাকে। কোকিল, পাপিয়া, বেনে বউ, বউ কথা কও, ঘুঘু, ফিঙে, আরও কত পাখি, কাকেরা বাড়ির উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শডক শালিকে পথের ধূলায় ঘরের চালে কিচিমিচি কলরবে ঝগড়া করে। ঘরে চালের কিনারায় ঝুলাইয়া দেওয়া ঝুড়িতে হাঁড়িতে পায়রার বকবকম গুঞ্জন তোলে; সুখের ঘরেই নাকি পায়রার বাস—তাই সুখের আশায় মানুষেরা নিজেরাই বাসা বাঁধিয়া দেয়। চাষীরা মাঠে যায়। মেয়েরা ঘরের পাশে শাকের ক্ষেতে জল দেয়, লাউ-কুমড়া-লতার পরিচর্যা করে। ধান শুকায়, ধান তোলে, সিদ্ধ করে, ঢেঁকিতে ভানে। ছেলেরা সকালে কেউ পাঠশালায় যায়, কেউ যায় না, গোরুর সেবা করে। গ্রামখানির উত্তর প্রান্তের ছোট্ট একটি বৈষ্ণবের আখড়া কাহিনীটির কেন্দ্রস্থল। সুনিবিড় ছায়াঘন কুঞ্জবনের মত আখড়াটির নাম ছিল—হরিদাসের কুঞ্জ। হরিদাস মহান্ত ছিল আখড়াটির প্রতিষ্ঠাতা। আখড়াটির চারিদিক রাঙচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে আম, জাম, পেয়ারা, নিম, সজিনা গাছের ঘন পল্লবের প্রসন্ন ছায়া আখড়াটির সর্বাঙ্গ জড়াইয়া আছে নিবিড় মমতার মত। পিছনের দিকে কয় ঝাড় বাঁশ যেন দুলিয়া দুলিয়া আকাশের সঙ্গে কথা কয়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি মেটে ঘর আর তাহারই কোলে রাঙা মাটি দিয়া নিকানো ছোট্ট একটি আঙিনা—সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন মার্জনায় তকতক করে। লোকে বলে সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঠিক মাঝ-আঙিনায় একটি চারা গাছে জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে দুইটি ফুলের লতা—একটি মালতী, অপরটি মাধবী। শক্ত বাঁশের মাচার উপরে লতা দুইটি লতাইয়া বেড়ায় আর পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায় প্রায় গোটা বছর। লতা-বিতানটির নিবিড় পল্লবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা। ছোট ছোট পাখিগুলি ফুলে

ফুলে মধু খায় আর কলরব করে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্যন্ত।"(পৃ.৩৭৪)

"ঐ আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে—কামিনী ও কমলিনী। পল্লীবাসীরা দেশের ভাষা অনুযায়ী বলে, 'মা-বিঠীরা'। বৈষ্ণবের সংসার চলে ভিক্ষায়। কামিনী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনে। কিশোরী মেয়ে কমলিনী ঘরে থাকে, গৃহকর্ম করে, পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেলা করে, গুনগুন করিয়া গান গায়।" (পৃ.৩৭৫) লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের দলটিও ঐ আখড়ায় উপস্থিত হয়। কামিনী-কমলিনীর জীবন-লীলার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

…৫…

উপন্যাসের কথনরীতিও সবিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তারাশঙ্কর যেন গল্প লেখেননি, গল্প বলেছেন। বেছে নিয়েছেন কথকতার ভঙ্গি। লোককথা পরিবেশনের ভঙ্গির সঙ্গে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। যেমন—

১. 'পশ্চিম বাংলার রাঢ় দেশ।' (পৃ. ৩৭৩) ২. 'সে কাল আর নাই।' (পৃ. ৩৭৩) ৩. 'নবদ্বীপে কামিনী বেশ জাঁকিয়া বসিল।' (পৃ. ৩৯০) ৪. দিনে দিনে মাস কাটিয়া গেল। মাসে মাসে বৎসর পূর্ণ হইল।' (পৃ. ৩৯৬) ৫. 'ফুল ঝরিয়া যায়, আবার ফোটে।' (পৃ. ৩৯৮) ৬. 'রসিক ভিক্ষা করিয়া আনে, কমল রাঁধে-বাড়ে।' (পৃ.৩৯৮) ৭. 'দিন কয়েক পর।' (পৃ. ৪১৭) ৮. 'এমনই করিয়া কাটিয়া গেল কতদিন—পরিপূর্ণ দুইটি বৎসর।' (পৃ. ৪২০) ৯. …রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হয়।…প্রভাত হইতে আবার আরম্ভ হয়—হাসি গান, আনন্দ, অভিমান, অনুনয়, অভিনয়, অশ্রু। আবার মিলন হয়। আবার হাসি, আবার আনন্দ।' (পৃ. ৪৩১) ১০. 'এমনই করিয়া দিন কাটে। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর চলিয়া যায়।' (পৃ. ৪৩২)

সাধুরীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের আড়ালে কথন-ছন্দটি শ্রুতিগম্য। বর্ণনার ক্ষেত্রে সহজাত কবিত্বশক্তি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যদৃষ্টি সহায়তায় ব্যক্তি, বস্তু বা পরিবেশের রূপ ও স্বরূপ-চিত্রণে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য। পূর্বোক্ত হরিদাসের কুঞ্জ-বর্ণনায় যেমন এর সমর্থন পাই, তেমনিই পাই অন্যত্র। কয়েকটি নিদর্শন—

১. 'কমলি আজ চৌদ্দ বছরের কমলিনী। আজও দেহে তার ফুল ফোটে নাই কিন্তু তাহার চঞ্চল চরণের ঈষৎ সঙ্কুচিত গতিতে, রঙের চিক্কণতায়, নয়নের চটুল ভঙ্গিমায়, গালের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্তা ঘোষণা করিয়াছে।' (পৃ ৩৮০)

২. 'কমলের চুলের রাশি ছিল এলানো। পরনে টকটকে রাঙাপাড় তসরের শাড়ি একখানি। নাকে ক্ষীণ রেখায় আঁকা শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রকলার মত রসকলিটি যেন উঁকি মারিয়া হাসিতেছিল। কপালে সন্ধ্যার গোধূলি-তারার মত শুভ্র টিপ একটি।' (পৃ.৩৯৯)

৩. 'আজন্ম-কুমার বৈরাগীর বুকের ক্ষুধা এতদিন ঘুমন্ত জনের ক্ষুধার মত অবিচলিত ছিল। আজ আহার্য সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলায় সে-ক্ষুধা অজগরের গ্রাস বিস্তার করিয়া মাথা তুলিল। সে অজগর বাউলের আজন্ম সাধনায় অর্জিত বৈরাগ্যকে অসহায় বনকুরঙ্গের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে পিষিয়া মারিয়া সে তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিবে।' (পৃ.৪০২)

৪. 'সদ্য-ফসল-কাটা শুভ্র ক্ষেতগুলিকে বেড়িয়া বেড়িয়া পায়ে-চলা পথের নিশানা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুক্ল পক্ষের রাত্রি। দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তর-মেঘের মেলা আকাশ ছাইয়া থাকিলেও মেঘের আড়ালের দশমীর চাঁদের জ্যোৎস্নার আভায় ধরিত্রীর বক্ষ অস্পষ্ট উজ্জ্বল। সে অস্পষ্টতায় দেখা বেশ যায়, কিন্তু ভাল চেনা যায় না।··· শীর্ণ পথ লতার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া কত দিকে শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।'(পৃ. ৪২১)

উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও পাত্রপাত্রীর প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষায় বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের সুকৌশলী প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

১. কামিনী গান শিখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে স্বামী হরিদাস মহান্ত তাকে বলে: 'জান, এসব হল গোবিন্দের দান, এই রূপ এই কণ্ঠ—এর অপব্যবহার করতে নাই। এতে তাঁরই পুজো করতে হয়। এই গলা তিনি তোমাকে দিয়েছেন এতে তাঁর নাম-গান হবে বলে।' (পৃ.৩৭৫)

২ হরিদাসের অকাল-বিয়োগের উল্লেখে লেখক বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস-সংস্কারের বশীভূত: 'হরিদাস অকালে অল্পবয়সে দেহ রাখে। মরণকে উহারা মরণ বলে না, বলে দেহ রাখা।' (পৃ.৩৭৫) কামিনীর মৃত্যু সম্পর্কেও

তাঁর মন্তব্য : 'নবদ্বীপেই দেহ রাখিল।' (পৃ.৩৯৭) আর পরীর মৃত্যুতে তাঁর উক্তি : 'ওই দিন সন্ধ্যাতেই পরী দেহ রাখিল।' (পৃ.৪৩০)

৩. নবদ্বীপে কামিনীর আখড়ায়—'বৈষ্ণব মহান্তদের নিমন্ত্রণ হয়, পরম যত্নে সাধু-সেবা হয়।' (পৃ.৩৯০)

৪. কমলের পরিহাসে লজ্জিত রসিকদাসের স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত উক্তিতে বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন : 'রাধারানীর জাত কৃষ্ণপূজার ফুল—কী যে বল তুমি রাইকমল!' (পৃ.৩৯১)

৫. কমলের কাছে সুবলের সঙ্গে তার 'মালাচন্দনের' কথা তোলে কামিনী। (পৃ.৩৯২) 'মালা-চন্দন' হ'ল বৈষ্ণব-বিয়ের অনুষ্ঠান।

৬. প্রণয়-অনুরাগী সুবলের প্রতি কমলের শ্লেষাত্মক উক্তিতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের সুচতুর প্রয়োগ : 'গোষ্ঠের বেলা যায় যে সখা। তাই ভাবছি, সুন্দর সুবল-সখা আমার বাছনি বুকে এল না কেন? শ্যামের কাছে আমি যাব কেমন করে?' (পৃ.৩৯৪)

৭. দাম্পত্য-জীবন-ক্লিষ্ট কমল বৃন্দাবন যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অনুতাপ-জর্জর বৃদ্ধ রসিকদাস শিহরিত হয়ে বলে : 'না না না। অন্য কোথাও চল, ব্রজের চাঁদকে এ মুখ আমি দেখাতে পারব না।' (পৃ.৪০৩)

৮. নবদ্বীপ ত্যাগের পূর্বে কমল ঘর-দোরের একটা ব্যবস্থা করতে চাইলে রসিকদাসের উক্তি : 'সখি, বৈরাগী বাউল—হতে হয় হারায়ে দুকূল।' (পৃ.৪০৩) বাউলেরই উপযুক্ত উক্তি সন্দেহ নেই।

৯. তরুণী কমলের সঙ্গে বৃদ্ধ রসিকদাসকে দেখে জনৈক দর্শক তার পরিচয় জানতে চাইলে রসিকদাসের তীক্ষ্ণ সরস উত্তর : 'আজ্ঞে, আমার নাম খেঁটে-হাতে আয়ান ঘোষ গো প্রভু। বোষ্টুমীর বোষ্টম গো আমি।' (পৃ. ৪০৪) ইঙ্গিতগর্ভ এই উক্তিতে দর্শকের দল শাসিত হয়। বিনয়-মিশ্রিত ব্যঙ্গের নিপুণ নিদর্শন।

১০. রসিকদাসের কাছে কমল 'কৃষ্ণপূজার কমল-মালা', 'গোবিন্দের নির্মাল্য'।

বলা বাহুল্য, ভাষা-প্রসাধনে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ ব্যবহারে তারাশঙ্করের এই সচেতনতা উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ভাষার উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৌন্দর্যও উপেক্ষনীয় নয়—

১. চতুর্দশী কমলের গমনভঙ্গিটি উপমায় চিত্রিত হয় : 'সে চলিয়া যায়—চাপল্যে দেহে উঠে একটা হিল্লোল—নদীর নৃত্যপরা স্রোতের মত।

কথা বলিতে কথার আগে উপচিয়া পড়ে হাসি ঝরনাধারার ছলছল-ধ্বনির মত।' (পৃ.৩৮০) দু'টি উপমাই জল-সম্পৃক্ত। চাপল্য ও তারল্যের পরিচয়বহ।

২. কামিনী কমলকে সান্ত্বনা দেয়: 'নবদ্বীপে চাঁদের মত চাঁদ খুঁজে তোর বিয়ে দোব আমি।' (পৃ. ৩৮৭) বৈষ্ণব-ঐতিহ্যাশ্রয়ী একটি উপমা পায় নতুন ব্যঞ্জনা।

৩. কমলের 'নাকে ক্ষীণ রেখায় আঁকা শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রকলার মত রসকলিটি,·· কপালে সন্ধ্যার গোধূলি-তারার মত শুভ্র টিপ একটি'। (পৃ.৩৯৯) দুটি উপমাই আকাশসম্পৃক্ত। কমলের প্রসাধন-সৌন্দর্যের প্রশস্তি।

৪. বৃদ্ধ রসিকদাসের দেহ-ক্ষুধার বর্ণনায় যুগল উৎপ্রেক্ষার সার্থক সমাবেশ: 'ওই শীর্ণ বাহুতে যেন মত্ত হস্তীর শক্তি! কঙ্কাল যেন ফাঁসির দড়ির মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে! (পৃ. ৪০১)

৫. বাসর-রাত্রির অবসানে রসিকদাসের মূর্তি রচনাতেও উৎপ্রেক্ষার নিপুণ প্রয়োগ: 'রক্ত-মাংসের মানুষটা যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে।'(পৃ. ৪০১) অথবা—'চোখের কোলে কোলে দুইটি গভীর কালো রেখা দেখা দিয়াছে। শুষ্ক নদীর ভাঙন-ধরা তটরেখার মত বিগত-বন্যার বার্তা যেন তাহাতে পরিস্ফুট।' (পৃ. ৪০১)

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে তারাশঙ্করের শিল্প-সচেতনতা অভিনন্দনযোগ্য।

তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মতো 'রাইকমল' উপন্যাসেও পরিবেশ-পরিস্থিতি-উপযোগী আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। লৌকিক বাক্‌রীতি ও প্রবাদ-প্রবচনাদির প্রয়োগ-প্রাচুর্যও লভ্য। লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কিত আলোচনায় এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে।

...৬..

'রাইকমল' উপন্যাসের আর এক আকর্ষণ এর গানগুলি। গান বাদ দিলে এ উপন্যাসের রসাবেদন অনেকখানিই হ্রাস পায়। রাঢ়ের বাউল-বৈষ্ণবদের জীবন-আশ্রয়ে এ উপন্যাস রচিত। বাউল-বৈষ্ণবদের জীবনে গান নিছক

অবসর বিনোদনের ব্যাপার নয়, সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। স্বাভাবিকভাবেই তাই 'রাইকমল' উপন্যাসে গানের প্রয়োগ। তারাশঙ্করের কৃতিত্ব হ'ল প্রয়োগ-যাথার্থ্য। প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছেন তিনি।

গান কখনো পরিবেশচিত্রণ সহায়ক, কখনো চরিত্র-পরিস্ফুটক, কখনো বা জীবনদর্শন প্রকাশক। এককথায়, কথা-রসের সঙ্গে গীতি রসের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন তিনি।

উপন্যাসের প্রয়োজনে বিখ্যাত বৈষ্ণব মহাজনের পদের সাহায্য যেমন নিয়েছেন, তেমনি স্বরচিত গানও যুক্ত করেছেন। স্বরচিত গানগুলিতে শক্তিমান এক গীতিকারের সাক্ষাৎ পাই আমরা।

সুপরিচিত পদাংশের সুচতুর প্রয়োগ করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের পটভূমি রচনায় রাঢ়ের জনজীবনে চণ্ডীদাসের 'সুখ দুখ দুটি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই (পৃ. ৩৭৩)—পদ-পংক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। বৈরাগ্যদীপ্ত এই জীবনদর্শন বস্তুতপক্ষে রাঢ়ের মাটি-জলের সঙ্গেই যুক্ত। সমগ্র রাঢ়ভূমি যেন চণ্ডীদাসের কণ্ঠে তত্ত্বকথার ছলে চিরন্তন এক সত্যকে ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে কমলের জীবন-বৃত্তান্তেও ঐ তত্ত্ব সত্যেরই প্রতিষ্ঠা। এই পদ-পংক্তিটি তাই যেন ধুয়াপদের মতো বারংবার এ উপন্যাসে উচ্চারিত। সপ্তম পরিচ্ছেদের অন্তিমে বিশেষ পরিস্থিতিতে রসিকদাসের কণ্ঠে যখন এই পদ-পংক্তি পুনরায় গীত হতে শুনি (পৃ. ৪১১) তখন সেকথা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের সূচনায় মেঘলা অপরাহ্নে নিঃসঙ্গ কমলকে এ গান গাইতে শোনা গেছে। (পৃ. ৪৩৬) তার ব্যর্থ-বিড়ম্বিত দাম্পত্য-জীবনের কারুণ্য-বিষাদ এ গানে প্রতিফলিত। গান শেষে নতুন সঙ্গিনীসহ রঞ্জনের আবির্ভাবে এ গান কমলের জীবনে মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রঞ্জন 'বোষ্টম' হতে চাইলে কৌতুকপ্রবণ রসিকদাস গেয়েছে চণ্ডীদাসের পদ-পংক্তি: 'জাতি কুল মান সব ঘুচাইয়া চরণে হইনু দাসী।' (পৃ. ৩৮৩) কমলের জন্যই যে রঞ্জনের এই সংকল্প সে সম্পর্কে রসিকদাস সুনিশ্চিত। চণ্ডীদাসের রাধার উক্তিতে পাই সর্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা। রঞ্জনের ব্যাকুলতা তার সমতুল্য নয়। পরবর্তী কালে প্রমাণ হয়ে গেছে রঞ্জনের কমল-আকর্ষণ নিতান্তই সাময়িক, রাধিকার মতো সুচির-স্থায়ী নয়। রসিকদাসের পরিহাস তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে নবদ্বীপবাসিনী কামিনী অনূঢ়া কমলের বিয়ের কথা তুললে কমলের প্রশ্ন : 'দেহ দিয়ে গোবিন্দের পুজো করা হয় না মা ?…মালা কি মানুষের গলাতেই দিতে হবে ?' (পৃ. ৩৯২) তার উত্তরে রসিকদাসের উক্তি : 'মানুষের মধ্যে নিয়েই তাঁর পুজো করতে হয়। , জান, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' (পৃ, ৩৯২) চণ্ডীদাসের পদ-পংক্তির এই উল্লেখে স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণবীয় রস-সাধনার মর্মকথাটি অভিব্যক্ত। ঐ পরিচ্ছেদেই রসিকদাস চণ্ডীদাসের 'কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়…'(পৃ. ৩৯৫) পদের চারটি পংক্তি গেয়ে সুবল ও কামিনীকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। 'তুমি সে তাহার সরবস ধন তোমারি সে আছে ধনী' পংক্তিটি পরবর্তী কালে রসিকদাসের জীবনেই সত্য হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে dramatic irony-র নিদর্শন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের সূচনায় রূপমুগ্ধ রসিকদাসের কণ্ঠে পূর্ণ যুবতী কমলের রূপের প্রশস্তি-কীর্তন : 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়…' (পৃ. ৩৯৬)। কমলের ভ্রুকুটি আর তিরস্কার সে অগ্রাহ্য করে : 'ভোমরা বয়েস মানে না রাইকমল! আমরণ ফুলের রূপের বন্দনা গেয়েই বেড়ায়।' ঐ গান আর উক্তিতে পূর্ণ যুবতী কমলের প্রতি রসিকদাসের আন্তর-দুর্বলতারই ইঙ্গিত। রসিকদাস নিজেও অবশ্য সে সম্পর্কে এখনো সচেতন নয়। তার অবচেতন মনের লীলা-রহস্যকে ধরে রেখেছে ঐ পদ-পংক্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বহুদিন পর নিতান্তই পথ ভুলে কমল ও রসিকদাস স্বগ্রামে ফিরে এসেছে। পরিচিত পারিপার্শ্বিক পুরনো স্মৃতির উদ্রেক করেছে। পথ-চারী দু'টি নরনারীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটুকু ধ্বনিত হয়েছে রসিকদাসের কণ্ঠে : 'বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল' / দেখা না হইত পরান গেলে।' (পৃ, ৪০৬) ভিন্নতর পরিস্থিতিতে চণ্ডীদাসের রাধার আর্ত ও ব্যাকুলতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। বহুদিনের পরিত্যক্ত বাস্তু ভিটা যেন মিলন-ব্যাকুলা বিরহাতুরা মানবীর মতোই তাদের সম্ভাষণ জানিয়েছে। ঐ পংক্তিগুচ্ছ ভিন্নতর পরিবেশে দশম পরিচ্ছেদের শেষে কমলের কণ্ঠে গীত হয়েছে। কেঁদুলির রাধাগোবিন্দ মন্দিরে রঞ্জনের পুনর্দশন প্রাপ্তা কমলের ঐ গানে বিরহিণী রমণীর মিলন-বিহ্বলতার প্রকাশ। কমলের অন্তরালোড়নের সার্থক অভিব্যক্তি। ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কণ্ঠে একই পংক্তিগুচ্ছের উপস্থাপনা, অথচ তাৎপর্যে স্বতন্ত্র। এখানেই তারাশঙ্করের কৃতিত্ব।

পরিচিত গৃহস্থজনের দ্বারে দ্বারে রসিকদাস-কমল গান গায়, ভিক্ষা নেয়। গৃহস্থজনেরা সদ্য গ্রাম-প্রত্যাগত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে। রসিকদাস গানেই উত্তর দেয়: 'বল বল তোমার কুশল শুনি, তোমার কুশলে কুশল মানি।' (পৃ ৪০৭) চণ্ডীদাসের পদ-পংক্তির এ প্রয়োগ নিঃসন্দেহে চাতুর্যপূর্ণ। চণ্ডীদাসের পদে পাই কৃষ্ণ-সর্বস্বা রাধিকাকে। যে দয়িতের সুখে সুখী, দয়িতের দুঃখে দুঃখী। রসিকদাসের কণ্ঠে ঐ পদাংশের উচ্চারণ বৈষ্ণবীয় বিনয়-নম্রতার নিদর্শন হয়ে ওঠে।

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।' (পৃ. ৪১১)—সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষাংশে রসিকদাসের কণ্ঠে গীত চণ্ডীদাসের পদ-পংক্তি অসমবয়সী দুই নর-নারীর বিষাদ-মলিন দাম্পত্য-জীবনের ইঙ্গিতবহ।

একাদশ পরিচ্ছেদের সূচনায় কমলের গুঞ্জন-গানে প্রিয়-মিলনের উল্লাস: 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়ামুখচন্দা।' (পৃ. ৪২৫) গানটিতে কমলের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। গানটি বিদ্যাপতির রচনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দু'টি পদাংশের উল্লেখ। মিলন-সুখ-বিহ্বল রঞ্জন-কমলের জীবন-যাত্রার বর্ণনায় 'রাই জাগো—রাই জাগো' পদাংশের প্রয়োগ (পৃ. ৪৩১)। দেববিগ্রহের সান্ধ্য-কীর্তনকালে কমলের অন্যমনস্কতায় তার কণ্ঠে উচ্চারিত: 'এভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—' (পৃ. ৪৩৩)। মাথুরের এই পদ-পংক্তিতে আসন্ন বিরহের আভাস, অশুভের ইঙ্গিত।[২]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের অন্তিমে কমলের কণ্ঠে দুটি গীতের অংশবিশেষ সন্নিবেশিত। চণ্ডীদাসের রাধিকার 'সখি বলিতে বিদরে হিয়া। আমারই বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া॥'—উক্তিতে প্রণয়-অভিশপ্তা কমলের হৃদয়-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। আর জ্ঞানদাসের 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে[৩] প্রতি অঙ্গ মোর॥'—পদ-পংক্তিতে শ্যামকিশোর-অনুরাগিণী রূপপিপাসিনী কমলের হৃদয়াকুতির প্রকাশ। অসীমের প্রতিই এ আকুতি।

সন্দেহ নেই, 'রাইকমল' উপন্যাস-রচনায় পদাবলীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তারাশঙ্করকে প্রভূত সহায়তা করেছে। পদকর্তা মহাজনগণের কাছে ঋণী তিনি। কিন্তু বৈষ্ণব-গীতির নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতেই তাঁর কৃতিত্ব। বৈষ্ণব-গীতির এমন সুনিপুণ প্রয়োগ তাঁর পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে দেখা যায় নি। মধুকরের মতোই সংগ্রহবৃত্তি তাঁর; আবার মধুকরের মতোই নতুন মধুভাণ্ড নির্মাতা।

প্রয়োজনে স্বরচিত গানও সন্নিবিষ্ট। বৈষ্ণব মহাজনের ঝুলিতে যখন প্রার্থিত গানটি মেলেনি, তখন স্বয়ং পদাবলীরসে অভিষিক্ত মন নিয়ে গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তারাশঙ্কর। প্রথম পরিচ্ছেদে যে গানটি গেয়ে রসিক-দাসের আবির্ভাব ঘটেছে সে গান তারাশঙ্করেরই রচনা। 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে' (পৃ. ৩৭৫-৬)—গানটিতে পথরসিক বাউলের আত্মবিড়ম্বনার বিষাদ-করুণ স্বীকৃতি[৪]। কাঙ্ক্ষিত ব্রজধাম দূরায়ত্ত। পথের সন্ধান অজানা। অন্যদিক থেকে গানটিকে নাট্যশ্লেষের নিদর্শনও বলা চলে। কেননা, পরবর্তী অংশে রসিকদাসের জীবননাট্যে প্রকৃতই পথ-হারানোর পালা এসেছে। মোহান্ধ রসিকদাস কামনা-বাসনার চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে।

ঐ পরিচ্ছেদেই তার কণ্ঠে পাই আর একটি গান: 'ফুটল রাইকমলিনী বসল কৃষ্ণভ্রমর এসে …।' (পৃ. ৩৭৮) রঞ্জন-কমল দুই কিশোর-কিশোরীর লীলার মধ্যে সে দেখে চিরন্তন ব্রজলীলার প্রতিরূপ। রঞ্জন যেন 'কৃষ্ণ-ভ্রমর', আর কমল 'রাই কমলিনী'। কলঙ্ক-গঞ্জনা অর্থহীন। গানটিতে ভাববিভোর লীলারসিক বাউলের আনন্দমগ্নতার প্রকাশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরিহাস-চপলা কমলের কণ্ঠে দু'টি গান সন্নিবেশিত (১. 'ননদিনীর কথাগুলি নিমে গিমে মাখা '…এবং ২. 'ও আমার দারুণ ননদিনী…')। নবদ্বীপ যাত্রার পূর্বে আবাল্যের সঙ্গিনী কানুকে, তার খেলাঘরের ননদিনীকে হৃদয়-বেদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে ঐ গান সে শুনিয়েছে। পরিচ্ছেদের শেষে কমলকে সম্বোধন করে রসিকদাস গেয়েছে একটি কলি: 'গোরার সেবা গোরাচান্দ চল দেখে আসি।' (পৃ. ৩৯০) এখানে পাই নবদ্বীপ-যাত্রার মানসিক প্রস্তুতির পরিচয়। দ্বিতীয় গানে ('মথুরাতে থাকলে সুখে আসতে তারে বলিসনেগো। …' (পৃ. ৩৯০) রাধা-কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে রঞ্জনের মঙ্গলের জন্যে কমলের স্বার্থত্যাগের ইঙ্গিত।

আলোচ্য উপন্যাসে সন্নিবেশিত গানগুলির প্রয়োগ-যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

…৭…

তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনাই রাঢ়ের লোকঐতিহ্যের উপাদান-উপকরণে সমৃদ্ধ। রাঢ়ের লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারী তিনি। 'রাইকমল' উপন্যাসটিও লোকঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্ট। তারাশঙ্করকে অনুসরণ

কবে লোকঐতিহ্যের জগতটিতে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে—

১. তরুলতার জগত : নানা শ্রেণীর তরুলতার উল্লেখ এ উপন্যাসে লভ্য। যেমন—

(ক) ফলসম্পৃক্ত : আম, জাম, কদম্ব, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা, সজিনা, লাউ-কুমড়া ইত্যাদি।

(খ) ফুলসম্পৃক্ত : কস্তুরী, গাঁদা, নয়নতারা, বকুল, ভাঁটি, মাধবী, মালতী, রাধাপদ্ম, সন্ধ্যামণি প্রভৃতি।

(গ) অন্যান্য : অর্জুন, নিম, বাবুরি (বনতুলসী), বাঁশ, রাংচিতা, শিরীষ ইত্যাদি।

২. বিহঙ্গ-জগত : কাক, কোকিল, ঘুঘু, পাপিয়া, পায়রা, ফিঙে, বউকথা কও, বেনে বউ, মধুকুলকুলি, শালিক, হলুদমণি প্রভৃতি।

৩. গৃহজগত :

(ক) গৃহস্থালী দ্রব্য : আয়না, কলসী, কুড়ুল, ঘট, ঘড়া, জাঁতি, ঝুলনা, ঝাঁটা, ঢেঁকি, ঢেঁড়া, তোষক, পিঁড়ি, পোঁটলা, প্রদীপ (পিদিম), বঁটি, বালিশ, বাসন, শনের দড়ি ইত্যাদি।

(খ) পরিধান-প্রসাধন-সম্পৃক্ত : কাপড়, কুমকুম, গামছা, চন্দন, তিলক-মাটি, তুলসীকাঠের মালা, বিঁড়ে খোপা, রুলি, সিন্দুর প্রভৃতি।

(গ) খাদ্যদ্রব্য : গিমে শাক, নিমপাতা, মণ্ডা ইত্যাদি।

(ঘ) নেশা-সামগ্রী : তামাক, দোক্তা, পান, বড় তামাক (গাঁজা) প্রভৃতি।

(ঙ) বাদ্যযন্ত্র : একতারা, করতাল, খঞ্জনী, খোল, বেহালা, মৃদঙ্গ ইত্যাদি।

(চ) বিবিধ : আগড়, জাফরি, বাঁশের বেড়া, রাংচিতার বেড়া প্রভৃতি।

৪. উৎসব-অনুষ্ঠান : দোল, ঝুলন, রাস ইত্যাদি।

৫. গান : কীর্তন।

৬. প্রথা : মালা-চন্দন (বৈষ্ণব-বিয়ে)

৭. বিশ্বাস-সংস্কার : (ক) রাত্রে বাঁশের বাঁশির সুর শোনা গেলে এক সন্তানের জননীর জলস্পর্শ নিষিদ্ধ। ট্যাবু বিশেষ। সন্তান-বিরহিণী যশোদা এই ট্যাবুর উৎস।

(খ) কোনো বৈষ্ণবের মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুর কথা না বলে বলতে হয় 'দেহ

রেখেছে।' আত্মার মৃত্যু নেই তাই এ উক্তি।

(গ) গৃহে পায়রার দল আশ্রয় নিলে গৃহস্থের সুখ বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থ তাই পায়রাদের জন্যে বাসা বেঁধে দেয়।

৮. লোক-ঔষধ : ঈশের মূল (সাপ ঈশের মূলকে ভয় পায়)।

৯. লোকনাম : (ক) দেবতাসম্পৃক্ত : পঞ্চানন, ভোলা, মহেশ্বর।

(খ) ফুলসম্পৃক্ত : কমল (কমলি, কমলিনী), কামিনী।

(গ) আকাশসম্পৃক্ত : কাদু (কাদম্বিনী)।

(ঘ) অতিপ্রাকৃত-আশ্রয়ী : পরী।

(ঙ) বৈষ্ণব ঐতিহ্যাশ্রিত : বিনোদ, সুবল।

(চ) কৌতুকাশ্রয়ী : বগ-বাবাজী।

১০. লোকভাষা :

(ক) বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ : বগ (ঘোষীভবন), বড তামাক (অর্থ-বিস্তার : গাঁজা অর্থে), বোষ্টম, বষ্টুমী (অর্ধতৎসম), মা-বিঠীরা (মহাপ্রাণতা), রাত বিরেত (সহচর শব্দ)।

(খ) লৌকিক বাক্-রীতি : অসন্তোষ প্রকাশক – 'দিনরাত ব্যাজ ব্যাজ করছে, মলাম আমি।' (কাদুর উক্তি : স্বামীর প্রতি, পৃ. ৩৮৮)। আতিথ্য প্রকাশক—'তামাক ইচ্ছে কর' (রসিকদাসের প্রতি মহেশ্বর, পৃ ৩৭৬)। আত্মসমর্পণমূলক—'রণে ভঙ্গ দিলাম আমি। পিঠে বাণ মারা ধর্মকাজ হবে না রাইকমল।' (কমলের প্রতি রসিকদাস, পৃ. ৩৯৩)। আশ্বাসপ্রদান—'সে তো আর বাঘ-ভালুক নয়।' (সুবলের প্রতি রসিকদাস, পৃ ৩৯৪)। ক্রোধ প্রকাশক—'মুড়ো-ঝাঁটা মার মুখে' (কমলের উদ্দেশে রঞ্জন-জননী, পৃ. ৩৮২), 'ছাই দোব মুখে তোমার' (রঞ্জনের প্রতি জননীর উক্তি, পৃ ৩৮২)। গালাগাল—'ছত্রিশ জেতে বোষ্টম' (রঞ্জন জননী : কমলদের উদ্দেশে পৃ. ৩৮১), শরম-নাশা জাত খেগো (রঞ্জনের উদ্দেশে জননীর উক্তি, পৃ. ৩৮২), 'রাক্ষুসী হারামজাদী কি নচ্ছার গো' (কমলের উদ্দেশে রঞ্জন-জননী, পৃ. ৩৮২)। ভর্ৎসনা—'মর মর মর, ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনা' (কমলের প্রতি কাদু, পৃ. ৩৮৮); 'কতকাল আর আমার গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবি তুই ?' (কমলের প্রতি কামিনী, পৃ. ৩৯২)। শপথ – 'কালীর দিব্যি' (কমলের প্রতি

রঞ্জন, পৃ. ৩৮০); 'যে চলে যায়, সে আমার মাথা খায়—মাথা খায়।' (রঞ্জনের প্রতি কমল, পৃ. ৩৯৫)।

(গ) প্রবাদ-প্রবচনাদির বহুল প্রয়োগে তারাশঙ্করের ভাষা হয়ে উঠেছে জীবনরস-সমৃদ্ধ। লৌকিক বাক্‌রীতিরই আর একদিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

(১) গ্রামের মাতব্বর মণ্ডল চাষী মহেশ্বর রসিকদাস বাবাজীকে তামাক খাওয়ার কথা বললে বাউল জবাব দেয়: 'ও ক্ষ্যাপা ভাত খাবি? না—পাত পাড়লাম, পাতা সঙ্গেই আছে।' (পৃ, ৩৭৬) ২. মহেশ্বর তার নাম জানতে চাইলে বলে: 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন—রসময় অনেকদূর,...বাপ মা নাম দিয়েছেন রসিকদাস।' (পৃ. ৩৭৬) ৩. রঞ্জন আর কমলের বাল্যক্রীড়ার আসরে রঞ্জনের প্রহারশাসিত কমলের ক্রুদ্ধ উক্তি: 'ভাত দেওয়ার ভাতার না, কিল মারবার গোঁসাই।' (পৃ. ৩৭৯) ৪. কমলের বিরুদ্ধে রঞ্জন-জননীর উষ্মার বহিঃপ্রকাশ: 'বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশি। রাই হেন কত মিলবে দাসী।' (পৃ. ৩৮২) ৫. স্বামীর সঙ্গে কাতুর কলহ-কালীন উক্তি: 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' (পৃ. ৩৮৮) ৬. ভোলা-জননীর কমল-বিরূপতা: 'যাকে দশে বলে ছি' তার জীবনে কাজ কি!' (পৃ. ৪১৬) প্রবাদ-প্রবচনাদির প্রয়োগে তারাশঙ্কর অব্যর্থ লক্ষ্য।

(ঘ) উপমা-উৎপ্রেক্ষা:

(১) 'রোদে-পোড়া চাষা আর আগুনে তপ্ত ফাল এ দুইই সমান।' (পৃ. ৩৭৮)

(২) 'ঝাল—ঠিক লঙ্কার মত' (পৃ. ৩৮১)

(৩) 'চাষার বুদ্ধির ধার কেমন? না, ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন।' (পৃ. ৩৮১)

(৪) 'সাপের মাথায় যেন ঈশের মূল পড়িল।' (পৃ. ৩৮২)

৮……

'রাইকমল' উপন্যাসের আলোচনায় তারাশঙ্করের অন্যান্য কয়েকটি রচনার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় ও আশ্বিন সংখ্যা 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' ও 'উল্কা' গল্পের উপসংহারে বৈষ্ণব-পদ-পংক্তির উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর, অবশ্য বৈষ্ণব জীবন-পরিবেশ গল্প দু'টিতে গৃহীত হয় নি। পদ-পংক্তির উল্লেখ ইঙ্গিতপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা-সঞ্চারী।

১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রসকলি' গল্পেই প্রথম বৈষ্ণব-জীবন-পরিবেশটি চিত্রিত হল। পুলিন-মঞ্জরীর বাল্য-প্রণয় ও তার পরিণাম এ গল্পের বিষয়বস্তু। পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর পরিণয়ে পুলিন-মঞ্জরীর প্রণয় বাধাগ্রস্ত। পুলিন-মঞ্জরীর দাম্পত্য-জীবনে মঞ্জরী যুগপৎ অমঙ্গলরূপিণী ও বরাভয়দায়িনীর ভূমিকা নিয়েছে। 'রাইকমল' উপন্যাসেও বাল্যপ্রণয়-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। অবশ্য আবেদনে ভিন্নধর্মী। পুলিন নিতান্তই নির্বোধ, মঞ্জরীর বাধ্য ও অনুগত। রঞ্জনকে নির্বোধ বলা চলে না। কমলকে সে লাভ করেছে, অর্জন করে নি। মঞ্জরী ভেকধারী বৈষ্ণবের কন্যা, রহস্যময়ী। কমলের রক্তে ও সংস্কারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-উত্তরাধিকার। শ্যাম-কিশোরের জন্য তার আর্তি ও ব্যাকুলতা আন্তরিক।

'রাইকমল' প্রথম গল্পকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। তারাশঙ্কর গল্পটির নাম দিয়েছিলেন 'স্বৈরিণী', পত্রিকা-সম্পাদক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গল্প-নামের পরিবর্তন ঘটান।

উপন্যাসের সূচনায় রাঢ়ের পটচিত্রটি নতুন সংযোজন। গল্পে রঞ্জন-কমলের বাল্য-প্রণয়, কামিনী-কমল-রসিকদাসের গ্রামত্যাগ ও নবদ্বীপবাসের প্রসঙ্গ আছে, আছে কমল-রসিকদাসের মালা-বিনিময় ও গ্রামে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ। গল্পে রঞ্জন বিবাহিত গৃহস্থ, পূর্ণ-যৌবনা কমলের রূপের প্রতি তার আসক্তি ও লোলুপতা কমলের ঘৃণার উদ্রেক করেছে। রসিকদাস আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। গল্পে রঞ্জন-জনকের নাম হরি মোড়ল। কানু-প্রসঙ্গ নেই। উপন্যাসে রঞ্জন-কমলের প্রেম-প্রসঙ্গ পল্লবিত, কমলের কৃষ্ণার্তি এনেছে গভীরতার ব্যঞ্জনা।

'রাইকমল' উপন্যাসটি 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' দুটি গল্পের মিশ্রণে

পরিমার্জিত রচনা।৫ 'মালাচন্দন' গল্পটি ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মালাচন্দন' গল্পের নায়িকা তুলসী বিধবা বৈষ্ণবী, সুকণ্ঠের অধিকারিণী, সুন্দরী তরুণী। শ্যামসুন্দরের পট-সেবায় দিন কাটে তার। কিন্তু শান্তি পায় না। কেঁদুলির পথে অকস্মাৎ পরম রূপবান মোহনদাস মহান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেঁদুলি থেকে আখড়ায় একাকী ফিরে আসে তুলসী। সুতীব্র আত্মদ্বন্দ্বের শেষে অনুভব করে, মানুষকে ভালোবেসেই দেবতার কাছে পৌঁছোতে হয়। এহেন অবস্থায় তুলসীর আখড়ায় মোহনদাসের আবির্ভাব ঘটে। উভয়ের মালাচন্দন হয়। পরবর্তী ঘটনা 'রাইকমল' উপন্যাসের প্রায় অনুরূপ। পরীর বদলে পাই রোগজীর্ণা ভামিনীকে। উপসংহারে আর একটি তরুণী শ্যামাঙ্গীর আবির্ভাব ঘটে। তুলসী শ্যামকিশোরের সন্ধানে বের হয়।

উপন্যাসের কমল-চরিত্রে তুলসী অধিকতর পূর্ণতা পেয়েছে। তুলসীর বাল্যসঙ্গিনী কাদুর প্রসঙ্গ উপন্যাসেও স্থানপ্রাপ্ত।

·২···

প্রসঙ্গত, বৈষ্ণবীয় উপাদান-উপকরণসমৃদ্ধ কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের তুলনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' গল্পের (আষাঢ় ১৩২১) প্রৌঢ়া আনন্দী বোষ্টমী সত্যসুন্দরের সাধিকা। জন্মসূত্রে সে বৈষ্ণবী নয়। বৈষ্ণব গুরুর কাছেও দীক্ষা নেয় নি সে। তার দীক্ষা বস্তুতপক্ষে আত্মদীক্ষা। অন্তরের প্রবল প্রবর্তনায় সংসারত্যাগিনী সে। রবীন্দ্রনাথের অরূপোলব্ধি তাঁরই ভাষায় আনন্দী বোষ্টমীর জবানীতে প্রকাশিত। আনন্দী আদর্শের উচ্চলোক-বিহারিণী। তুলনায় তারাশঙ্করের কামিনী-কমল বাস্তব জগতের অধিবাসিনী।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন থেকে চৈত্র এবং ১৩৩৯ সালের বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কমললতা-আখ্যান প্রকাশিত হয়। ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। তারাশঙ্করের 'রাইকমল' গল্প তার পূর্বেই প্রকাশিত (কল্লোল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)। নায়িকার নাম-সাদৃশ্য বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের কমললতা কবি-কল্পনার সৃষ্টি। তার কলঙ্কলিপ্ত অতীত জীবনটি অবশ্য বাস্তব। রাঢ় বাংলার মাটিজলের সঙ্গে তারাশঙ্করের কমলের ঘনিষ্ঠ যোগ।

শরৎচন্দ্রের কমললতাকে 'বানানো' হয়েছে ; তারাশঙ্করের কমল কিন্তু 'হয়ে উঠেছে'।

প্রশ্ন জাগে, একালের পাঠকের কাছে 'রাইকমল' উপন্যাসের আবেদন কতখানি ? রাঢ় বাংলার যে পরিবেশে কমলের জন্ম, সে পরিবেশ অধুনা লুপ্ত। এ উপন্যাসের আবেদন অনেকখানিই যে আঞ্চলিক তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পার্থিব কামনা-বাসনা, প্রেম-অপ্রেম, পাপ-পুণ্য অতিক্রম করে যে নারীটি চিরন্তন আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করেছে তার সেই যাত্রার একটি স্বতন্ত্র মহিমা আছে। রাইকমলের কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে দূরকালের কাহিনী, রহস্যময় ও বিস্ময়কর উপাদানে পরিপূর্ণ, কিঞ্চিৎ রোমান্সধর্মী। কিন্তু অন্য বিচারে এ কাহিনী চিরকালের কাহিনী। আসক্তি ও আসক্তিমুক্তির কাহিনী। 'রাইকমল' একই সঙ্গে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের সৃজন-সামর্থ্য ও সৃজন-দুর্বলতার বিশিষ্ট নিদর্শন।[৬]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. শুদ্ধ পাঠ : 'এলে'।

২. পদটি বিদ্যাপতি ও রায়শেখর উভয়ের নামেই প্রচলিত। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, পদটি 'পীতাম্বর দাসের অষ্টরস-ব্যাখ্যায় এবং পদরত্নাকরে শেখরের ভণিতায় পাওয়া' গেছে। তাঁর মতে, 'শেখরের ভণিতাযুক্ত ছত্রটিই সঙ্গততর পাঠ।'

৩. শুদ্ধ পাঠ : 'কান্দে'।

৪. গানটি পরবর্তীকালে রচিত একাঙ্কিকা 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'তেও সন্নিবিষ্ট।

৫. উপন্যাসাকারে প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৪১। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালে। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রথম প্রকাশিত হইলেও—রচনা হিসাবে 'রাইকমল' আমার প্রথম উপন্যাস। —ভূমিকা : দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬. আলোচ্য প্রবন্ধে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'তারাশঙ্কর রচনাবলী'র ৩য় খণ্ডের (১৩৭৯) পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখিত।

নাগিনী কন্যার কাহিনী, পুনর্বিবেচনা

বিজিতকুমার দত্ত

নাগিনী কন্যার কাহিনী তারাশঙ্কর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের ঠিক পরেই লিখেছেন। সেই কারণে উপন্যাস দুটিতে অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। যেমন উপন্যাসের কথনরীতিতে, আঞ্চলিকতা রক্ষায়, বিশিষ্ট গোষ্ঠীর রূপায়ণে, আদিম কৌম সমাজের প্রতি আগ্রহে এবং ইতিহাসের অমোঘ পরিণামচেতনায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। তুলনায় নাগিনী কন্যার কাহিনী কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত। কিন্তু আমাদের ধারণায় তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা নাগিনী কন্যার কাহিনী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর উপস্থিতি খুব বেশি। জমিদার মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা নেয় এই অন্ত্যজ শ্রেণীও তেমনি তারাশঙ্করের উপন্যাসে তাৎপর্যলাভে বঞ্চিত হয় না। কালিন্দী উপন্যাসে চিনিকলে খাটা সাঁওতাল মজুরদের কথা সকলেরই মনে পড়বে। কবি উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বটে কিন্তু তার দৈত্যধর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নি। আবার এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও নানা জাতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তারাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত।

নাগিনী কন্যার কাহিনীর সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থিরবেদে, বিষবেদে, ইসলামী বেদে এবং মেটেল বেদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক পাঠককে মনোযোগী করিয়ে দেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কোষকেঁধে এবং চাষী কাহাদের ভিন্নত্ব কোন্ দিক থেকে, তারাশঙ্কর সে বর্ণনায় উল্লাস বোধ করেন। আমরা বাংলা উপন্যাসে গ্রামের মোড়লদের কথা পেয়েছি। মঙ্গলকাব্যেও মোড়লরাই গ্রামের প্রধান এ তথ্য উল্লিখিত। বাংলা উপন্যাসে মোড়লদের কাহিনী বিস্তারিতভাবেই আছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়ও বনোয়ারি মোড়ল। কিন্তু বনোয়ারি আর পাঁচজন মোড়লের মতো নয়—বিশিষ্ট। ছত্রিশ জাতির হিন্দু সমাজে কার কি কাজ তা বেঁধে দেওয়া আছে। মোড়লও প্রধান। সেদিক থেকে চরিত্রটি ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়ে ওঠে। তেমনি

আমরা পাই নাগিনী কন্যার কাহিনীতে মহাদেব-গঙ্গারামকে। মহাদেব-গঙ্গারাম গোষ্ঠীপ্রধান বটে কিন্তু তাদের প্রাধান্য বনোয়ারির মত একচ্ছত্র নয়। বনোয়ারির প্রতিদ্বন্দ্বী করালী। তুলনায় করালী দুর্বল। কিন্তু নাগিনী কন্যার কাহিনীতে মহাদেব-গঙ্গারামের প্রতিদ্বন্দ্বিনী শবলা-পিঙলা দুর্বল নয়। তাদের শক্তি ও উগ্র রূপ দেবীপ্রদত্ত। এখানে তারাশঙ্কর কৌমসমাজের আরও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। মাতৃদেবতার অলৌকিক ক্ষমতা মহাদেব-গঙ্গারামের নেই। বনোয়ারির মধ্যেও আমরা এই শক্তির পরিচয় পাই না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্যে ইউরোপের পোপ ও রাজ-শক্তির দ্বন্দ্বের তুলনা করেছিলেন। আমার ওই তুলনা ঠিক বলে মনে হয় খানিকটা—সবটা নয়। উপন্যাসের প্রকরণের আলোচনায় এই বিচার চলতে পারে, কিন্তু সমাজেতিহাসের দিক থেকে বিচার হওয়া উচিত অন্য মানদণ্ডে। প্রত্ন ইতিহাসের মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গেই তারাশঙ্করের গল্পের যোগাযোগ। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্র আমরা যা পাই, বেদে সমাজের মধ্যে তারই প্রতিরূপ। সাপ প্রজননের প্রতীক। সাপের দেবী মনসা। মনসার কন্যা শবলা-পিঙলা। অতএব যে-সাপ বেদেসমাজের আহার জোগায় তার দেবী এবং দেবীর কন্যার মর্যাদা এই সমাজে কতটা হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে। প্রজনন মানেই সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধির, শুভাশুভর প্রতীক রূপেই শবলা-পিঙলার অস্তিত্ব। আরও লক্ষ করতে বলি, এই দুই কন্যাই বিবাহিত এবং বিধবা। কৌমার্য যতদিন রক্ষিত ততদিন কন্যাদ্বয় গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত। কিন্তু বিবাহ দেওয়া হল কেন? এ কি বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীকে স্মরণ করে। বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু শবলা-পিঙলা ফিরে পায় নি। পাওয়ার কথাও নয়। আসলে দেবদাসী প্রথারই ঈষৎ ভিন্ন রূপ এখানে পাই। দেবদাসী প্রথায় কন্যার বিবাহ হয় দেবতার সঙ্গে। এখানে মানুষের সঙ্গে বিবাহ। স্বামীর মৃত্যুর পর কন্যার পুনর্বিবাহ অসম্ভব। সেই নারীর মধ্যে যখন যৌন-কামনা জাগে তখন তার পতন অনিবার্য। মহাদেব-গঙ্গারাম কন্যাকে নিজের সম্পত্তি ভাবে। তার পদস্খলন দ্বন্দ্বও অবশ্যম্ভাবী।

প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আদিম সমাজে লক্ষ করা যায়। মানুষ যতই এগিয়েছে ততই তাকে বন্ধন স্বীকার করতে হয়েছে। আবার এই প্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত বটে কিন্তু একেবারে শাসনবিহীন নয়। সমাজ গড়ার তাগিদেই, আত্মরক্ষার খাতিরেই এই শাসনকে মেনে নিতে হয়েছে। বাইরের আঘাত

থেকে সেজন্যে তারা যতদূর সম্ভব নিজেদের গুটিয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব অনিবার্য। মানুষ তো স্বার্থপর। স্বার্থরক্ষার খাতিরেই তাকে দ্বন্দ্বে নামতে হয়। সেকথা পরে বলছি। তারাশঙ্কর যেমনভাবে এই বেদে সমাজকে দেখেছেন সেকথা আগে বলা দরকার।

সৃষ্টিকাল থেকে পৃথিবীতে কত মন্বন্তর হ'ল, এক-একটা আপৎকাল এল, পৃথিবীতে ধর্ম বিপন্ন হ'ল, মাৎস্যন্যায়ে ভ'রে গেল, আপদ্ধর্মে বিপ্লব হয়ে গেল, এক মনুর কাল গেল, নতুন মনু এলেন—নতুন বিধান নতুন ধর্মবর্তিকা হাতে নিয়ে। কিন্তু এই পরিবর্তনের স্পর্শ বেদে সমাজকে ছুঁতে পারলে না। তারাশঙ্কর বলছেন 'যারা নাকি আরণ্যক, তারা প্রতিবারই প্রতিটি বিপ্লবের সময়েই গভীরতর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাদের আরণ্যক প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখলে। সেই কারণেই এরা (বেদে সমাজ) সেই ভূতকালের মানুষই থেকে গিয়েছে! মনু বলেন, শাস্ত্র পুরাণ বলে, এদের জন্মগত অর্থাৎ ধাতু এবং রক্তের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এবং সেইটিই এর কারণ। এই ধাতু এবং রক্তে গঠিত দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করেন, তিনি মানবাত্মা হ'লেও ওই পতিত দূষিত আবাসে বাস করার জন্যেই তিনিও পতিত এবং বিকৃত হয়ে এই ধর্মে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বিকৃতিই ওদের স্বধর্ম।...মহাভারতে ধর্মব্যাধ নিজের আচরণ বলে পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়েছিলেন। এক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকুমার তাঁর কাছে সেই তত্ত্ব জানতে গিয়ে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। সেই আরণ্যক মানুষের বর্বর জীবন, অন্ধকার ঘর, চারিদিকে মৃত পশু, মাংস-মেদ-মজ্জার গন্ধ, শুষ্ক চর্মের আসন-শয্যা, কৃষ্ণবর্ণ রূঢ় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ গোলাকৃতি চোখ, মুখে মদ্যগন্ধ দেখে তা'র মনে প্রশ্ন জেগেছিল। এ কেমন করে চরম মুক্তি পেতে পারে? ব্যাধ বুঝেছিলেন ব্রাহ্মণকুমারের মনোভাব। তিনি তাকে সম্ভাষণ আবাহন করে বসিয়ে বলেছিলেন—এই আমার স্বধর্ম।' (২ ৫০, চতুর্থ সং)। তারাশঙ্কর আরো বলেছেন এরা জ্ঞান পায়নি। পেয়েছে স্বাস্থ্য এবং আয়ু। পতিত এবং দূষিত ধাতু ও শোণিত গঠিত দেহবাসী আত্মার পক্ষে এই আর্য-আচরণ অনধিগম্য, এটাতে ওদের অধিকারও নেই, এবং অনধিকারচর্চায় ওদের অনিষ্ট হবে। বলাবাহুল্য উপন্যাসে এই অন-আর্য সমাজের বিধিবিধান, আচার-আচরণ, ধর্মীয় সংস্কার প্রথার অনুপুঙ্খ বর্ণনা-বিবরণ তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন। উপলব্ধি অভিজ্ঞতা কল্পনার সমবায়ে উপন্যাসটিতে এই সমাজের চিত্র গভীর অনুরণনে স্পন্দিত।

প্রত্ন প্রাচীন সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে তারাশঙ্করের ব্যাখ্যা আমরা এখন মানতে পারি না। কতটা স্বেচ্ছায় আর কতটা উন্নত সমাজের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এরা গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক। বিকৃতিকে ভূষণ করে নিয়ে পরমপ্রাপ্তি সম্ভব কিনা জানিনা। কিন্তু বিকৃতি বিকৃতিই। আসলে যেটা লক্ষ করবার ব্যাপার সেটা হল এই সমাজের প্রতি তারাশঙ্করের আন্তরিক সহানুভূতি এবং গভীর অভিজ্ঞতা, ইংরেজিতে যাকে বলে এক্সপিরিয়েন্স এবং রেঞ্জ। আরণ্যক শক্তি এবং প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ততটা অভিজ্ঞতালব্ধ নয় যতটা ভাবনাচিন্তায়। কেননা আমরা অরণ্যে বাস করি না আর আরণ্যক শক্তিকে বিজ্ঞান কিছুটা পর্যুদস্ত করেছে। বরং বিজ্ঞানের অপ্রতিহত ক্ষমতাই এখন আরণ্যক শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথাগুলি বলার কারণ তারাশঙ্কর কিন্তু এই আরণ্যক শক্তির ভয়াবহতা যথার্থ পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। এবং যে মানুষগুলিকে এঁকেছেন তাদের মধ্যে ওই শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত লীলার প্রকাশ দেখেছেন। বনোয়ারি, করালী, মহাদেব-গঙ্গারাম এই শক্তিকে প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বদা নয়। কেননা এরা কেউই এখন আর অরণ্যচারী নয়। বনোয়ারি চাষবাস করে, করালী রেল লাইনের মজুর আর মহাদেব-গঙ্গারাম সাপ খেলা দেখিয়ে, বাজিকর সেজে জীবিকা অর্জন করে। তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনীতে মহাদেব ছুটে এসেছিল ধূর্জটীর কাছে পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে। সভ্য সমাজের দ্বারপ্রান্তে ঘটনাকে উপস্থিত করে তারাশঙ্কর অ-সভ্য সমাজের বিপরীত চিত্রটিকে গভীর করে তুলেছেন।

তারাশঙ্কর গভীর অরণ্যের আর্তনাদ শুনতে পান। বিভূতিভূষণও অরণ্যের কথা বলেন। সে অরণ্য কিন্তু এই জাতীয় নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের দাও ফিরে সে অরণ্যের মোহকাতরতা। অনন্ত বিস্তার অরণ্যাণী মায়ার সৃষ্টি করে। বেদনা, হর্ষ পুলকে আত্মীয় করে নিই। তারাশঙ্কর যে অরণ্যের কথা বলেন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সে অরণ্যপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এরকম ভয়াবহ বর্ণনা দেন বটে কিন্তু তাতে আছে নির্যাস এবং সেটাই স্বাভাবিক [পৃথিবী কবিতা]।

যতদূর বুঝি তারাশঙ্কর নাগিনী কন্যার মধ্যে একধরনের দ্বন্দ্বকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শবলা-পিঙলা। একদিকে প্রায়

কুমারীত্ব রক্ষা অন্যদিকে যৌবনের দুর্মর আকর্ষণ। কুমারীত্বর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজের দাবি। ট্র্যাজেডি ঘনিয়েছে এখানে। দুটি ভালো-র সহাবস্থান সম্ভব নয়। অন্যদিকে যে রক্ষক অর্থাৎ মহাদেব ও গঙ্গারাম তারাই তার শত্রু হয়ে উঠল। তারাশঙ্কর তুলনা দিয়ে বুঝিয়েছেন এ তাদের জীবনের আদি পাপ। শিব যেমন আপন কন্যা মনসার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন তেমনি মহাদেব ও গঙ্গারাম।

মহাদেবের আসক্ত হওয়ার ইঙ্গিত অবশ্য খুব পাওয়া যাওয়া যায় না। কিন্তু গঙ্গারামের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবেই বলা যায় গঙ্গারাম পিঙলার প্রতি আসক্ত। মহাদেব ও শবলার দ্বন্দ্বও উপন্যাসে কিছুটা স্থান পেয়েছে। শবলা ধূর্জটির কাছেই মহাদেবকে বলেছিল যার যা পাওনা তা মিটিয়ে দিতে। ধূর্জটিকে সালিসী মেনেছিল শবলা। গোষ্ঠীর সবাই যে মহাদেবের ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট এটাও স্পষ্ট হয়েছিল তখন। মহাদেব শবলার এই আধিপত্য মেনে নিতে পারে নি। সে প্রতিশোধের অপেক্ষায় ছিল। এর কোন দ্বন্দ্বের চিত্র এখানে নেই। গঙ্গারামের অভিপ্রায়ের কথা তারাশঙ্কব বলেছেন। সে পিঙলাকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চলে যাবে। পিঙলা বরাবরই গঙ্গারামকে ঘৃণা করেছে। যদিও ঘৃণার কারণ আমরা কিছু পাই না। উপন্যাসের বিচারে যে কার্যকারণ সূত্র আমরা খুঁজি এখানে তার অভাব অবশ্যই অনুভূত হবে।

শবলা-পিঙলা'র ক্ষেত্রে আর একটি অভাব অনুভব করি। গোষ্ঠীর মানুষেরা শবলা-পিঙলার ভর হলে নাগিনীকন্যার প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়, ভয়ের জন্যই হোক অথবা সহজাত বোধ থেকেই হোক শবলা-পিঙলা যখন ঘোরের মধ্যে কথা বলে তখন সে কথা বেদে সমাজের কাছে মন্ত্রের মতই অমোঘ মনে হয়। সমাজ সে নির্দেশ পালন করে।

কিন্তু গোটা সমাজের সঙ্গে শবলা-পিঙলার যোগটা কিঞ্চিত দুর্বল মনে হয়। মহাদেব-গঙ্গারাম বনাম শবলা-পিঙলার দ্বন্দ্ব তখনই ভীষণ আকার ধারণ করতে পারত যদি এই দ্বন্দ্ব সারা সমাজের মধ্যে আলোড়ন তুলতে পারত। এ রকম কতকগুলি দৃশ্যের অপেক্ষা ছিল এই উপন্যাসে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় সেই অভাব অনুভূত হয় না। নাগিনী কন্যার কাহিনীর ক্যানভাস সেদিক থেকে আয়তনে ছোটো। আবার ছোটো বলে এই উপন্যাসের বৃত্তটি গভীর এবং হাহাকার মর্মান্তিক।

কেবলমাত্র আইডিয়ালিস্টের দৃষ্টি তারাশঙ্করের নয়। যদিও আইডিয়াবর্জিত সমাজ বা মানুষের কথা তারাশঙ্কর ভাবতেই পারেন না। তারাশঙ্কর বেদেদের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথার বর্ণনা যখন দেন তখনও তিনি ভুলে যান না এই সত্যের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কিম্বা রিচুয়ালগুলির বাস্তব ব্যাখ্যা সম্ভব। সেই কারণে তিনি গঙ্গারামের গন্ধ ছিটানোর কারচুপিকে অনাবৃত করেন। অর্থাৎ নারীর শরীর থেকে চাঁপাফুলের গন্ধ বার হওয়া ব্যাপারটার মধ্যে বিশ্বাস ছাড়া যুক্তির কোনো স্থান নেই। কিম্বা নাগিনী কন্যার উপর দেবীর ভর হওয়া ব্যাপারটাকেও কুমারী নারীর শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ বলে পাঠকের কখনও মনে হওয়া স্বাভাবিক। করালী তো বাবার বাহন সাপকে মেরে বুঝিয়েই দিয়েছিল বিশ্বাস ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই।

তাহলে কি আমরা বলব বাস্তবতার এই নির্মোহ দৃষ্টিই এই উপন্যাসে বিবেচ্য। তা কখনই হতে পারে না। অতীতের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক যেমন অতীতের বাতাবরণ চারিত্র্য সব কিছুরই প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তারাশঙ্করও তেমনি সেই বাতাবরণ এবং চারিত্র্য রক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগী, কিলিউংড বলেছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের রঙ্গমঞ্চকে এখানে স্থাপন করলেই চলবে না। অতীতের মানুষের সঙ্গে একধরনের একাত্মবোধও (আইডেন্টিফিকেশান) লেখকের পক্ষে প্রয়োজন। তারাশঙ্কর বাস্তবে এই চরিত্রগুলিকে দেখেছিলেন। কিন্তু এরা ভূতকালের মানুষ। সেই ভূতকালকে তারাশঙ্কর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। সেজন্যে এই উপন্যাসে ভূতকালের প্যাটার্নটি অনিবার্য, অব্যবহিতভাবে অব্যর্থ। বলা বাহুল্য এই লোকজীবনকে গ্রহণ করলে লোকজীবনের গল্পকথাকেই মর্যাদা দিতে হবে। এই উপন্যাসে সেই প্যাটার্ন লক্ষ করি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বক্তা শিবরাম—কবি ধন্বন্তরি। শিবরাম গল্পটি শুনিয়েছেন আমাদের। অতএব শিবরাম এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার মধ্যিখানে শিব সদাগর। শিবরাম গল্পটাকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে বেদে সমাজের বিধিবিধান এবং আচার ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করেছেন। সাপের বিষগালার দৃষ্টের কথা স্মরণ করতে পারি। একালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সেকালের বিষগালা পদ্ধতির পার্থক্যটি শিবরাম বুঝিয়ে দেন। শিবরামের গুরু ধূর্জটির জবানিতেও শিবরাম অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেন তাই। এই ব্যাখ্যা বুদ্ধিজীবী তর্কপরায়ণ মানুষের জন্যে। এই ব্যাখ্যায় যুক্তিতর্ক অপেক্ষা বেদেসমাজের প্রতি আনুগত্যই প্রধান। আন্তরিকতা এবং

চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ করবার বাসনাই একালে প্রধান। অন্যদিকে শিবরাম মাঝে মাঝে গল্পটিকে চরিত্রগুলির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যা শিবরাম দেখেন নি কেবল শুনেছেন সেই সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করার দায়িত্ব মহাদেব, শবলা, পিঙলার। শবলা এবং পিঙলাই প্রায় সব কথা বলেছে। আমরা তো প্রায় বলতে পারি নাগিনী কন্যার কাহিনী হচ্ছে শবলা পিঙলার আত্মকথা। উপন্যাসটির সূচনা কিন্তু একটু ভিন্নরকম। উপন্যাসের সূত্রপাত করেছেন যেন তারাশঙ্কর স্বয়ং। কিন্তু এখানেও বর্ণনা-বিবরণ-সংলাপ পরিবেশনের ছন্দটি আলাদা। কখনও মনে হয় লেখক, কখনও ধূর্জটি, কখনও শিবরাম। কেননা শ্রোতাকে সম্বোধন করা হচ্ছে এই মায়া এখানে সৃষ্টি হয়েছে।

মনে রাখতে হবে উপন্যাসটি ঠিক পাঠ করার জন্যে নয়। শোনবার জন্যে। আর যিনি শোনাবেন তাঁর করণকৌশল যিনি পাঠের জন্য লিখছেন তার থেকে আলাদা হবে। উপন্যাসটির শেষ ছত্রটি সেরকমই ইঙ্গিত দেয়: 'সাতালীর কথা শেষ, নাগিনী কন্যার কাহিনী শেষ, যে শুনিবা সে যেন দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিও'। বলা বাহুল্য আমাদের মঙ্গলকাব্যের প্যাটার্নও তাই।

তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনী

গুণময় মান্না

১.

গ্রামে একটা কথা চলতি আছে, অমুকেরা আশি বছর বয়স না হলে সাবালক হয় না। কেন বলে তা জানা নেই, কিন্তু তাবৎ মানুষের সম্বন্ধে কথাটা ভাবিয়ে তোলে বইকি। ঠিকই তো, কোনো এক বিশেষ মানুষ কোন বয়সে তার পূর্ণ রূপটি বিকশিত করে তুলতে পারবে তার নিশ্চয়তা কী। প্রত্যেকেরই দেবার কিছু থাকে, জোয়ার জলের শীর্ষতার মতো কোনো এক সময়ে তা উচ্চতম বিন্দুটিতে পৌঁছে যায়, তারপর তার থেকে নতুন কিছু চাইবার থাকে না।

কবি-সাহিত্যিকের রচনাধারার মধ্যেও সূচনা-আরোহ-শীর্ষতা-অবরোহ আছে। কার ক্ষেত্রে প্রকাশ-সুষমার যৌবন ঠিক কোন সময়ে দেখা দেবে তা বলা যায় না, অন্তত শারীরিক বয়সের নিরিখে নিশ্চয়ই নয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়স পর্যন্ত গল্প লিখেছেন, কিন্তু পদ্মা-পর্বেই তাঁর গল্পের যৌবন-কাল; তাঁর উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ ফসল 'চোখের বালি' আর 'গোরা' যদিও আগেপিছে অন্য ভালো উপন্যাসও আছে; পক্ষান্তরে, অমন জগৎ-বিশ্রুত কবির কবিতায় শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছিল কিন্তু তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ দশ বৎসরে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রতিভার শীর্ষবিন্দু 'বিষবৃক্ষ', অনেক মননশীলতা সত্ত্বেও পরের উপন্যাস-কায়ায় সে মায়া লাবণ্য ছিল না। শরৎচন্দ্র বিখ্যাত হবার আগে যে সব গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন—মেজদিদি বড়দিদি বিন্দুর ছেলে দেবদাস শ্রীকান্ত ইত্যাদি, অভ্রান্তভাবে সে গুলিই শরৎচন্দ্রের প্রতিনিধিস্থানীয়, তারপরে যা লিখেছিলেন তা ধনীর ছেলের মতো নিজেরই মূলধন ভাঙিয়ে খাওয়ার মতো। ভাবতে ইচ্ছে করে তিনি যদি আরো কিছুকাল রেঙ্গুনেই কাটিয়ে আসতেন, বা আর কিছুদিন পরে অত বিখ্যাত হতেন।

ঔপন্যাসিকের প্রতিভা-বিকাশের শীর্ষতা আর সৃষ্টির নিটোলত্ব এ দুটো কিন্তু সর্বদাই সমার্থক নয়। প্রত্যেক শিল্পীর মনের গঠন একেবারেই অনন্য, সে অনন্যতা বোঝা যায় তাঁর বিষয়-নির্বাচনে, চিন্তাধারা আর জীবন-ব্যাখ্যায়,

ভাষার রীতিতে। বহির্জাগতিক ও সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতে, বিশেষ ফ্যাশন বা হুজুগের উত্তেজনায় শিল্পী কখনো একটু বৈচিত্র্যের পথে পা বাড়ান না তা নয়, এ রকম প্রলুব্ধতা তো মানুষ হিসেবে তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু সেখানে তাঁকে নিজস্বতায় পাওয়া যায় না। প্রাজ্ঞ শক্তিমান শিল্পীরা কিন্তু বোঝেন কোন বিষয়ে তাঁর অধিকার আছে কোন বিষয়ে নেই, সহজ প্রলোভনের থেকে মনোবলে তিনি নিজেকে বিরত রাখেন। তবে কিনা মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটে থাকে।

সৃষ্টির সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য অন্য জিনিস। প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের রচনাতে তা বিরল। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মাত্র উপন্যাসেই শিল্পের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ, সমন্বয় ও সুষমা আছে, তা হচ্ছে 'কপালকুণ্ডলা', এবং রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস ও গঠন-কলার ত্রুটি বিমুক্ত নয়, অমন মহৎ উপন্যাস 'গোরা'-র কথা মনে রেখেও তা বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় ওই 'গোরা' উপন্যাসেই। তার মানে, ঔপন্যাসিক যেখানে নিজেকে সর্বোত্তম রূপে প্রকাশ করতেও পারছেন, সেখানে তাঁর রচনায় ত্রুটি থাকবেই না, এমন হতে পারে না। আর এটা বারেবারেই দেখা গেছে, প্রতিভা-বিকাশের আরোহ-শীর্ষ-অবরোহের নানা স্তর ব্যাপ্ত করে ঔপন্যাসিক যেমন একই রকম গুণপনার পরিচয় দেন, তেমনি তাঁর একই ধরনের ত্রুটিগুলো ফিরে ফিরে আসে।

'জলার্ক' পত্রিকার শ্রাবণ-পৌষ ১৩৯০ সংখ্যায় 'তারাশঙ্করের সর্বোত্তম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখবার উপলক্ষ হয়েছিল আমার। তাতে তারাশঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করেছিলাম। তাঁর বিপুল রচনা-ধারার মধ্যে ধাত্রীদেবতা কালিন্দী গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম এই চারটি উপন্যাসের অবস্থান ঠিক মধ্য পর্যায়ে; তার লেখার ক্ষমতাও তখন উত্তুঙ্গে, তাঁর নিজের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় সে সময় তাঁর কলমের গতি ছিল বল্গাহীন; যে কালের মানুষ তিনি সে কালেরও তখন পূর্ণ পর্যায়, তারপরে এসেছিল কালান্তর; যে সব বিষয়ের প্রতি তারা-শঙ্করের নাড়ির টান যেমন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি, সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র, জাতীয় আন্দোলন, গান্ধীবাদ, অহিংসা বনাম কম্যুনিজম্, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমবেদনা, তাদের মানবিক উত্তরণ—এসব উদাহরণ-প্রাচুর্যের সঙ্গে ওই উপন্যাসগুলিতে দেখা দিয়েছিল।

আর শিল্পকলা?—সে বিচারে পেয়েছিলাম যে কোনোটিই শিল্প-রচনার নিখুঁত উদাহরণ নয়, কিন্তু ওই চারটি উপন্যাসের মধ্যে আপেক্ষিকতায় 'ধাত্রী-

দেবতা'-ই শ্রেষ্ঠ, মধ্যমানের সার্থকতা 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এর, আর 'কালিন্দী'-ই বোধ হয় দুর্বলতম রচনা। এ বিচারের যুক্তিগুলির পুনরুপস্থাপনার ক্ষেত্র এটি নয়, সেখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তা হচ্ছে এই, গুণপনা এবং ত্রুটি-দুর্বলতা সমেত উক্ত চারটি উপন্যাসেই তারাশঙ্করের প্রতিভা-বিকাশের সর্বোন্নত পর্যায়।

একথা ভেবে নেওয়া ভুল হবে, এই যে আমরা শিল্পীর প্রতিভা-বিকাশের মধ্যাহ্ন-কালের কথা বলছি, সেটি কেবল দু'একটি গ্রন্থের মধ্যে বা নির্দিষ্ট এক সাল-তারিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। উল্লেখিত পর্যায়ের পরও তারাশঙ্কর লিখছেন 'কবি' 'বিচারক' এবং 'সপ্তপদী'। এসবে তারাশঙ্কর নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচারই করেছেন। আবার একথাও স্মর্তব্য যে শিল্পীর অবরোহ কালের রচনায় কোনো গুনপনা থাকবে না সেটাও ঠিক নয়, বরঞ্চ লেখকের পূর্বতন অভিজ্ঞানপ্রবণতাগুলি এই পর্যায়েই অনেক সময় তীব্রতর রূপে আত্ম-প্রকাশ করতে থাকে। তবে ক্বচিৎ এই উপাদানগুলি আগেকার সজীবতা নিয়ে আসে, এসবের একপেশে তীব্রতাই অন্যান্য উপাদানের অসহযোগে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৩৫৭) তারাশঙ্করের শিল্পি-মানসের এই অবরোহ-কালের রচনা। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে মূলত সর্পজীবী বেদেদের জীবন। তারাশঙ্কর চিরকাল ডোম-বাগদি-কাহার-মুচি প্রভৃতি মানুষের কথা লিখতে ভালোবেসেছেন, এখানেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আগেকার কালে এই সব মানুষ এসেছিল বৃহত্তর জীবনের প্রেক্ষাপটে তারই অংশ হিসেবে, এই পর্বে তারাই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। রাঢ়ের আঞ্চলিকতা তারাশঙ্করের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য, 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' কিংবা 'কবি'তে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে ভাগীরথী তীরবর্তী হিজল বিলের অরণ্য-প্রকৃতি, জল-স্থল-আকাশ, তার ঋতু পরিবর্তন, কৃষি-মৎস্য-সর্পজীবিতার পরিপূর্ণ পরিচায়িকা। সহজেই বোঝা যায় তারাশঙ্কর এই পর্বে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। অন্য আর এক রকম রদবদলও এই পর্বে দেখা যায়।

'তামস তপস্যা' (১৩৫৪) 'উত্তরায়ণ' (১৩৫৭), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৩৫৮), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৩৫৯), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৩৫৯), 'বিপাশা' (১৩৬৪), 'রাধা' (১৩৬৪), 'যোগভ্রষ্ট' (১৩৬৭)—এই পর্বের

প্রধান উপন্যাসগুলির দিকে এক নজর তাকালেই দেখা যায়, তারাশঙ্করের মন থেকে কিছু জিনিস সরে গেছে, আবার নতুন কতকগুলি জিনিস তাঁর মনকে উদ্‌বেজিত করে তুলছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের মহিমা বর্ণনা করতে এক সময় তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন, হয়তো কালের পরিবর্তনে সে জিনিস তাঁর চেতনায় গৌণ হয়ে গেল। 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম-'এ গান্ধী-প্রণোদিত যে জীবনাদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছিল, এখানে তা নেপথ্যে সরে গেছে। 'তামস তপস্যা' 'উত্তরায়ণ' প্রমুখ উপন্যাসে সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেস-লীগ কম্যুনিস্টের পার্টি-গত বিরোধিতা (আগেকার মতো আদর্শগত নয়) বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। কালের পরিবর্তন, লেখকের মানসিকতায় আদর্শমুগ্ধতার স্থলে বিতর্কের উত্তেজনা এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ রূপে চিত্রিত হতে পারে। তারাশঙ্কর ক্রমেই সৃষ্টির রসাবেশ হারাচ্ছিলেন, অত্যুক্তি, ঝাঁঝালো মতবাদ অস্থৈর্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করছিল।

তারাশঙ্করের মধ্য-জীবনের সর্বোত্তম রচনাগুলির পর এদেশে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, কিন্তু জনজীবনে সে স্বাধীনতা কোনো গুণগত পরিবর্তন এনেছিল কি? স্পষ্টত আনেনি। শাদা মালিক চলে গিয়ে কালো মালিকের রমরমা বাড়ল। দেশি বুর্জোআর স্বার্থেই কল-কারখানা যান্ত্রিকতার দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। আদর্শের বুলির আড়ালে নীতিভ্রষ্টতা এবং ব্যভিচার, বহুবাঞ্ছিত জৈবনিক স্বাস্থ্যের জায়গায় সামাজিক ব্যাধি কোথাও প্রকট কোথাও অপ্রকট রূপে দেখা দিল। কোনো সুস্থ বলিষ্ঠ আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল না, না বামপন্থায় না দক্ষিণপন্থায়, যেমন কম্যুনিষ্ট তেমনি কংগ্রেসী মানুষ দেখা দিল খর্ব দেহে, এতটুকু স্বার্থের জন্য কাড়াকাড়িতে, নিম্ন মানের কুচক্রিতায়। তারাশঙ্করের সাধের জগৎ ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। তারাশঙ্কর এই পর্বে তাই পরম মমতায় লিখে রেখে যাচ্ছেন 'আমার কালের কথা,' 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ যে কালকে তিনি পিছনে ফেলে রেখে এসেছেন তারই কথা, রচনা করছেন বাবা-মা সমেত সেদিনের যেসব মানুষ অত সামান্য হয়েও অত সজীব আর পূর্ণতর ছিলেন তাদেরই আলেখ্য।

আর তারাশঙ্কর নিজে? বলছি—কিন্তু তার আগে তারাশঙ্করের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের দুই উপলক্ষে সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও একটু ব্যক্তিগত সংযোগের কথা বলে নিতে ইচ্ছে করছে। দু'বার তাঁকে দুই রূপে দেখেছিলাম।

প্রথমবার আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্মরণসভায় তারাশঙ্করকে আহ্বান করা হয়েছিল। আমার এখনও মনে আছে কী ভাবে তিনি সেই সভায় কথা বলেছিলেন। বিভূতি-ভূষণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে মৃদুস্বরে কথকতা করছিলেন তিনি। এপিসোড রচনা করতে ভালো লাগে তারাশঙ্করের, তিনি যেন সেই এপিসো-ডের মাধ্যমেই বিভূতিভূষণকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। ঠিক একটি গল্প রচনার মতো। সহজ ভাষা, অন্তরিত আবেগ, অনুত্তেজিত বাকভঙ্গি।

তার অনেক দিন পরে তাঁর টালা পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলাম এক সকালে, আমার সদ্য প্রকাশিত একটি বৃহদায়তন উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি তাঁকে উপহার দেবার জন্য। দেখলাম তখন তাঁর সেই শান্ততা আর ছিল না। ফরাসের ওপর বসেছিলেন, পাশে গোল্ড ফ্লেকের একটি কৌটো নিয়ে। একটা শেষ করেই আবার একটা ধরাচ্ছেন। বললেন, আমার উপন্যাস আগেই দেখেছেন তিনি। সেই নিয়ে দু'এক কথা হতে না হতেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। একান্তই ব্যক্তিক। একটা বিশেষ কারণের উল্লেখ করে বললেন, টালায় অত বড় বাড়ি তৈরী করা তাঁর উচিত হয় নি। তারপর আমার উপন্যাসটি ষ্টীল কারখানা নিয়ে শুনেই যান্ত্রিকতার প্রসঙ্গে চলে গেলেন এবং উত্তেজিত হয়ে ফরাস ছেড়ে খালি মেঝেতে এসে দাঁড়ালেন। বসা-বসা তীব্র অসিহিষ্ণু স্বরে বলেছিলেন, কী হবে দেশের কলকারখানা আর চরম উন্নতি নিয়ে, যদি তার সঙ্গে পরমের উন্নতি না হয়। ঘুরে ফিরে একটা কথাই বলছিলেন। কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁকে অস্থির উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছিলাম।

বস্তুত, তারাশঙ্কর যখন তাঁর সর্বোত্তম উপন্যাসগুলি রচনা করছিলেন, আর যখন নাগিনী কন্যার কাহিনী রচনা করছিলেন, তখন তাঁর মানসিকতা আর একই রকম ছিল না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর নিজেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। বাইসিকলে চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো মানুষ আর নন তিনি, তিনি এখন কলকাতাবাসী: তারাশঙ্কর ছিলেন সেবাব্রতী, ঝুমুর দলের কলেরা-রোগাক্রান্তা দেহোপজীবিনী এক মেয়ের সেবা করেছেন নিজের হাতে; এখন তিনি নানা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক; সম্মানিত সাহিত্য-সেবী। বীরভূমের ক্ষুদ্র জমিদারি এখন তাঁর পাদপীঠ নয়, প্রথম যুগের লেখার বিনিময়ে প্রাপ্য অনিশ্চিত সামান্য সম্বলের দিনগুলি বিগত, লেখাতেই এখন বিত্তগত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সবই ঠিক, তবু নিজেই তিনি অস্থির, অন্তরে

অতৃপ্ত। তিনি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী হিসেবে জেলে গিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে হয়তো অন্য আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তারপর ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে যোগ দিয়েছেন, সেখান থেকে আবার ছিটকে সরে এসেছেন মতাদর্শের পার্থক্যের জন্য। কিন্তু যাবেন কোথায়? গান্ধীবাদের যে অপপ্রয়োগ দেশে ও সমাজে দেখেছিলেন, তখন তাকেও বরণ করা তাঁর পক্ষে ছিল অরুচিকর। স্বভাবতই এসব ঘাত-প্রতিঘাত, মেকি জৌলুস আর কোলাহলের ঊর্ধ্বে একটি স্থির বিন্দুর অনুসন্ধান করছিলেন তিনি। পরমের প্রাপ্তি— এই কথাটি বলতে এবং লিখতে ভালোবাসতেন তিনি। এই সময় ধর্মীয় এবং আত্মিক বিশ্বাসের শরণাপন্ন হতে চাইছিলেন—যদিও ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো গভীর প্রত্যয় তাঁর রচনার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি।

সে যাই হোক, আমরা লক্ষ করব, পরিবর্তনশীল কালের অস্থিরতা, ঘাত-প্রতিঘাত আর তাঁর ব্যক্তিক জীবনের অস্থিরতা এই দুইএর সমপাত ঘটেছিল তাঁর অবরোহ কালের রচনার মধ্যে। তাই একালের উপন্যাসে দেখি, বারবার ফিরে আসছে পাপ-পুণ্যের প্রসঙ্গ, ধর্ম-অধর্ম, ব্যাধি ও তার প্রতিকার, বিজ্ঞান ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। সামাজিক সমস্যার প্রত্যেকটার দ্বারে করাঘাত করছেন তিনি, যেমন সেই সমাজ বিধৃত ব্যক্তি মানুষের আত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন।

আমাদেব আলোথ্য 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে তারাশঙ্করের সমকালিন মানসিকতার এই সব বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়েছে। বেদেকুলের আদিম অভিশাপ বেহুলা-লখিন্দরের সময় থেকে কী ভাবে পুরুষ-পরম্পরায় আধুনিক কাল পর্যন্ত বয়ে এসেছে, তাদের নরনারীর মধ্যে পাপ ও ব্যভিচার কী রকম সর্বাঙ্গীন, যার থেকে বেদেকুলের প্রধান শিরবেদে পর্যন্ত কেউই মুক্ত নয়। এদের মধ্যে নাগিনীকন্যারাই নিজের ধর্ম ও বেদেকুলের মান-সম্ভ্রম ও কল্যাণ রক্ষা করতে গিয়ে কারুর বা পদস্খলন ঘটেছে, কেউ বা আত্মঘাতী হয়েছে। কাল-নাগিনীর বিষ কীভাবে অমৃতে পরিণত হয়। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ কোথায় বিষে রূপান্তরিত, কোথায় মিলন-সার্থকতায় পৌঁছে না। বস্তুত কাল-ধৃত সমাজ ও মানুষের যন্ত্রণা তারাশঙ্করের উৎকণ্ঠাময় মানস-বৃন্তে বিধৃত হয়ে আলোচ্য উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেছে।

২

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুটি জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, লেখক ভাগীরথী তীরবর্তী সর্প-অধ্যুষিত হিজল বিলকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের যা প্রধান দৃশ্যপট তার কুশীলব হিসেবে বেছে নিয়েছেন ওই হিজল বিলের আধিবাসী বেদে-সমাজের নরনারীকে। এর আগেও তিনি বিভিন্ন রচনায় বেদে ও বেদেনীদের উপস্থাপিত করেছেন, করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়-সমগোত্রীয় মানুষ কাহারদের। এই সব ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অঞ্চল এবং তার বিচিত্র নরনারীরা শহর থেকে দূরের তো বটেই, গড়পড়তা লোক-মানসেরও বাইরে। প্রচলিত পরিভাষায় যাকে বলে আঞ্চলিকতা, এই উপন্যাসে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।

শুধু তারাশঙ্কর কেন, এই যুগের অনেক লেখকের রচনাতেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আমরা পাঠকরা বারবার পেয়ে যাই 'পথের পাঁচালী' এবং 'আরণ্যক', পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং আরো পরবর্তী কালে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' কিংবা 'বেলাভূমির গান'। একটা বিশেষ নিরিখে এসবের প্রত্যেকটিই আঞ্চলিক সাহিত্য। কলকাতা-ঢাকার মতো বড় শহর নয়, দূরবর্তী ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চল, নদী-অরণ্য-কৃষিভূমি-সমাবৃত, যা এমনিতে অপরিচিত কিন্তু লেখকের রচনাগুণে যা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে, এ অঞ্চলের মানুষ যাদের জীবিকা-জীবনচর্যা অপরিচিত হয়েও ভিন্ন রসের স্বাদ বহন করে আনে—এসবই তো আঞ্চলিক সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু কেন লেখকরা আঞ্চলিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, কেনই বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সাহিত্যে টেনে নিয়ে আসেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে সমাজ-বাস্তবতার একটু গভীরেই প্রবেশ করতে হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আঞ্চলিক সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে মানুষের একটা ব্যথাহত অভিমান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। অভিমান এবং প্রতিবাদও। কিসের বিরুদ্ধে অভিমান ? সমাজে যারা শক্তিমান, দর্পী, উদ্ধত, তারই বিপরীত এবং সমান্তরাল এই জীবনচিত্র। ভাবখানা এই রকম : তোমরা অভিজাতেরা যত বড়ই হও না কেন, এই দীনেরাও বড়

চারিত্র্যে হৃদয়বত্তায় তোমাদের থেকে মহৎ। সাহিত্য সর্বদাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, এবং রুদ্ধ জীবন-প্রবাহকে মুক্তি দেয় নতুন জীবনের চিত্র এঁকে। এর নজির যে কোনো দেশের সাহিত্যেই পাওয়া যায়, যখন সে সাহিত্য তার পরিধি-বিস্তার করে নতুন জীবনকে আলোকিত করেছে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও এর অভাব নেই। চর্যাপদে শবর ডোম-ডোমনীকে টেনে আনা হয়েছিল অভিজাত উচ্চ বর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। পৌরাণিক দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পরবর্তী কালে দাঁড় করানো হয়েছিল মনসা আর চণ্ডীকে। মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ হয়েও তাঁর কাহিনীর নায়ক রূপে নির্বাচন করেছিলেন এক ব্যাধকে। এটা উচ্চবর্ণের সর্বাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও প্রতিরোধও।

সমাজের একটা অংশ শাসক ও অত্যাচারী, তাদেরই যত সমৃদ্ধি, বাকি অংশ অবহেলিত, শোষিত, তাদের অস্তিত্ব কোন ভারবহনের জন্যই। কিন্তু তাদের ব্যক্তিত্ব, আর মানবিক মর্যাদা? সেটি সমাজে স্বীকৃত হয় না, কিন্তু সাহিত্যে তা প্রতিভাত হয়, নতুন আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। সামগ্রিক সমাজসত্তার মুক্তি ঘটে তাতে। সাহিত্যপ্রবাহ বারবারই এই দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটেছে। পুরাতন গতানুগতিকতার পাশে নতুন মানুষ দেখা দিয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যে একদা মেজদিদি বিন্দু নারাণী দেবদাস এদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সমাজে এরা ছিলই, ছিল নেপথ্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন এদের সাহিত্যে আনলেন তখন আমাদের উৎকণ্ঠিত চিত্ত সানন্দ-প্রত্যাশায় তাদের বরণ করে নিল। নিল—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমাদের চিত্ত এক বিশেষ ধরনের চরিত্র এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় এমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে? সেটার কারণ ওই চরিত্রগুলোর মধ্যে নেই, থাকে আমাদের চিত্তের মধ্যে। এবা অবে পুত্রস্য কামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি।

শরৎচন্দ্রের পাঠকরা ছিল বুর্জোআ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শরৎচন্দ্রও তাই ছিলেন। ভারতীয় নবজাগ্রত বুর্জোআ তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে নিরত, কিন্তু সে ছিল ততোধিক কঠিন বিদেশি-বুর্জোআর শাসন-নিপীড়িত, অবহেলিত। লেখক তাই নিজেদের মর্যাদা চাইতে গিয়েই চাইছিল আরো অবহেলিতের নারাণী মর্যাদা, তার অনন্য স্বাতন্ত্র্য। শরৎসাহিত্যে অবহেলিত নারীর নতুন মর্যাদার নিগূঢ় কারণ ছিল সেখানেই।

বেদেরা বৃহত্তর সমাজের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, হয়তো কৌতূহল ছিল কিন্তু ভয় এবং উপেক্ষাও ছিল। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নাগিনীকন্যা শবলার বর্ণনায়

লিখলেন—

'এমন মসৃণ উজ্জ্বল কালো রঙ কখনও দেখেন নাই শিবরাম।···ছিপছিপে পাতলা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একরাশি চুল···পরনে লালরঙে ছোপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা শাড়ি, গলায় পদ্মবীজের মালা, তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি পাথর আরও অনেক কিছু ;···এ গন্ধ ওর গায়ের গন্ধ। যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখেনা, তাদের গায়ে একটু গন্ধ থাকে। মাল মাঝি বেদেদের গায়েও গন্ধ আছে, কিন্তু তাতে এই তীব্রতা নাই। এ যেন ঝাঁজ!'

আর বেদে জাতের পুরুষ? শিরবেদে মহাদেবের বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখছেন—'···ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেই মহাদেব। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছার মত একফালি মোটা একটা কাপড়ের আবরণ শুধু, নইলে নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর। গলায় হাতে তাবিজ জড়িবুটি কালো সুতোয় বাঁধা, আর গলায় দুলছে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। তারও গায়ে ওই উৎকট তীব্র গন্ধ। বৃদ্ধ, তবু লোকটা খাড়া সোজা। দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল···'

বর্ণনা দুটি পাঠ করার পর আমাদের মনে একটি নতুন ধরনের প্রত্যয় জেগে ওঠে। শবলা সংস্কৃত কাব্যের নায়িকা নয়, রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী-লাবণ্য নয়, নয় এমন কি শরৎচন্দ্রের বিন্দু বা রাজলক্ষ্মী। কিন্তু তার কালো রঙের মধ্যেই রয়েছে নতুন সৌন্দর্য, সাপের পিছনে তার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই রয়েছে নারীশক্তির নতুন মহিমা, পদ্মগন্ধা নয় সে, কিন্তু তার গায়ের কটু গন্ধেই রয়েছে আর এক ধরণের ইন্দ্রিয়-সংবেদ্যতা। আর মহাদেব যদিও মহাকাব্যের বীরষভ নয়, নয় বঙ্কিম উপন্যাসের বীর নায়কও, তবু তার শক্তি ও মহিমার লাঘব কোথায়? শবলা এবং মহাদেব, এরা দু'জনেই তাহলে আমাদের সাহিত্য-জগতের নতুন অধিবাসী, পুরাতন অধিবাসীদের প্রতিস্পর্ধী রূপেই এদের আবির্ভাব।

এবং এটা তারাশঙ্করের, এবং তাঁর পাঠকদের অন্তঃস্থিত প্রতিস্পর্ধারই প্রকাশ। আমি ভুলে যাচ্ছিনা যে যখন 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' লেখা হয়েছিল, তখন ভারত স্বাধীন হয়েছে। মানে, শাসক শ্রেণীর রঙের পরিবর্তন হয়েছে, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনে নতুন ধরনের এলিট ও কমনারের আবির্ভাব ঘটেছে। অনিবার্য কারণে প্রাকৃত জনের আত্ম-প্রতিষ্ঠার আগ্রহও

জেগেছে, সেটাই স্বাভাবিক। তারাশঙ্কর শবলা ও মহাদেবের চিত্রে সেই আকৃতিকেই রূপ দিলেন।

বাঙলা সাহিত্যে নতুন যুগের আগন্তুক এই সব মানুষের উপযুক্ত প্রতিবেশ-পটভূমি ও রচনা করে দিয়েছেন তারাশঙ্কর। ভাগীরথীর তীরে হিজল-বিলের জল কাজল-কালো, বর্ষায় বান ঢুকলে ঘোলাটে হয়ে ওঠে। চরভূমিতে ঝাউবন আর কাশবন, সেখান থেকে অজানা ফুলের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এর আকাশে 'গগনভেরী' পাখির আওয়াজ, জলে বুনো হাঁসের কলকল কঁ্যাককঁ্যাক শব্দ, বনের গভীরে চতুর কুটিল চিতাবাঘের সঞ্চরণ, তার পিছনে-লাগা ফেউ, আর সর্বোপরি, 'হয়তো কোন ঝাউগাছের ডাল থেকে বা দেবদারুর ঘন পল্লবের মধ্য থেকে অথবা ঘন ঘাসবনের মাথার উপর বিস্তৃত লতার জাল থেকে একটা মোটা লম্বা দড়ি চাবুকের মত শিস দিয়ে আছড়ে এসে পড়বে তার গায়ে—চোখের সামনে লকলক করে দুলে উঠবে চেরা একখানা লম্বা সরু জিভ…'

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিময়তায় বারেবারেই দেখা যায় উদীয়মান প্রগতিশীল কোনো শ্রেণী একদিকে যেমন তার থেকে শক্তিমান কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তেমনি মিত্ররূপে চেয়েছে অন্য আর এক শ্রেণীকে, সমাজ-কাঠামোয় যে-শ্রেণীর অবস্থান হয়তো তার থেকেও নিচে। রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সামন্ত ও যাজকেরা সাথী করতে চেয়েছিল বণিকদের ; আবার বনিকেরা যখন রাজতন্ত্র ও যাজক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তখন সে সাহায্য প্রার্থনা করে শ্রমিক বা কৃষকের। বাঙলা দেশে বিশ শতকের বুর্জোআ লেখক যখন জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে চান, তখন তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অবহেলিতা শোষিতা নারী, কয়লাকুঠির শ্রমিক, কিংবা, আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে যেমন দেখছি—তাঁর চোখ পড়ছে মুচি-বাগদি ডোম বাউরি কাহার বেদেদের জীবনের ওপর। একটু পরেই আমরা দেখব, তারাশঙ্করের রচনার শিল্প-সার্থকতা সর্বস্তরে সমান নয়, আরোহ-শীর্ষ-অবরোহ পর্যায়-ভেদে তাঁর সার্থকতা-ব্যর্থতা বিভিন্ন রকম—তবু একথা বলতে হবে, যুগের এই বিশেষ আকাঙ্ক্ষাকে তারাশঙ্কর অভ্রান্তভাবে ধরেছেন, শিল্পী মাত্রেরই যা কাজ।

এর মানে এই নয় যে, শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর যুগের প্রবণতাকে আগে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। তারপর কলম বাগিয়ে লিখতে বসেছেন। অনেক

অনেক ক্ষেত্রে উল্টোটাই সত্য—প্রতিভাবান শিল্পীরা ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন না, কোনো বিষয় কেন তাঁরা বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁর কবিজীবনকে আর একজন অলক্ষে থেকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। ব্যাপারটা অব্যাখ্যাত, কিন্তু শিল্পীর মনোলোকে কোনো না কোনোভাবে সমাজসত্যের অভ্রান্ত সক্রিয়তা থাকে, নানা রূপান্তরের মধ্যেও।

আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আমরা মনে রাখব। এর পিছনে যে বিশেষ মানসিকতা কাজ করে, ঐতিহাসিক কালে তা কিন্তু ফিরে ফিরে এসেছে, রূপ থেকে রূপান্তরে। প্রাচীন কালে দেখি, ভারতীয় মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরাই সাহিত্যের কুশীলব, তারাই নায়ক। বৌদ্ধ জাতকে অনেক বনিক এবং নিম্নবৃত্তির মানুষ এসেছে, এই সময়কার নাটকেও বণিক-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ডোম ব্যাধ শবরদের আসাব বিষয় আমরা আগেই লক্ষ করেছি। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে প্রথম আনলেন সুভা বতন চন্দরা রহমতদের, শরৎচন্দ্র আলোকিত করলেন ইন্দ্র মেজদিদি নারাণী দেবদাসদের। তারাশঙ্করের কাহার বা বেদেরা এদের কারুরই মতো নয়, কিন্তু পূর্বাপর বহমান একই মানসিকতার বৃন্তে বিধৃত অন্য মানুষ।

৩

সংস্কৃতে একটি বচন আছে, যার যেমন ভাবনা তেমনি তার সিদ্ধি। কথাটা কি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সব মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য? হয়তো নয়, অন্তত শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে তো নয়ই। তা যদি হত, তাহলে রচনা-প্রয়াস মাত্রেই অপূর্ব শিল্প-সার্থকতায় ঝলমল করে উঠত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো লেখকের সব রচনাই সমান সুষমা-মণ্ডিত হয় না। না হবার নানারকম কারণ আছে।

কবি শিল্পীর মন-বুদ্ধি-চিত্তের গভীর-অগভীর নানা স্তর আছে। একটা জায়গায় তিনি আর পাঁচ জনের মতোই সাধারণ মানুষ, জীবিকায়-জীবনচর্যায়, জাগতিক ত্রিতাপে, হৃদয়ের আনন্দবেদনায় সমান আন্দোলিত। কিন্তু সর্ব সাধারণের একই অভিঘাত শিল্পীর গভীর সত্তায় যে আলোড়ন তোলে, তা কিন্তু সর্বসাধারণের মতো নয়, সেখানে আপনার অনুভবে তিনি অনন্য।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধীয় আমার পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, প্রত্যেক মানুষের সত্তার ক্রমোন্নত বিভিন্ন স্তর আছে, ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সেগুলিকে সাজিয়েছেন এইভাবে: অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়। সাধারণ মানুষের সীমা দ্বিতীয়টি বড জোর তৃতীয়টি পর্যন্ত। সাধক এবং শিল্পীদের মধ্যেই শেষ দুই স্তর সক্রিয় হয়, এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সাহিত্যকাব যতক্ষণ না আনন্দময় আলোকদৃষ্টি লাভ করেন, ততক্ষণ তাঁর রচনা সত্যকার শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে না। অথচ একথাও ঠিক, শিল্পীকে অন্নময় প্রাণময় মনোময় সত্তাকে অবলম্বন ও অতিক্রম করেই তাঁর বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় পৌছোতে হবে।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলছেন, বস্তু জগতের জিনিস কবির অন্তরে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় রসানুকূল বিভাবনা লাভ করে, তবেই শব্দ-সমর্পিত হয়ে তা কাব্য-সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথও এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার কথা বলেছিলেন—বাহিরের জিনিসকে অন্তরের করে আবার তাকে কাব্যে-সাহিত্যে সর্বসাধারণের জিনিস করে তোলা।

এসব কথা বলছি এই জন্য যে তারাশঙ্করের শীর্ষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতেও দেখেছিলাম, তাঁর সব ভাবনা রস-ভাবনায় পরিণতি লাভ কবে নি। আলোচ্য অবরোহ পর্যায়েব রচনায় সেই প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে। আমাদের আক্ষেপ তীব্রতর হয়, যখন দেখি, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'—তে অনেক মূল্যবান উপাদান আহৃত হওয়া সত্বেও সুঠাম গঠনরূপ পেলনা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল।

এ উপন্যাসের মূল কল্পনা সর্পকেন্দ্রিক। সাপ এবং সাপুড়ে বেদেদের ভালো করেই চিনতেন তারাশঙ্কর, সেই অভিজ্ঞতার জিনিসের সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন মনসামঙ্গলের পুর্নগঠিত মীথ বা দেবকথাকে। পুনর্গঠিত বলছি এই জন্য যে, মধুসূদন যেমন রামকথাকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন, তারাশঙ্করও তেমনই কালোপযোগী করে মনসামঙ্গলের কাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেছেন—এবং বেশ ভালোভাবেই করেছেন। কিন্তু বাস্তব জগতের বেদেদের জীবন, যা তাঁর চোখে দেখা, সেটিকে কেন যে দেবকথার সঙ্গে মেলাতে পারলেন না (অথচ সেটাই তাঁর লক্ষ ছিল), অথবা, তাকে স্বতন্ত্র সুন্দর রূপ দিতে পারলেন না, সেটাই আমাদের ব্যথিত প্রশ্ন থেকে যায়।

নাগিনী কন্যার মূল কাহিনী-প্যাটার্নটি ট্র্যাজেডির—হিজলবিলের অধিবাসী

সর্পজীবি বেদেদের গোষ্ঠীজীবনের বিনাশ বা উৎখাত। একটি মহৎ জীবনাদর্শের অবসান, ট্র্যাজেডির এই লক্ষণটি একালের সম্পদ, কেননা আধুনিক জীবন রোমান্টিক বিনষ্টির স্বরে বাঁধা। তারাশঙ্কর অবক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের অবসান-চিত্র পরম মমতায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপূর্ব সার্থকতায় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সেই তারাশঙ্করের হাতেই নাগিনী কন্যার ট্র্যাজেডির রূপকল্প কোন সার্থকতায় রচিত হল?

নাগিনী কন্যার কাহিনীর তিনটি পর্যায়। প্রথমটি একটি মীথ বা দেবকথা মনসামঙ্গলেব কাহিনীর সম্প্রসারণে তারাশঙ্করের এটি একটি নতুন সৃষ্টি, এবং অপূর্ব ভালো সৃষ্টি। দ্বিতীয়টি শিরবেদে মহাদেব এবং নাগিনীকন্যা শবলার কাহিনী এবং শেষটি শিরবেদে গঙ্গারাম ও নতুন নাগিনীকন্যা পিঙলার কাহিনী। শেষ দুটিই এই উপন্যাসের প্রধান জীবন-চিত্র, কেননা যে সব বেদে ও বেদেনী এবং তাদের সর্পবৃত্তির কথা তারাশঙ্কর এখানে বলেছেন, তারা বাস্তব মানুষ, উপন্যাসের প্রকৃত উপজীব্য। অথচ এই দুটি কাহিনীতেই কল্পনার অনচ্ছতা, ট্র্যাজেডি রচয়িতার দৃষ্টিকোন নির্বাচনের ক্রটি শিল্পীর রস তন্ময় বস্তু চেতনার অভাব, ভাষা রচনার অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং কৃত্রিমতা আমাদের চিত্তকে পীড়িত করতে পারে।

মনসামঙ্গলের দেবকথা নির্ভর যে উপাখ্যানটি চিত্তাকর্ষক, তার কথাই আগে বলছি। চাঁদ বেণের বন্ধু ধন্বতরি, তাঁর শিষ্য এবং অনুগামীরা বিষবৈদ্য। সাঁতালী পাহাড়ে তাদের বাস। এরা ছিল গুণী, জানত সর্পবিষের অমোঘ ঔষুধ, যত সব 'বিষঘনী' লতাপাতা পাথর সাঁতালী পাহাড়ের সর্বত্র ছড়ানো। বিষবৈদ্যদের বিত্তবিভব ছিল, ছিল অঙ্গলাবণ্য, সামাজিক মর্যাদাও। প্রথম ট্র্যাজেডি শুরু হল শিরবৈদ্যের প্রিয়তমা শিশুকন্যার মৃত্যুতে।—'অপরাজিতা ফুলের কুঁড়ির মতো কালোবরণেব কচি মেয়ে, নূপুর পায়ে দিয়ে বাপের বাঁশির তালেতালে নাচছিল, সে হঠাৎ ঢলে পড়ে গেল। সাঁতালী পাহাড়ের গায়ে 'সাপের বিষের ওষুধ ওই সব লতাপাতা, সেও যে বিষ। যে বিষে বিষক্ষয় করে, সে বিষও যে সাক্ষাৎ মৃত্যু! কোন পাতাতে ধরেছিল রাঙা ফল—কচি মেয়ে সেই টুকটুকে ফল তুলে খেয়ে তারই বিষে প্রাণ হারাল।' এইখানে ট্র্যাজেডির যে বীজ উপ্ত হল, সেটি সুন্দর। লোভে পাপে মৃত্যু হলে তা ট্র্যাজেডির বিষয় হয় না, উন্নত সুন্দরের মৃত্যু আসে নিয়তির আঘাতে, নয়তো কোনো সদ্গুণের আতিশয্যই সেই বিপরীত পরিণাম ডেকে আনে। এখানে

বিষয় বিদ্যার পরাকাষ্ঠাই সুন্দর শিশুটির মৃত্যুর কারণ হল। তুলনায় মনে আসে 'চন্দ্রশেখর' এর দলনী বেগমের কথা, নারীপ্রেমের আতিশয্য (exaggeration) থেকে তার জীবনে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল। ওথেলো এবং ডেসডিমোনার জীবনে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত হয়েছে পরস্পরের প্রতি আত্যন্তিক ভালোবাসায়। ঘটনার পর ঘটনায় ওথেলোর প্রেমসঞ্জাত ঈর্ষা এবং জিঘাংসা যত বেড়েছে, ডেসডিমোনার সেই একই প্রেমসঞ্জাত আত্মসমর্পণও তত বেড়েছে, এতটাই যে ঘাতকের হাতে গলা ছেড়ে দিয়ে সে প্রেম তৃপ্তিলাভ করল। যে কোনো প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মৃত্যু-বিদ্ধ, জিঘাংসা এবং তার বিপরীত আত্মহননিতা একই সঙ্গে জড়ানো। শিরবেদের শ্রেষ্ঠ বিষবিদ্যা তার নিজেরই কাছে বিষবাণ হয়ে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

বিষবৈদ্য বিশ্বম্ভরের কন্যার মৃত্যু কিন্তু সবটাই তার নিজের দিক থেকে আসেনি। বিষবৈদ্যদের জীবন জীবিকা সম্ভ্রম সম্মান সব চাঁদবেণের সঙ্গে যুক্ত। চাঁদ অত্যন্ত অহংকারী, উদ্ধত, দৃপ্ত তার পৌরুষ, মনসার সঙ্গে বিবাদে কিছুতেই সে মাথা নত করতে চায় না। তার মহাজ্ঞান গেল, ধন্বন্তরি গেল, ছয় পুত্র গেল, সপ্তডিঙ্গা মধুকর গেল, তবুও না। শেষ পুত্র লখিন্দরের বিবাহ-রাত্রে সর্পদংশনে মৃত্যু হবে এটা জেনেও সেই পুত্রের বিবাহ দেওয়া চাই।

চাঁদ বেণের এই অসম্ভব যাত্রাপথে বিষবৈদ্যেরা তার বন্ধু, অভিন্ন-হৃদয়। সুতরাং বিনাশের বীজ সঞ্চারিত হল চাঁদবেণে থেকে বিষবৈদ্যদের মধ্যেও। বন্ধুত্বের মধ্যেই বিষক্রিয়া, দুই বিপরীতের সন্নিপাত। আর এটা পরম্পরিত (relayed) হয়েছে পুরুষানুক্রমে বেদেদের সমাজে মহাদেব গঙ্গারামের কাল পর্যন্ত।

জর্জ টমসন ট্র্যাজেডির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে গ্রীসে পৌঁছেছেন, বলছেন যে সফোক্লিস ইউরিপীডিসের ট্র্যাজেডি রচনার পিছনে ছিল গ্রীসের মুদ্রা-অর্থনীতির (মানি-ইকনমি) স্বর্ণযুগ : মুদ্রা যা শেক্‌সপীঅরের কথায়—

Thus much of this will make black white ; foul fair ;

Wrong right ; base noble ; old young ; Coward valiant.

শেকসপীঅরের কালও ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রাস্ফীতির স্বর্ণযুগ। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম মধুসূদন যে ট্র্যাজেডির সূচনা করলেন, তার পিছনেও ছিল এদেশের মুদ্রা-শাসিত সামাজিক গঠন, দেশি বুর্জোআর প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর ছিল মধ্যযুগের বাঙলায়, যখন তার ব্যবসা বাণিজ্য সিংহল পর্যন্ত প্রসারিত

ছিল। চাঁদ নিজেও বণিক-শিরোমণি ছিলেন। তারাশঙ্করেরও সমাজ-পটভূমি মুদ্রা-শাসিত, তা সে ইংরেজের অধীনেই হোক বা স্বাধীনতার পরেই হোক। সুতরাং তিনি ট্র্যাজেডির আর্ট-ফর্ম গ্রহণ করে নিগূঢ় সমাজ-সত্যকেই রূপ দিয়েছেন।

তারাশঙ্করের হাতে মনসামঙ্গলের দেবকথা কিন্তু আর এক তাৎপর্য পেয়েছে। বেহুলা শেষ পর্যন্ত মৃত স্বামীর পুনর্জীবন পেয়েছিল, চাঁদ ফিরে পেয়েছিল তার সাত পুত্রকে, সপ্ত ডিঙা মধুকর সমেত। কিন্তু একই যাত্রায় বিষবৈদ্যেরা কী পেল ?—'বিষবৈদ্যদের রূপ ছিল সাধু সন্ন্যাসীর মত, তাদের অঙ্গের জড়িবুটি ওষুধের গন্ধ বিষধরের কাছে অসহ্য, কিন্তু মানুষের কাছে সে গন্ধ দিব্য গন্ধ বলে মনে হত। তাদের সে রূপে পড়ল কালি, দিব্য গন্ধ হয়ে উঠল দুর্গন্ধ চাঁদোরাজার শাপে। লজ্জায় মাথা হেঁট করে সাঁতালী ছেড়ে, জড়ি-বুটির বোঝা সাপের ঝাঁপি আর মাটির ভাঁড় সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল তারা।' তারাশঙ্করের সমবেদনা সর্বহারা নিঃস্ব মানুষগুলির প্রতি শুধু তাই নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্পর্শ এবং বিন্যাসটিও তিনি আশ্চর্য সার্থকতায় ধরেছেন।

আমরা মনসামঙ্গলের দেবকথা-নির্ভর কাহিনীর অনুসরণ করছিলাম। শিরবৈদ্যের শিশুকন্যার মৃত্যুর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে লখিন্দরের সর্পদংশন রাত্রিতে শিরবৈদ্যকে কালনাগিনীর ছলনা। সেই রাত্রির ছবিটিও সুন্দর এঁকেছেন তারাশঙ্কর। সাঁতালী পাহাড়ে চাঁদ এবং শিরবৈদ্য বিশ্বম্ভর সর্পরোধের সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করে অতন্দ্র হয়ে পাহারা দিচ্ছে। কঠিন ব্যূহ—মনসার প্রেরিত নাগেরা এক এক করে এসে ফিরে যাচ্ছে। মধ্য রাত্রি পার হয়ে যায়। এমন সময় শিরবৈদ্য এক ছোট মেয়ের কান্না শুনতে পেল। সেই মেয়েটি আর কেউ নয়, কালনাগিনী—'একি রূপ! ন-দশ বছরের মেয়ে; কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, আঁধার রাত্রেও জলের তলার মানিকের মত ঝিকমিক করছে; হিলহিলে লম্বা; ঝকঝকে শাদা দুটি চোখ!

শিরবৈদ্য তাকে তখনই বুকে তুলে নিতে গেল স্নেহে, কন্যার মৃত্যুতে তার বুক যে উপোসী। কিন্তু গাছে গাছে নেউল ময়ুর সব তাকে সাবধান করে দিল, আর চটকা লেগে ঘুম ভাঙার মতো সচেতন হয়ে উঠল শিরবৈদ্য। 'সর্বনাশী—কালনাগিনী! পালা, পালা, তুই পালা, নইলে তোর পরান যাবে আমার হাতে। ওই মোহিনী কন্যে-মূর্তি না ধরে এলে এতক্ষণ তা যেত।'

সুতরাং মেয়েটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তার প্রাণ গেছেই বা! তখন

'নেয়ত' আর এক মেয়ের রূপ ধরে এসে দাঁড়াল ঐ পড়ে-থাকা মেয়েটির পাশে, ছায়া-মূর্তিতে।—শিরবৈদ্য এবার হা-হা করে কেঁদে উঠে দু'হাত মেলে দিয়ে বললে—আয়, ওরে আমার হারানিধি, ওরে আমার কন্যে, আয় মা, আমার বুকে আয়।

'কন্যেমূর্তি ধরে নিয়তি বললে—কি করে যাব বাবা! এ যে আমার ছায়া-মূর্তি! নতুন মূর্তিতে তোমার বুকে জুড়াব বলে এলাম কিন্তু তুমি যে আমাকে নিলে না বাবা।...

শিরবৈদ্য ভুলল; সে পাগলের মত ছুটে গিয়ে তুলে নিলে কালনাগিনীর কন্যেমূর্তি ধরা দেহখানি।'

এসব ঘটনার উপস্থাপনা অতি সুন্দর, ভাষা ও উপযোগী। আমরা লক্ষ করি, শিরবৈদ্যের জীবনে নিয়তি সক্রিয় হল তার আতিশয্যময় স্নেহবশ্যতার মধ্য দিয়েই, মানুষের হৃদয়বৃত্তির ছিদ্র দিয়েই শনি প্রবেশ করল।

এর পরের ঘটনাটিও সুন্দর। বস্তুত তারাশঙ্কর-রচিত এই উপাখ্যানের প্রতিটি অঙ্গই চমৎকার। চাঁদ সদাগর পুত্র হারিয়ে অভিসম্পাত দিয়েছিল শিরবৈদ্যকে—'বাক্য দিয়ে বাক লঙ্ঘন করেছিস...তুই, তোর জাত বাক্যহন্তা, বিশ্বাসহন্তা। যে বাক দিয়ে বাক রাখেনা, তার জাত থাকেনা।...তোদের বাস গেল, জাত গেল, মান গেল, লক্ষ্মী গেল। শিবের আজ্ঞা, আমার শাপান্ত। তোদের কেউ ছোবে না, ছোঁওয়া জিনিষ নেবে না, বসতির মধ্যে ঠাঁই দেবে না।'

বিশ্বাসভঙ্গ, নিষেধ লঙ্ঘন প্রথম পাপ—আধুনিক জীবন-চর্যার বিষময় ফল। প্যারাডাইস লস্ট থেকে আরম্ভ করে কোলরিজের এ্যান্‌সেণ্ট ম্যারিনার পর্যন্ত অপরাধ এবং দুঃখভোগের কাহিনী। তারাশঙ্কর সেই সুরেই তাঁর উপাখ্যানকে বেঁধেছেন। সাঁতালী থেকে হল তাদের নির্বাসন, স্বর্গচ্যুতি। বিষবৈদ্যেরা মধ্যরাত্রির অন্ধকারে নৌকা ভাসাল অজানার উদ্দেশ্যে। তাদের অঙ্গকান্তি দূর হল, দেহ হল দুর্গন্ধ, স্থান হল অরণ্য, সমাজ তাদের ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিল। ট্র্যাজেডির পরিভাষায় একেই বলে reversal of fortune।

বেহুলার সমান্তরাল এই নৌকাযাত্রা। বেহুলা অন্তিমে সব পেয়েছিল, বেদেরা পায় নি। তবু এই যাত্রার বর্ণনাও মানবিক ঐশ্বর্যে ঝলমল। অভিশপ্ত শিরবৈদ্যের সঙ্গীরা তাকে একে একে ছেড়ে গেছে, কিন্তু সবাই নয়। আরো দু'জন সঙ্গী ছিল, আর ছিল কালনাগিনী। কালনাগিনীই তার ধ্রুব বন্ধু।

সেও অভিশপ্ত—বেহুলার জাঁতির আঘাতে তার লেজ কাটা গিয়েছিল, আর বেহুলা-সতী তাকে অভিশাপ দিয়েছিল, তুইও কোনো দিন স্বামী পাবি না, যদি কোনো দিন অন্যের ঔরসে তোর সন্তান হয়, তাহলে তুই সন্তানভুক হবি। তোর সমস্ত মায়াজাল সত্ত্বেও তুই চিরকাল অতৃপ্ত থাকবি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হবে তোকে—eternally condemned to misery ! দাস-জাতির ভাগ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় না কি ?

তবু বেদে এবং কালনাগিনীর সম্বন্ধটি এই বিপর্যয়ের পটভূমিতেই সত্য হয়ে থাকল—শিরবৈদ্য চেয়েছিল, 'আমাকে কথা দে মা, আমাকে কখনও ছেড়ে যাবি না, আর কালনাগিনীও নিজেকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করেছিল, 'আর বাবা, আমি যে হয়েছিলাম কাল তোমার কন্যে, চিরকাল তাই থাকব। ঝাঁপিতে থাকব নাগিনীমূর্তিতে, তুমি আমাকে নাচাবে আমি নাচব ; তোমাদের ঘরে সত্যিকারের কন্যে হয়েও জন্মাব। তুমি শিরবেদে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে আমার লক্ষণ দেখে।'

যাত্রা পথে শিরবৈদ্য বিশ্বম্ভর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে কাতর হয়ে ওঠে—

'আঃ' মায়াবিনী রে ! তোর ছলাতে সব হারালাম, তোকেও হারালাম ? বাক দিয়ে বাকভঙ্গ করলি সর্বনাশী !

'কাঁধের বাঁকে ঝুলানো ঝাঁপি থেকে শিস দিয়ে কে যেন বলে উঠল—না বাবা না। আমি আছি তোমার সঙ্গেই আছি।

ঝাঁপি খুলতেই মাথা তুলে দুলে উঠল কালোমাণিকের হারের মত ঝলমলানো ছটা নিয়ে কালনাগিনী কালো কন্যে। ছপাৎ করে ছোবল দেওয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল শিরবৈদ্যের বুকের দিকে। শিরবৈদ্য তাকে জড়িয়ে নিলে গলায়। নাগিনী মাথা তুলে দুলতে লাগল শিরবৈদ্যের কানের পাশে।'

মিড্‌লটন মারে লিখেছিলেন, 'The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot by its own nature, manifest itself on earth without disaster, but in disaster it can.

তারাশঙ্কর রচিত কাহিনীতে বিপর্যের পটভূমিতে দুই অভিশপ্তের এই মিলন ও সৌহার্দ্যের ছবি অতুলনীয় বৈ কি।

এ কাহিনীর অন্য তাৎপর্যও আছে। এই স্তরে শত্রু-মিত্র প্যাটার্নটিও কেমন বদলে গেছে। চাঁদের সঙ্গে বেদেকুলের মিত্রতা এখন ভেঙে গেছে। নতুন মিত্র হয়েছে মা-মানসা, বিষহরি, এবং তারই প্রতিনিধি কালনাগিনী। মনসা

তাদের নতুন ঠাঁই দিয়েছে গঙ্গার কূলে হিজল বিলে, সেটাই তাদের নতুন সাঁতালী। কালনাগিনী মনসার আদেশে বেদেদের কাছে সত্যে আবদ্ধ, বারে বারে নাগিনী কন্যা হিসেবে সে জন্মাবে বেদেকূলে, তাদের মান-মর্যাদা ও ধর্মের সেই রক্ষিণী।

ভালো রচনার একটা লক্ষণ হচ্ছে, তা কেবল বাচ্যার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ব্যঞ্জনায় অন্য কথাও বলে। বেদেরা গুণী, কিন্তু রিক্ত, অস্পৃশ্য, তারা যাযাবর, এক প্রভুর পরিত্যাগে অন্য প্রভুর আশ্রিত, তবু তারা রক্ষা পায় না, বেদেরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল—এগুলি কি যে কোনো সমাজ বিন্যাসের নিচের তলার মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়? তারাশঙ্কর বেদেদের কথা লিখলেও কেবল তাদের মধ্যেই কাহিনীর তাৎপর্য নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তা সমস্ত নিপীড়িত মানুষদের কথাই হয়ে উঠেছে।

৪

মনসামঙ্গল-এর দেবকথার সম্প্রসারণে তারাশঙ্কর এই যে উপাখ্যানটি রচনা করেছেন, সেটি তাঁর মুখ্য কৃত্য নয়, এটিকে তিনি সমগ্র উপন্যাসের কথামুখ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেন তাঁর কাহিনীর মূল সুর ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু হা হতোস্মি, যখন তিনি মূল-কাহিনীতে ঢুকলেন, তখন সব বদলে গেল, তাঁর রসাবেশ চলে গেল, ব্যক্তি-জীবনের নানা চিন্তা-ভাবনা ঢুকে পড়ল। যাকে স্টান্ট বলে সেই আপাত-উত্তেজক ঘটনায় তিনি প্রলুব্ধ হলেন। মূল কাহিনী দুটি বক্তব্য-প্রধান হয়ে অতিনাটকীয়তায় পূর্ণ হল। বস্তুত, এই অংশে তারাশঙ্করের মনোময় সত্তারই অভিক্ষেপ দেখি, আনন্দময়তার দ্যুতি লক্ষিত হয় না।

তারাশঙ্কর প্রথম একটি মীথ রচনা করলেন, তারপর সমকালিন বেদেদের জীবন উপস্থাপিত করে দেখাতে চাইলেন, আদি শিরবৈদ্য বিশ্বম্ভরের জীবনে যে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল আজও তার পুরুষানুক্রমিক পুনরাবৃত্তি চলেছে। এবারেও তাদের নতুন সাঁতালী উচ্ছন্ন হল—শিরবেদে মহাদেব ও গঙ্গারামের মৃত্যু হল; নাগিনীকন্যা শবলার হল অধঃপতন, পিঙলা আত্মঘাতিনী।

এই সমান্তরালতা অন্য দিকেও দেখা দিয়েছে। শবলা পিঙলা সব নাগিনী

কন্যাই অত্যন্ত ছলনাময়ী, তারা কেবলই লাস্য ছড়ায়—কেননা কালনাগিনী কালো কন্যের ছদ্মবেশে মূল শিরবৈদ্যকে ছলেছিল। নাগিনীকন্যার চিরকালের অভিশাপ—পাঁচ বছর বয়সে সে বিধবা হয়, সে স্বামী পায় না, ব্যাভিচারিনী হয়ে যদি সন্তানবতী হয়, তবে নিজের সন্তানকেই মেরে ফেলে। বেদেরা তাদের নতুন উপাস্য দেবতা মনসা বা বিষহরির চির-অনুগত, ভাদ্রের নাগ-পঞ্চমীতে তারই পূজা, উৎসব। তাতে চিমটের মাথায় কড়া বাজে ঝনাৎ-ঝন, ধুমধুম বিষম-ঢাকি বাজে, বেজে ওঠে বিচিত্র তুমড়ি বাঁশি।

কিন্তু এই সমান্তরালতা সত্ত্বেও প্রথম কাহিনীর মধ্যে যে মানবিক মহিমা ছিল, বিনাশের পটভূমিতেই যে হৃদয়গত ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছিল, তার কিছু মাত্র এখানে পাওয়া যায় না।

ট্র্যাজেডির নায়ক না'য়িকা হবে উন্নত মর্যাদার মানব-মানবী, কোনো সুতীব্র হৃদয়বত্তার জন্যই তারা নিজেদের বিপর্যয়কে ডেকে আনবে, পাঠকের চিত্তে জেগে উঠবে ভয় বিস্ময় করুণা। তারাশঙ্কর আরম্ভও করেছিলেন ভালো। আমরা শবলা ও মহাদেবের উপস্থাপনার অংশ আগেই লক্ষ করেছি, সে অংশ নিশ্চয়ই প্রশংসাই। তাছাড়া, তারাশঙ্কর বেদেদের কেবল চেহারার নয়, গুণেরও বর্ণনা দিয়েছেন। মা বিষহরির বরে তারা হবে নতুন মন্ত্রগুণের অধিকারী তাতে পৃথিবীর তাবৎ জন্তু-জানোয়ার বশ মানবে, সে মন্ত্রে নাগের বিষ কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। কিন্তু বেদেরা হবে নির্লোভ, তাদের স্থায়ী বাসগৃহ থাকবে না, তাদের আছে পরহিতব্রত, কাকের মুখে যদি কারও সর্পদংশনের খবর পায় বিষবৈদ্য ছুটবে গামছায় চিঁড়ে বেঁধে, দষ্ট ব্যক্তির প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। বেদেদের গানে আছে—'তুরা খাস গো সুধার মধু মোরা খাইব বিষ গ! তুদের ঘরের কালসপ্য মোদের গলায় দিস গ! অ—গ!' এ ছাড়া, তাদের আর একটি সর্বোচ্চ মূল্যের সম্পদ আছে—'আর দিয়েছেন অধিকার আমার [কালনাগিনীর] বিষের উপর—এই বিষ গেলে নিয়ে তুমি বিক্রি করবে বৈদ্যদের কাছে, তোমার হাতের গেলে-নেওয়া বিষ তারা শোধন করে নিলে হবে অমৃত। সে অমৃত সূচ-পরিমাণ দিলে মরতে মরতে মানুষ বেঁচে উঠবে।'

এর সবই তো ঠিক। কিন্তু কাহিনী এগিয়ে নিতে গিয়ে তারাশঙ্কর সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য রকম করে ফেললেন। ধূর্জটি কবিরাজের কাছে বেদেরা বিষ বিক্রি করতে গেছে, শবলা কালনাগিনীকে ধরে আছে আর মহাদেব বিষ গালছে। ধূর্ত মহাদেব কৌশলে নাগিনী-দংশন করিয়ে শবলাকে

মেরে ফেলতে চাইল! পিতা-পুত্রীর কলহ কেন? না, বেদেদের যার যা প্রাপ্য মহাদেব মোড়ল হিসেবে তা মিটিয়ে দেয় নি! শবলার প্রেমিক ছিল এক তরুণ বেদে, শবলাকে খুশি করার জন্য সে এক রাজ-গোখুরা ধরে এনেছিল। নাগিনীকন্যার 'ধর্ম' রক্ষা করা নাকি শিরবেদে মহাদেবের কাজ, তাই রাত্রির অন্ধকারে সেই রাজ-গোখুরা ছেড়ে দিয়ে তাকে হত্যা করল। এছাড়া, শবলার ওপরও নাকি মহাদেবের 'নজর' ছিল। আর শবলা? তার অঙ্গে শেষ পর্যন্ত 'চাঁপার সুবাস' বেরুল, অর্থাৎ সে কালনাগিনীর মতো মিলনাতুর হল। হলে নাকি আর নাগিনীকন্যার সম্মানের পদে থাকতে পারে না। তাই সে এক অন্ধকার রাত্রে মহাদেবের নৌকায় তারই রক্ষিতা দধিমুখীর ভাণে পিতৃপ্রতিমের সঙ্গে সঙ্গত হল—কী জন্য? না, মহাদেবের ধর্মনষ্ট করবার জন্য সে নিজের ধর্মই নষ্ট করল। তারপর জলে ভেসে গিয়ে সে ঘটনাক্রমে উঠল গিযে এক ইসলামি বেদের নৌকায়, তার অঙ্কশায়িনী হল। তার আগে সে মহাদেবকে হত্যা করেছিল, নাগিনীকন্যার বুকে যে বিষের কাঁটা থাকে সেই কাঁটা ফুটিয়ে।

এ কাহিনীতে মহৎ-জীবনাদর্শের যে কার্যকারিতার সম্ভাবনা ছিল, তা নষ্ট হযে গেল এইভাবে। ট্র্যাজেডিতে মানুষেরা ভালো কিছু করতে চাইবে, কিন্তু ফলটা হয়ে দাঁড়াবে মন্দ। পাপের ফলে, পদস্খলনের ফলে মৃত্যু হলে, তাতে মানবিক মর্যাদা দেখা যায় না। মহাদেব তো কুচক্রী, শয়তান, উপযুক্ত শিরবেদে হবার যোগ্যতা তার কই? আর দ্বিতীয় শিরবেদে গঙ্গারাম তো প্রথম থেকেই ধূর্ত, কুটিল, প্রতারক। খালি খালি পিঙলার সর্বনাশ করতেই সে আছে। যে মহাদেবকে তারাশঙ্কর 'দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল' বলে বর্ণনা করেছিলেন, সে মানুষের প্রাণ দেয় না, নরহত্যা করে, সে ব্যাভিচার-পরায়ণ অথচ শবলার চরিত্র নিয়ে তার খুঁতখুঁতুনির অন্ত নেই। এসব হয়তো বাস্তবে তারাশঙ্কর দেখেছেন, যা কিছু চোখে-দেখা কানে-শোনা তাই নিয়েই তো সাহিত্য হয় না, বিশেষ করে যখন মনসামঙ্গলের মীথ রচনা করে খেলার দান তিনি আগেই সাজিয়ে দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে অন্য ধরণের উপন্যাস রচনা করতে পারতেন তিনি, সে ক্ষেত্রে মনসামঙ্গল ছিল অপ্রয়োজনীয়। পিতৃপ্রতিমের (Father Image) সঙ্গে বিরোধ এ যুগের এক ধরণের সাহিত্যের উপজীব্য, কিন্তু আলোচ্য কাহিনীতে মহাদেবের সঙ্গে শবলার এবং গঙ্গারামের সঙ্গে পিঙলার বিরোধের কোনো গভীর কারণ দেখানো হয়নি, যেটুকু বলা হয়েছে ত, গ্রাম্য কলহের বেশি কিছু

মনে হয় না। বেদেদের সমাজ সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই, হয়তো তারাশঙ্কর জানতেন সেই সমাজে কন্যাস্থানীয়ের সঙ্গেও সংগমের ঘটনা ঘটে—কিন্তু শবলা কেবল প্রতিশোধ (কিসের প্রতিশোধ ?) নেবার জন্য জেনেশুনে মহাদেবের সঙ্গে সংগত হল, এঘটনা উদ্ভট। হয়তো ফ্রয়েডীয় কামশাস্ত্র লেখকের উদ্বেজিত হবার কারণ ঘটিয়েছিল—তাই Lolita-র এই বিপরীত চিত্রের অবতারণা। সাহিত্যে কোনো বিষয়ই নিষিদ্ধ নয়, এসব নিয়েও আর এক ধরনের সাহিত্য হতে পারত, এখানে তা হয়নি বলেই আমাদের অনুভব।

সার্থক উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের যে সঠিক দৃষ্টি-কোণ (point of view) থাকা প্রয়োজন, আলোচ্য উপন্যাসে তার একান্ত অভাব। বেদে-দের জীবনকে মীথ-শাসিত রূপেই তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন—শবলা এবং পিঙলার দুই কাহিনীতেই। সেইভাবে আগাগোড়া রেখে গেলেই তো ভালো হত, যেমন প্রথম উপাখ্যানে করেছেন। কিন্তু তা না করে হঠাৎ-হঠাৎ তিনি মীথ ভেঙে রিঅলিটি আনতে চাইছেন, তাও মাঝে মাঝে। যেমন, শবলার প্রেমিক বলছে, 'শবলা, ই সব মিছা কথা রে, সব মিছা কথা, মানুষ নাগিনী হয় না। চল আমরা দু'জনাতে পালাই। আবার অন্যত্র পিঙলাও নাগিনী-কন্যার গায়ে চাঁপার গন্ধের মীথ অস্বীকার করেছে, বলছে, 'চোখের ভাল লাগা, মনের ভাল লাগা—এর উপরে হাত নাই।' নাগু ঠাকুরকে সে ভালবেসেছিল—হয়তো। হয়তো বলছি এই জন্যে যে এখানেও তারাশঙ্কর অব্যবস্থিতচিত্ত, একবার দেখাচ্ছেন পিঙলা নাগু ঠাকুরকে ভালোবাসে, আবার অন্যত্র পিঙলাকে দিয়ে বলাচ্ছেন, কই, তার মনের মধ্যে নাগু ঠাকুর তো নেই। পিঙলাকে অকলঙ্কিনী রাখার জন্য লেখক তার অঙ্গে মীথ-নিয়ন্ত্রিত চাঁপার সুবাসও ফোটাননি, মীথ কেটে বেরিয়ে আসা নারীর ভালোবাসাও দেখাননি—এমনই অস্বচ্ছ দৃষ্টি। অন্য দিক থেকেও অপ্রয়োজনে তারাশঙ্কর মীথ ভাঙতে চেয়েছেন। ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য শিবরাম বেদে সমাজের বাইরের লোক, সে-ই অনেকাংশে গল্পের কথক—পিঙলার অন্তর্জ্বালা এবং নিজেকে নাগিনী-কন্যা মনে করে কামনা ও ধর্মরক্ষার অন্তর্দ্বন্দ্বকে সে কবিরাজের দৃষ্টিতে মনে করছে উন্মাদ রোগ। পিঙলার তখন ভয় হয়, মাঝে মাঝে সে মূর্ছা যায়। শিবরাম কবিরাজ হাত দেখার ছলে পরীক্ষা করে দেখছেন, 'নাড়ীর গতি প্রকৃতি এবং অবস্থা বিচিত্র। উপবাসে দুর্বল, কিন্তু বায়ুর প্রকোপে চলছে যেন

বলাছেঁড়া উদ্দামগতি উদ্‌ভ্রান্ত ঘোড়ার মত, মধ্যে মধ্যে যেন টলছে। মুখের দিকে চাইলেন। চোখের প্রখর শুভ্রচ্ছদ আচ্ছন্ন করে অতি সূক্ষ্ম শিরাজাল-গুলি রক্তাভ হয়ে ফুটে উঠেছে। মূর্ছা রোগের অধিষ্ঠান তিনি অনুভব করতে পারলেন নাড়ীর মধ্যে।'

আমরা পাঠকেরা আশা করছিলাম, এরপর লেখক হয়তো তাঁর কাহিনীর নর-নারীকে মীথ থেকে রিঅলিটিতে আনবেন। কিন্তু তিনি আবার উল্টোমুখ ধরলেন। পিঙলা সম্বন্ধে শবলা পরে বলেছে, 'বেদেদের কন্যে সহজে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই'। শিবরামও পরে স্বীকার করেছে, 'তাঁর চিকিৎসার অনুমান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। পিঙলা পাগল হয় নাই।'

তাহলে কী দাঁড়াল। এ যে একূল-ওকূল দুকূল রাখা। কাহিনীর মূল ধারার প্রয়োজনে তাঁকে মনসামঙ্গলের মীথ রাখতে হবে। আবার পাছে কেউ মনে করে ভর মূর্ছা চাঁপার সুবাস ইত্যাদি রাখছেন বলে লেখক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই কবিরাজের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন।

আমাদের বক্তব্য এইভাবে সাজানো যায়ঃ

মীথ বা মীথ-আশ্রিত জীবন নিয়েই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, কেননা মীথও এক রকমের রিঅলিটি তারাশঙ্কর, আমরা আগেই দেখেছি, মনসামঙ্গল কাহিনী অবলম্বনে সুন্দর সাহিত্য রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, মীথ ও রিঅলিটির দ্বন্দ্ব দেখিয়ে কোনো মানুষের উদ্গতি emergence দেখানোর মধ্যেও সাহিত্য থাকতে পারে। এ দুটোর কোনোটা নিয়েই একাগ্রচিত্তে লেখক কাজ করেন নি। এ রকম তাঁর অন্য উপন্যাসেও দেখা যায়। 'আরোগ্য নিকেতন'-এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিকে আধাআধি রেখে দিয়েছেন, কোনোটাকেই একক প্রোজ্জ্বল রূপে বা দুইএর সমন্বয়ে নতুন প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ রূপে চিত্রিত করেন নি। তিনি সমস্যা আনেন খুব ভূমিকা করে, কিন্তু সমস্যার গভীরে যাওয়া বা তাকে আয়ত্ত করা তাঁর সাধ্যাতীত।

ব্যাধি নিয়েই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা যায়। মালঞ্চ-এর নীরজার ব্যাধি আর নীরজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তৎকালিন বিশ্বব্যাপী মারণের তাৎপর্যও বহন করে আনে। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে উদাহরণ নাই আনলাম।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে এই রকম অনেক মূল্যবান উপাদান আছে—বিষ ও অমৃত, পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম, সেসব নিয়ে তারাশঙ্করের উচ্ছ্বাসময় বিবৃতি আছে, কিন্তু কোনো জায়গাতেই রসসৃষ্টির পরিচ্ছিন্ন মূর্তি আমরা

দেখিনা। তারাশঙ্কর পরিশ্রমী, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নানা চিন্তা-ভাবনা আছে, এসব এনে উপন্যাসে জড়ো করেছেন, কিন্তু—রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সেগুলোর রসানুকূল বিন্যাস করবার মতো তাঁর গৃহিনীপনা ছিল না।

৫

উপন্যাসের ষ্ট্রাকচার বা গঠন-রূপের আলোচনা একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র ট্র্যাজেডির গঠনরূপ শেষ পর্যন্ত কী ভাবে শিথিল হয়ে অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে, তা আগেই লক্ষ করেছি। এখন এই রচনার অন্য দু'একটি বিষয়ে লক্ষ করছি।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী-তে তারাশঙ্কর তিনটি কাহিনীবৃত্ত এঁকেছেন। প্রথমটি মীথ, এবং শিল্প-রচনার দিক থেকে উৎকৃষ্ট। শেষের দুটির, আসল বেদে-জীবন নিয়ে যা লেখা, রচনাংশ দুর্বল একথাও বলা হয়েছে। মনে প্রশ্ন জাগে, কেন তারাশঙ্কর বেদেদের কথা বলতে গিয়ে দুটি কাহিনী রচনা করলেন? আনলেন দু'জোড়া শিরবেদে ও নাগিনীকন্যাকে?

তারাশঙ্করের কাহিনীধারা মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করলে তাঁর অভিপ্রায় কী ছিল মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। প্রথমত, তিনি নাগিনী কন্যাদের একটা আনুপূর্বিকতা বা continuity আঁকতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ক্রমোন্নতি এবং ক্রমাবরোহ দেখাতে চেয়েছেন, কালের পরিবর্তনে যা ঘটে থাকে। মহাদেব শিরবেদে হিসেবে যতটা ভালো, গঙ্গারাম ততটা নয়, উপরন্তু সে সাক্ষাৎ শয়তান। পক্ষান্তরে, শবলার থেকে পিঙলা নীতিবোধ ও মনোবলের দিক থেকে অনেক উন্নত।

এ দুটো জিনিস অতি সহজেই একজন নাগিনীকন্যা ও একজন শিরবেদেকে দিয়েই দেখানো যেত। শরৎচন্দ্র 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে একজন ভৈরবীই রেখেছেন, পূর্বাপরতা বজায় রাখার জন্য অন্যদের প্রসঙ্গ এনেছেন মাত্র। তারাশঙ্কর দুই কাহিনী রেখেছেন বলে সৃষ্টির ঐকমুখিনতা ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। পাঠকের মনোযোগ বারবার ব্যাহত হয়।

চরিত্র উপন্যাস-রচনার প্রধান স্তম্ভ। এ প্রসঙ্গে আগেই আলোচিত হয়েছে। এখানে আরো দু'একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই।

উপন্যাসে কতই তো পার্শ্বচরিত্র থাকে, ঘটনা ও মূল চরিত্র বিকাশের জন্য তাদের দরকার। দরকার ছাড়াও সে সব চরিত্রের একটা নিজস্বতা এবং

সৌন্দর্যও থাকা চাই। যেমন, ধূর্জটি কবিরাজ। বিষবেদেরা তাঁর কাছে কালনাগিনীর বিষ বিক্রি করতে যেত কবিরাজ তাদের যজমান, সুতরাং তাঁর উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে বৈ কি। চরিত্রটি স্বল্প পরিসরে বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু 'কবি-ধন্বন্তরি' শিবরাম কেন যে বেদেদের বিশেষ করে বেদেনীদের সঙ্গে লেগে থাকে তার কারণ পাওয়া যায় না। এ চরিত্রটি এমনই বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া যে লেখক নিজেই মাঝে মাঝে তার ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠে'ছন। কৈফিয়ত দিয়ে বলছেন, 'একটা গভীর মমতা আমার ছিল—এমনই যারা বন্য—যাদের প্রকৃতির মধ্যে মানব প্রকৃতির শৈশব মাধুর্যের অবিমিশ্র আস্বাদ মেলে, রূপ ও গন্ধের পরিচয় মেলে, তাদের উপর এই মমতা স্বাভাবিক ··[তার ওপর ছিল]···রোগীর প্রতি চিকিৎসকের আকর্ষণ।' এই উক্তি ও ঠিক নয়—উপন্যাসে বেদেদের যে জীবন আঁকা হয়েছে, তা আর যাই হোক, শৈশব মাধুর্যের নমুনা নয়। চিকিৎসকের আকর্ষণ কবে থেকে?—পিঙলার প্রতি তো? তার অনেক আগে শবলার কাল থেকেই শিবরাম ওদের সঙ্গে আছে। সে যাই হোক, তারাশঙ্কর কেন বেদেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এটা তার একটা কৈফিয়ত হ'তে পারে। সাহিত্যের অন্তর্গত চরিত্রের পক্ষে হতে পারে কি?

এই শিবরাম চরিত্রটিকে আলগা ভাবেও আগাগোড়া রেখে দেননি তারা-শঙ্কর। ভদ্রলোকের ছেলে তরুণ শিবরাম, তার ওপর ছাত্র—সেইভাবে থাকলেই তো ভালো হত। তা না করে, একবার নির্জন দ্বিপ্রহরে শবলার মোহিনীতে তার মূর্ছা যাবার উপক্রম, 'বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড তাঁর সঘন স্পন্দনে স্পন্দিত হতে শুরু করেছে তখন' কিংবা 'শিবরামের বুকের ভিতরটায় যেন ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল'—এতটাই যে শবলা সেটা বুঝতে পেরে বলে, 'কবরেজ, মনের ঘরে খিল আটো গ, খিল আটো'। তখন আত্মরক্ষার জন্য, কিংবা, শবলার কাছে অপ্রস্তুত হয়ে শিবরাম শবলার সঙ্গে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে বসে। এই সম্পর্কটাই বা কী রকম? শবলাও তার সঙ্গে ভাই পাতিয়েছে, পিঙলাও তাই, কিন্তু সেই শবলা ভাইএর কাছে ভ্রূণহত্যার ওষুধ চায়, আর পিঙলা তার কাম-অনুভবের নানা কথা উদ্ঘাটিত করে তাকেই বলে। ভাই-ই বটে!

নাগু ঠাকুর অবশ্য এই রকম আলগা চরিত্র নয়, উপন্যাসের শেষে সে এক রকম নায়কই হয়ে উঠেছে। লেখক তাকে প্রথম উপস্থিত করলেন সূর্যের মতো মহিমায়, ঠিক যেমন মহাদেবকে উন্মত্তভাবে এনেছিলেন। তারপর?

গঙ্গারামের সঙ্গে প্রথম বিবাদে গঙ্গারাম তার বুকে কিল মারতেই সে অচেতন হয়ে পড়ে যায়। অথচ তার দেহে না কি হস্তীর বল। পিঙলা তার বন্ধন-মোচন করে। তারপর বীরপুরুষ বঙ্গমঞ্চ থেকে পালিয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে তার দলবল নিয়ে পিঙলাকে বিয়ে করতে আসে। বেদে পাড়াটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় — পাগল মাতালের তাণ্ডব।

অপসংস্কৃতি আছে, সৎ সাহিত্যের পাশাপাশি অপসাহিত্যও নিশ্চয়ই আছে, যদিও কোন বিষয়টি কিসের উদাহরণ। আমরা সেটা আগে থেকে — চিহ্নিত করে দিতে পারি না। সেটা হয় লেখার ধরণে। বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণনাতেও লেখক অপরুচির পরিচয় দেন, আবার অতি তীব্র যৌনতাও লেখার গুণে মহৎ সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ হয়।

বেদের মেয়েরা ছলাকলা হাবভাব দেখায়। যুবক জমিদারের কাছে শবলা তেমনি দেহবিলাসে নৃত্য করে, কিছু আদায় করবার জন্য। এই পরিস্থিতির সবটাই স্বাভাবিক, শবলা এবং জমিদার-তনয়ও। কিন্তু তরুণ শিবরাম যে ধূর্জটির আদেশে জমিদার বাড়ীতে ওষুধ দিতে এসেছিল, যে না কি আবার মর্‍্যালিস্ট, সে যখন হাঁ করে দেখে আর বিস্মিত হয়, তখন সেটাই অপরুচির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায় না কি? তারাশঙ্কর ওখানে স্বচ্ছন্দেই শিবরামকে মাইনাস করতে পারতেন। কেন যে তারাশঙ্কর ঘটনা-বর্ণনায় সহজ হতে পারেন না!

নগ্ন নারীদেহের বর্ণনায় আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা যদি খামোখাই আসে?

এটাই হয়। শরৎচন্দ্রের ধারণায় প্রবীণ বয়সে একটা থিওরি খাড়া হয়েছিল : যেখানে নারীর মন সেখানেই তার দেহ ; আর মানুষের মন বদলায়, কাজেই দেহের আনুগত্য হামেশাই বদলাতে পারে। এই তত্ত্বের একটি অপূর্ব ফল হয়েছিল 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমল। আলোচ্য উপন্যাসে নারীর নগ্ন দেহ নিয়ে তারাশঙ্করের সে রকম কোনো থিওরি ছিল বলে মনে হয় না। হয়তো নগ্নতার মধ্যে অনাবরণ আদিমতাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। অথবা, নগ্নতা আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য সেটাও তাঁকে টানতে পারে। যেমন, আমরা আগেই দেখেছি ফাদার ইমেজের বিরুদ্ধে যুব মানুষের বিদ্রোহ তাঁকে হয়তো আকৃষ্ট করেছিল।

শবলা জল সাঁতারে ভিজে কাপড়ে মহাদেবের নৌকায় উঠেছিল, ভিজে কাপড় ভারি লাগছিল বলে খুলে ফেলে দিয়েছিল। পিতৃপ্রতিমের সঙ্গে সঙ্গমের পর উলঙ্গ অবস্থায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটা রাত্রির অন্ধকারের ঘটনা

(ঘটনাটা অবিশ্বাস্য), টেনে-বুনে না হয় স্বীকার করেই নেওয়া গেল। কিন্তু পিঙলার ঘটনা ?

জমিদার বাড়িতে বেদেরা সাপ ধরতে গিয়েছিল। ভাদু আর গঙ্গারাম ঠকামি করে কোমরের গামছায় সাপ বেঁধে নিয়েছিল, নাগু ঠাকুর যা ধরে ফেলে। সর্বনাশ, বেদেদের মান-সম্ভ্রম যায়। পিঙলা নাগিনী কন্যা, বেদেদের কল্যাণের রক্ষিণী। সে বললে, এই দেখ, আমার কাপড়ে সাপ লুকানো নেই, আমি সাপ ধরব। বলে অত লোকের সামনে সে উলঙ্গ হযে গেল।

এ ঘটনার সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শেষত, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র গল্প বলার রীতি। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের কা হিনীর কিছুটা অংশ বলেছেন নিজের জবানীতে, সে অংশ স্বাভাবিক। অনেকখানি অংশ শিবরামকে দিযে, তাছাড়া পিঙলা শবলা শিরবেদেরা কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বলেছে। এ অংশগুলোই সমস্ত স্বাভাবিকতা হারিয়েছে। কেননা, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে আত্মকথনের হয়তো প্রযোজনীয়তা আছে, এখানে তার অবকাশ কোথায় ? শিবরাম যে বলছে, তার শ্রোতা যে কে তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বরঞ্চ পিঙলার বা শবলার শ্রোতা হয়েছে শিবরাম। যেখানে সহজ গল্প বলার রীতি থাকলেই স্বাভাবিক হত, সেখানে বাইরের থেকে এমন বৈচিত্র্য আনবার ব্যর্থ চেষ্টা কেন।

এসম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে, কোনো অধ্যায যে কোনো এক জনকে দিযে তারাশঙ্কর বলিযেছেন, তা নয। এমনও পৃষ্ঠা আছে যেখানে কিছুটা বলছেন লেখক, কিছুটা শিবরাম, কিছুটা পিঙলা। তাছাড়া, লেখক যখন নিজে কোনো পরিস্থিতি বর্ণনা করছেন, তখন কিছুটা দেখালেন শিবরামের চোখে, কিছুটা হয়তো ধূর্জটির অনুভবে, আবার কিছুটা শবলার চিন্তায়। লেখক কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াতে পারছেন না।

তারাশঙ্কর উপাখ্যান বলতে ভালোবাসেন। এরকম একটি উপাখ্যান হচ্ছে, বেনে-বেটীর নাগলোক যাত্রা ও সেখান থেকে মর্ত্যলোকে ফিরে আসা। উপাখ্যানটি ভালো। কিন্তু উপাখ্যানটি বলানো হল শবলাকে দিয়ে—কোন সার্থকতায় ? এক দুপুরে শবলা অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় শিবরামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তার একটা জরুরি কথা বলার ছিল, মনে খুব উদ্বেগ। শিবরাম যেই ভাই-বোন সম্পর্কের প্রস্তাব দিল, অমনি শবলা ওই দীর্ঘ কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। কোনো মানুষ অতি উত্তেজিত অস্থির মনের অবস্থায় সাত

কাহিন গল্প বলতে পারে? তাছাড়া, ওই গল্পের নীতিকথা: নাগে-নরে মিশ খায় না। তাহলে? এদিকে যে শিবরাম-শবলা ভাই-বোন পাতিয়ে বসে আছে।

এর একটা মারাত্মক ফল হয়েছে এই যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পিঙলা বা শবলাকে দিয়ে কথা বলালে সে কথা আর তাদের থাকেনা, তারাশঙ্করেরই হয়ে দাঁড়ায়। 'রজনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রেরও এই রকমই কৃতি ছিল।

'হাসির শেষে তার কথা শোনা গেল—ইরে বাবা রে! ইরে বানাস রে! মুই কুথাকে যাব রে! গোসা করিছে গো, মোর কালনাগিনীর গোসা হল্‌ছে গো! ইরে বাবা রে, ফুঁসানি দেখ গো!'

* * *

'হ্যাঁ গ মা-লক্ষ্মী, বেদেনী আলছে। অর্থাৎ এসেছে। বেদেনী আল্‌ছে মা, পোড়ারমুখী আল্‌ছে, তুমাদের দুয়ারে কাঙালিনী আলছে, সব্বনাশী-মায়াবিনী আলছে খেল দেখাতে, ভিখ মাঙতে, দুয়ারে এস্যা হাত পেতে দাঁড়াল্‌ছে।'

এই দুটি অংশেই ভাষা-রচনা সুন্দর। বেদে-মেয়েদের হাব-ভাব অঙ্গভঙ্গি চরিত্রের অন্তরময়তায় সার্থক হয়েছে। দুটি অংশই লেখকের বলা। কিন্তু পিঙলাকে দিয়ে তারাশঙ্কর যখন কাহিনী বলান—'ধন্বন্তরি ভাই। সূর্যমুখী পুষ্প—সুরযঠাকুরের পানে তাকিয়ে থাকে, দেবতার রথ চলে, পুব থেক্যা পচি মুখে—নয়নে তার পলক পড়ে না, নয়ন তার ফেরে না।'

তখন সেটি বেদের মেয়ের কথা হয় না, তারাশঙ্করের নিজের কথা হয়ে দাঁড়ায়, তাও চল্‌তি বকুনিতে বিকৃত হয়ে।

৬

কিন্তু থাক, এভাবে তারাশঙ্করকে অনুসরণ করা যাবে না। গভীর জৈবনিক প্রত্যয় এবং অখণ্ড রসকল্পনার অনুসন্ধান সর্বত্রই সার্থক হবার কথা নয়। তারাশঙ্করের রচনা মিশ্র প্রকৃতির, তাতে নানা স্তর ভাগ আছে। অংশ বিশেষে তাঁর রচনা উচ্চস্তরের হয়েছে, আবার অন্য অংশে তা হয়েছে নিম্নমানের। তারাশঙ্করের রচনাভূমির সংস্থান উচ্চাবচ।

সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ডক্ষুদ্র যেসব অংশে এমনিতেই সৌন্দর্য বা গভীর তাৎপর্য অনুভব করা যায়, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র সেই সব অংশই আমরা এখানে তুলে আনতে পারি।

সর্বপ্রথমেই মনে আসে তারাশঙ্করের উপাখ্যানগুলির (episodes) কথা।

মনসামঙ্গল দেবকথার যে উপাখ্যানটি উপন্যাসের প্রথমেই আছে, তার সৌন্দর্য এবং কাহিনীগত সার্থকতার কথা আমি আগেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বেনেবেটি-নাগ কথা তারাশঙ্করের নিজের রচিত নয়, লোককথায় কাহিনীটি পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর যেভাবে কাহিনীটি এনেছেন মূল উপন্যাসে, সেটি শিল্পানুগ নয়। শবলার ঐ রকম মানসিক অবস্থায় অতবড় কাহিনী বলা মোটেই স্বাভাবিক নয়, কাহিনীর নির্গলিতার্থ চরিত্রের সঙ্গেও সমন্বিত নয়—এসব কথা আগেই বলেছি। এখন বলছি, আসুন আমরা ওসব বিচার স্থগিত রাখি, কেবল কাহিনীটাই রাখি আমাদের সামনে। গল্পটির মর্মার্থ – নাগে-নরে মিল হয় না, যতই ভাই-বোন পাতানো হোক না কেন। ব্যঞ্জনায় পেয়ে যাই, আমাদের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে দায়ে পড়ে আঁতাত গড়া হলেও জাত-শত্রুতা থেকেই যায়। বিচ্ছিন্নভাবে এ অর্থ-ব্যঞ্জনা আমাদের আনন্দ দিতে পারে।

তারাশঙ্কর ভাবেন ঠিকই, কাহিনীগত রূপ ও তাৎপর্যও দিতে চান, পারেন না। যেমন দেখুন কালীয়-নাগকন্যার উপাখ্যান। কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিল মেয়েটি, চাঁপার মালা পরে প্রিয়তমের জন্য দিনের পর দিন যমুনাকূলে প্রতীক্ষা করত। প্রতারক কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করে নি, বিয়ে করেনি মেয়েটিকে। এদিকে স্বামী-গরবিনী অন্য নাগবালারা প্রেম-তপস্বিনী কালীয়-কন্যাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তার চাঁপার মালার জন্য। মেয়েটি বেদনার্ত হয়ে বলেছিল, এ কামনা কার না আছে? তোরাও নিজেদের কামনা গোপন করতে পারবি না, চাঁপার গন্ধের মতো তা ছড়িয়ে পড়বে।

তারাশঙ্কর এ কাহিনীকে পিঙলার চরিত্রে কোন সার্থকতায় ব্যবহার করেছেন? আমরা আগেই লক্ষ করেছি, পিঙলার দেহে সত্যকার চাঁপার গন্ধ বেরোয়নি, যা হয়েছিল সেটা গঙ্গারামের শয়তানি: পিঙলার ঘরে সে লুকিয়ে চাঁপার গন্ধের আতর ছড়িয়ে দিত। অথচ পিঙলার মানবিকতা ফোটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল চাঁপার সুবাস আনার, কিংবা, রূপকমুক্ত নাগু ঠাকুরের প্রতি নারীহৃদয়ের ভালোবাসার। কিছুটা অবশ্য দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর, কিন্তু তার মূলটাকেও কেটে দিয়েছেন। অনচ্ছ দৃষ্টি, অনাবশ্যক ভীরুতা, নাগিনীকন্যার ধর্ম সম্বন্ধে—মানে, ধর্ম সম্বন্ধেই সঠিক ধারণার অভাবের জন্য লেখক পিঙলাকে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। তার মধ্যে যে ব্যাকুলতা – শিবরাম কবিরাজ যাকে ভুল করে উন্মাদ ভেবেছিল—সেটা অভিজ্ঞানহীন রোমান্টিক ভাবালুতা [প্রসঙ্গত, এটা শিক্ষিত বুর্জোআর

হতে পারে, বেদেনীর হয় কী?] ছাড়া আর কিছু নয়, তার দীর্ঘশ্বাস এবং গায়ের জ্বালার বিবৃতি সত্ত্বেও বেদের মেয়ের বিশ্বাস্য প্রেমানুভূতি নয়। এসব আগেই বলা হয়েছে। এখন এখানে বলছি, পিঙলাকে ভুলে যাই আসুন। কালীয়নাগকন্যার বেদনার মধ্যে চিরন্তন প্রেমোৎকণ্ঠার যে ছবি আছে, সেটাই আমরা সমাদর করি। কালীয়কন্যা অনার্য, শ্রীকৃষ্ণ আর্য ক্ষত্রিয়—চিরকাল উচ্চ বর্ণের মানুষেরা বিশ্বাসভঙ্গ করে এসেছে, আধুনিক কালের এই সামাজিক তাৎপর্যে তাকে গ্রহণ করি না কেন। একলব্যের কাহিনীতে উচ্চ বর্ণের পাশব বিবেকহীনতার যে নজির, আজও কি তার পুনরাবৃত্তি হয় না?

এ গেল উপাখ্যানগুলির কথা। এ উপন্যাসের আহৃত অনেক মূল্যবান জিনিষের মধ্যে আর একটি হচ্ছে, বিষ ও অমৃত। জাত কালনাগিনীর বিষ, যা 'জলে ফেললে—জলের জীব মরে, থলে ফেললে—নরলোকের হয় সব্বনাশ! এক আপনুই তো পারেন এরে শোধন করে সুধা করতে।' এ প্রসঙ্গটি তারাশঙ্কর একাধিক বার উপন্যাস এনেছেন। ধূর্জটির মতো কবিরাজই সর্প বিষকেই সঞ্জীবনী সূচিকাভরণে রূপান্তরিত করতে পারতেন শুধু তাই নয়, বিষবৈদ্যেরাও সে বিদ্যা জানত—'নিয়ে এস মাটির সরায় জীবের তাজা রক্ত। ফেলে দাও গোখুর কি কালনাগিনীর এক ফোঁটা বিষ। কি হবে? বিষের ফোঁটা পডবামাত্র রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠবে, আগুনের আঁচে ফুটন্ত জলের মত।...তাদের সাঁতালীতে এখনও আছে সাঁতালী পাহাড় থেকে আনা এক টুকরা মূলের লতা। সেই লতার রস, তাজা লতার রস ফেলে দেবে সেই জমাট বাঁধা রক্তে; ...তেলের মত সাপের বিষ মিলিয়ে যেতে থাকবে, জমাট বাঁধা রক্তের ঢেলা আর জল মিশে যাবে।

এই অপূর্ব ব্যঞ্জনাগর্ভ উপাদানটিকে সমস্ত উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে, নানা চরিত্রের মধ্যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ছড়িয়ে দিয়ে তারাশঙ্কর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' লিখেছেন কি? বিষ তো কাম, কামনা? মহাদেব আর গঙ্গারামের মধ্যে বিষ আছে, কিন্তু কোন অমৃতে তা পরিণতি লাভ করল? শবলার কামের বিষ অমৃতে পরিণত হয় নি। আর পিঙলাকে তো ভীতু তারাশঙ্কর একবারও কামার্তা করলেন না যে নাগু ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তা অমৃত হবে! এসব সম্বন্ধে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সৃষ্ট শিবরামের মতোই: সে যুবতী বেদেনীর দেহচ্ছন্দ অবাক হয়ে দেখে, মেয়েটির ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি ভাই-বোন সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে। তারাশঙ্কর পিঙলার ধর্ম রক্ষা করতে চেয়েছিলেন যে।

প্রসঙ্গত, ধর্ম সম্বন্ধে, পাপ ও পাপের স্খালন সম্বন্ধে তারাশঙ্করের অদ্ভুত ধারণা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। 'কালিন্দী'-তে রামেশ্বর স্ত্রীপুত্রঘাতী, কিন্তু তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত তার দুই পুত্র, মহীন আর অহীন। আলোচ্য উপন্যাসে পাপ করছে প্রতিটি বেদেও বেদেনী, কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তাদের ধর্মরক্ষা করে নাগিনীকন্যা পিঙলা। আশ্চর্য নয় কি ?

যে কথা বলছিলাম, বিষ আর অমৃতের প্রসঙ্গে মানুষের অন্তরের কাম-প্রেম লোভ-ত্যাগের যে ব্যঞ্জনা আসে, আমরা পাঠকরা সেটাই ভেবে নেব। শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁদের রচনায় এবং সাধকেরা তাঁদের জীবনে এই উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

তারাশঙ্করের রচনা থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি—বিরল উদাহরণ, তবে আছে, আর বিবৃতি নয়, যা সাহিত্যের সজীব সৃষ্টি হয়েছে সেই রকম :

'ধাত্রীদেবতা'-য় খোনা নেলচি মেয়ের উপাখ্যান : এক দিকে ব্যাধি দারিদ্র ক্লিন্নতা আর অন্য দিকে তারই ওপর ফুটে-ওঠা প্রেমের ফুল। এই 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে মনসামঙ্গল-দেবকথার উপাখ্যান। কালনাগিনী পাপ করেছিল, নিরপরাধ নববধূকে বিধবা করেছিল। কিন্তু কেন ? মনসার প্রতি ছিল তার দ্বিধাহীন আনুগত্য, আজ্ঞাবহতা—এটা গৌরবের বই কি। আর আদি শিরবৈদ্য বিশ্বম্ভর চাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কিন্তু কোন প্রবর্তনায় ? তার বুকে ছিল যে কন্যা-স্নেহ। আবার, এই পাপের ওপরই হল দুই অভিশপ্তের মিলন : কালনাগিনী কন্যার মতো বিশ্বম্ভরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুলতে লাগল। উদ্ধৃতি আগেই নিয়েছি, পাঠক লক্ষ্য করুন। বিষ কিন্তু আগে পিছে অমৃতের বর্ডার দেওয়া। অমৃত-পাপ অমৃত—মানব হৃদয় বড় চলিষ্ণু। মানুষের চলার পথে অমৃত থেকেই বিষ, বিষ থেকে অমৃত অহরহ উৎপন্ন হচ্ছে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে ব্যাধিব কথা আছে, মৃত্যুর কথা আছে। আছে 'আরোগ্য নিকেতন'-এও। সমগ্র উপন্যাসের দেহে ব্যাধির কথা জৈবনিকতায় সম্পৃক্ত নয় বলেই আমরা মনে করি, আগেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। কিন্তু পাঠক তো পড়েছেন টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন', রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ'। সেই অনুষঙ্গ আপনার মনে সক্রিয় হোক, কিছু পাবেন।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের ষ্ট্রাকচার দুর্বল, চরিত্র-চিত্রণে মানবিক

প্রত্যয় অগভীর এসব কথা বলেছি। খুঁজছি এর অঙ্গে ছড়ানো-ছিটানো উপাদানের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য বা ব্যঞ্জনাময়তা। দু'একটি উদাহরণ নিলাম এখনই। আর একটি উপাদান সামনে আনতে চাই। সেটি হচ্ছে নাগ-নাগিনীর কথা। তারাশঙ্কর সাপ এবং সাপুড়েদের ভালো করে চিনতেন বলেই মনে হয়। এই উপন্যাসে সাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কখনো তিনি পুঁথির কাছে হাত পেতেছেন (সেটা ভুল তা বলছি না), কখনো নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। সাপের প্রসঙ্গ আনতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সার্থক হয়েছেন শিল্পী।

উপন্যাসের কোনো একটি উপাদানকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে চরিত্রের সঙ্গে সমন্বিত করে দেখাতে হয়—রচনার এই প্রাথমিক শর্তটি তারাশঙ্কর মেনেছেন। শবলা এবং পিঙলার বর্ণনায় বারবার কালনাগিনীর কথা এনেছেন তিনি, ভালোই করেছেন। উপন্যাসের একেবারে গোড়ার দিকে দেখছি, একটি কালনাগিনী জলে সাঁতার কেটে পালাচ্ছে, আর শবলাও তেমনি তাকে সাঁতরে ধরবার জন্য ছুটছে, এ বর্ণনা সুন্দর একটু পরেই উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যাবে। পিঙলার দুই হাতে ঝোলানো দুটি কালো নাগ ও নাগিনী—তার যে রূপ দেখে নাগু ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছিল, এ চিত্রও প্রতীকধর্মিতায় সুন্দর।

অন্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও সাপের অভিজ্ঞান। ডোমন করেত কী রকম?—'সে অন্ধকার রাত্রের সঙ্গে তার নীলচে দেহটা মিশিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তোমায় অনুসরণ করে লুকিয়ে থাকবে। দিনের আলোতে যদি অনুসরণ করতে নাই পারে, তবে আক্রোশ পোষণ করে অপেক্ষা করে থাকবে। আসবে সে ঠিক খুঁজে খুঁজে। তারপর করবে দংশন। সে দংশনে নিস্তার নাই। ব্রাহ্মণেরা বলে—খেলে ডোমনা, ডাক বামনা।' লেখক গঙ্গারামের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে, এই ডোমন করেতকে এনেছেন। মহাদেবকে শঙ্খচূড় বলছেন—বলাটা ঠিক হয় নি। কিন্তু ওই একই শঙ্খচূড় অভিজ্ঞান হয়েছে নাগু ঠাকুরের—এ চরিত্রের উন্নত মহিমার বিবৃতি আছে, ক্রিয়ার মধ্যে তা সত্য হয়নি—কিন্তু তবু এই অভিজ্ঞান মানানসই হয়েছে। লক্ষনীয় যে শবলা তার প্রেমিককে দেখেছিল দুগ্ধধবল রাজগোখুরার রূপে। পিঙলার প্রেমের উৎকণ্ঠায় তার চোখে পড়েছে হয় পদ্মনাগের সুন্দর মূর্তি, নয়তো শঙ্খচূড়ের উন্নত মহিমা। তারাশঙ্কর পিঙলার জীবনের শেষ ঘটনাটির প্রতি সুবিচার করেছেন—যে শঙ্খচূড়টিকে নাগু ঠাকুর পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছিল, আর যেটি পিঙলার কাছেই ছিল, সেই শঙ্খচূড়ের

কাছেই বুক পেতে দিয়েছিল পিঙলা, তার দংশন নেবার জন্য। শ্রেষ্ঠ প্রেম মৃত্যুমুখিন—তাই ভাবছেন তো? আমিও ভাবতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। কিন্তু মন একটু খুঁতখুঁত করে ওটি যে অমূল তরু—নাগুর প্রতি পিঙলার ভালোবাসার পরিচ্ছিন্ন মূর্তি উপন্যাসে নেই যে। সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

এছাড়া কত বিভিন্ন প্রকার সাপের বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর, এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে—পুরাণ এবং বাস্তব মিলিয়ে সে বর্ণনা সম্পূর্ণ:

'পরনে তাঁর [বিষহরির] রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলছে, সর্বাঙ্গে সাপের অলংকার, মাথায় গোখুরা ধরেছে ফণার ছাতা, মনিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি সাপের বলয়। শঙ্খিনী সাপের শঙ্খ, বাহুতে মণিনাগের বাজুবন্ধ, গলায় সবুজ পান্নার কণ্ঠির মত হরিদ্রক অর্থাৎ লাউডগা সাপের বেষ্টনী, বুকে দুলছে কালনাগিনীর নীল অপরাজিতার মালা, কানে দুলছে তক্ষকের কর্ণভূষা, কোমরে জড়িয়ে আছে চন্দ্রচিত্র অর্থাৎ চন্দ্র-বোড়ার চন্দ্রহার, পায়ে জড়িয়ে আছে সোনালী রঙের লম্বা সরু কাঁড় সাপ পাকে পাকে বাঁকের মত; সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগ-কন্যারা বিষের বাতাস। সে বাতাসে মায়ের চোখ করছে ঢুলঢুল। মায়ের কাঁধে রয়েছে বিষকুম্ভ, সেই কুম্ভ থেকে শঙ্খের পানপাত্রে বিষ ঢেলে পান করছেন, আবার সেই বিষ গলগল করে উগড়ে ফেলে বিষকুম্ভকে পূর্ণ করছেন। মায়ের পিঠের কাছে মৃত্যুপুরীর তোরণে অন্ধকার করছে থমথম।'

বাঙলা সাহিত্যে বীভৎস রসের ধারক বর্ণনা নেই বললেই চলে। তারা-শঙ্করের এই রচনায় পাঠক তার উদাহরণ পেয়ে তৃপ্ত হবেন।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় কল্পনা নাগিনীকন্যা শবলা ও পিঙলাকে নিয়ে। নাগিনীকন্যার অভিজ্ঞান কালনাগিনী। কালনাগিনীর কথা বহুবার তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে এনেছেন, প্রয়োজনেই এনেছেন। তার প্রথম উপস্থাপনাটি এই রকম:

পাশের ঘাসবন থেকে ছপ করে একটা মোটা দড়ি আছড়ে পড়ল। একটা সাপ। কালো—একেবারে অমাবস্যা-রাত্রির মেঘের মত কালো তার গায়ের রঙ, সুকেশী সুন্দরীর তৈলাক্ত বেণীর মত সুগঠিত দীর্ঘ আর তেমনি তার কালো রঙের ছটা। জলে পড়ে একখানি তীরের মত গতিতে, সে জল কেটে ছুটল ওপারের দিকে।

এখানে প্রথমেই না বলে পারছিনা, তারাশঙ্কর শব্দ-প্রয়োগে অত্যন্ত

অসতর্ক : 'একটা সাপ' কেবল এই কথাটির জন্যই এমন সুন্দর বর্ণনাটি মাটি হতে বসেছে। আমরা ওটা বাদ দিয়ে পড়ি আসুন। রূপাকর ক্রমোৎকর্ষে কালনাগিনীর অনন্য পরিচ্ছিন্ন মূর্তিটি সহজেই আমাদের অনুভূতিগোচর হয়।

আবার সেই কালনাগিনী ধরা পড়েছে শবলার হাতে, সেখানকার বর্ণনা অন্য এক ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছে—'জিভ লকলক করে বেরুচ্ছে ; কিন্তু নিমেষহীন তার চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে রয়েছে একান্ত অসহায়ের মত। সারা দেহটা শূন্যে ঝুলছে, একে বেঁকে পাক খাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মেয়েটার হাতে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।'

এ বর্ণনা পড়ে আমাদের মন সকরুণ হয়ে ওঠে—কালনাগিনীর বন্দী-দশার জন্য, যার অমন শক্তি আর সৌন্দর্য। বন্দী দাস জাতি—চকিতে স্পার্টাকাসকে মনে পড়ে কি ?

কত বিচিত্র রকমের চিত্রকল্প রচনা এবং বিভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ-ব্যঞ্জনা এই কালনাগিনীকে অবলম্বন করেই এনেছেন তারাশঙ্কর। শবলা তার শত্রুতাড়িত দুর্ভাগ্যের কথা ধূর্জটি কবিরাজকে বলতে গিয়ে কালনাগিনীকে এনেছে।

'বাবা গো নাগিনী যখন শিশু থাকে, তখন কিলবিল কর‍্যা ঘুরে বেড়ায় ; ঘাসের বনে বাতাস বইলে পর, তা শুনেও হিস কর‍্যা ফণা তুলে দাঁড়ায়। বয়স বাড়ে বাবা, পিথিমীর সব বুঝতে পারে, সাবধান হয়। মানুষ দেখলি, জন্তু দেখলি সি তখন ফোঁস কর‍্যা মাথা তুলে না বাবা, চুপিসাড়ে পলায়ে যেতে চায়। নেহাত দায়ে পড়লি পর তবে ফণা তুলে, বাবা। তখন আক্কেল হয যি, মানুষ সামান্যি লয়। মানুষকে কামড়ালি পরে নাগের বিষে মানুষ মরে, কিন্তু মানুষ তারে ছাড়ে না, লাঠির ঘায়ে মারে।'

আধুনিক সভ্যতায় প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের শত্রু, শ্রেণীগত শত্রুতা, নিম্নস্থের অসহায়তা তো আছেই। সেই সমাজ-সত্যের গূঢ়ার্থময় ব্যঞ্জনাই পাই এখানে।

পাঠক যদি খোঁজেন, তাহলে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' থেকে এই রকম ছড়ানো-ছিটানো অনেক মূল্যবান রত্ন হাতে তুলে নিতে পারবেন॥

কালিন্দীর সমাজতত্ত্ব

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

১.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী (১৩৪৭) উপন্যাসের চারটি স্তর— রায়-চক্রবর্তী জমিদার, সদগোপচাষী, সাঁওতাল ও মিল-মালিক। এই চারটি স্তরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক, আবার স্তরগুলির আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন কালিন্দী নদীর ওপারের নতুন চরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে বিধৃত। এর সঙ্গে শাড়োব পাড়ের মত মজুমদার, ননী পাল ইত্যাদিরা এসেছে। লক্ষণীয় রাষ্ট্র বা সরকার এই বাস্তবে আসে মামলা-আদালত এই সূত্রেই— নচেৎ জমিদার-লগ্ন রায়হাট গ্রাম যেন রাষ্ট্র-সীমানার বহির্বৃত্তের। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আওতার বাইরে, কিন্তু আদালত-মামলার সূত্রে তার সঙ্গে যুক্ত এই গ্রামীন-বাস্তব, কৃষি সমাজ, ঐতিহাসিক-কথিত রাজনীতির দ্বিতীয় জগতের।* রাজনীতির প্রথম জগৎ রাষ্ট্র ক্ষমতার আইন-রাজনৈতিক বিশেষ রূপ অনুযায়ী নির্মিত। আর দ্বিতীয় জগতে শ্রেণী ক্ষমতা রাষ্ট্রের আইন রাজনীতির প্রক্রিয়ার বাইরে চালিত হয়। নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের (যেমন আদালত, থানা) মদত এতে থাকে: কিন্তু অধিকাংশ সময় হয় রাষ্ট্র এই ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে অচেতন, নয় রাষ্ট্রীয় বিধিলঙ্ঘন করেই এর ব্যবহার ঘটে। তারাশঙ্কর যে জমিদারদের উপন্যাসে আনেন তারা কেউই বড় জমিদার নয়। কালিন্দী উপন্যাসের সময়কাল, ১৯২০-র দশক, সে সময় "The basic tendencies of agrarian change in colonial Bengal were clearly visible—the fragmentation of estates, subinfeudation, rackrenting and, with the spread of commercial crops from the later nineteenth century, a differentiation within the peasantry as well. As

we move into the twentieth century, it becomes evident that the entire system of zamindari and tenureholding proprietorship was heading towads a massive crisis ..." (পার্থ চ্যাটার্জী : পৃ১৪) কালিন্দীর প্রথম পৃষ্ঠাতেই তারাশঙ্কর এই সঙ্কটের চেহারাটি উপস্থিত করেন : "ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠল। রায়হাট প্রাচীন গ্রাম। এখান কার প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। এই বহু-বিভক্ত রায় বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামীত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুয়েক মহাজন এবং জন কয়েক চাষী প্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি—চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি—তাঁহার নিকট "আবদ্ধীয়" জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট "আবদ্ধীয়" সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে।'* এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় "রায় বংশের বর্তমানে একশত পাঁচজন শরিক, বাকী খাজনার মকদ্দমায় জমিদার-পক্ষীয়গণের নাম লিখিতে তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়।" অবক্ষয়ী জমিদার শ্রেণী একদিকে কৃষকের পুরনো বিরোধ, অন্যদিকে মহাজন-মিল-মালিক-ব্যবসায়ীদের বিরোধের সম্মুখীন। ছোট চাষীর মালিকরা গরীব চাষী-বর্গাদার-ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে—তারাশঙ্কর এ প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষে-প্রচ্ছন্নে উপন্যাসে এনেছেন। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যোগ্য সচেতনতার পরিচয় রেখেই তারাশঙ্কর জমিদার শাসিত দ্বিতীয় জগতের রাজনীতির শ্রেণী ক্ষমতার চিত্র আঁকেন। জমিদাররা এজগতে তাদের জমিদারীতে প্রায় সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে, নিজেদের লাঠিয়াল অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনী মজুত রাখে, শান্তি বিধান বিচার সবই তারাই করে, খাজনা নেয়, বেগার খাটায় সরকারী আইন উপেক্ষা করেই। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোন প্রত্যক্ষ

* "কালিন্দী" উপন্যাসের ঘনিষ্ঠা-পাঠের জন্য মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রকাশিত তারাশঙ্কর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮২) ব্যবহার করা হয়েছে।

দৈনন্দিন যোগাযোগ এ জগতে থাকে না। ইন্দ্রনাথ রায়ের কাছারি বাড়ীর বর্ণনা বা তাঁর সামগ্রিক আচরণ, মহীন্দ্রর ননীপালকে গুলি করে মারা এ সমস্তই এ জগতের দৃষ্টান্ত—এই ছোটজগতে কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোর উপস্থিতি মনে হয় দূর।

এই জমিদারী জগতেই আছে রংলাল, নবীন, ননী পাল সব চাষীরা। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের আইন যে চাষীর পক্ষে নয়, একথা এ চাষীরা জানে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে একাধিকবার এটাই দেখানো হয়েছে মামলায় জিৎ বা বিচারে শাস্তি দানের সঙ্গে "ধর্মের", মানবিকতার যোগ নেই। রংলাল বলে চরের জমিটা "ধম্ম অনুসারে আমাদের পাওনা বটে কি না?···আমি যা বলছি—ই হল আইনের কথা। আইন তো আর ধম্মের ধার ধারে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ।" রংলালের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর জমিলোভী চাষীর ছবি আঁকেন, যে জমির জন্য ঐ ধর্ম, নীতি, বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত নয়। নবীন বাগদীর মামলায় তার ভূমিকা ও আত্ম-অনুশোচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "রংলালের বুকের ভিতরে অবরুদ্ধ ক্রোধ হু হু করিতেছিল, শ্রীবাস ও মজুমদারের প্রবঞ্চনার ক্ষোভ, সঙ্গে সঙ্গে চরের উর্বর মৃত্তিকার প্রতি অপরিমেয় লোভ, এই দুইয়ের তাড়নায় সে যেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল।" এর পাশাপাশি নবীন বাগদী: রংলাল তাকে ব্যঙ্গ করে, "যা যা বেটা বাগদী, ঘরে পরিবারের আঁচল ধরে বসে থাকগে যা।" "নবীন জাতে বাগদী আজ তিনপুরুষ ধরিয়া তাহারা জমিদারেব নগ্‌দীগিরিতে লাঠি হাতেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে···।" "নবীন চক্রবর্তী বাড়ির পুরানো চাকর।" সে সেলামী না দিয়ে জমির বন্দোবস্তর আবেদনে সাড়া দেয় নি, সদগোপ চতুর চাষী রংলাল অহীন্দ্রকে দিয়ে এটা করাতে চায়। কিন্তু তার আপত্তি সে জানাতে পারে নি। অপরাধবোধ দলের ভয়ে চেপে রেখেছিল। "রংলাল এবং অন্য চাষী কয়জন যখন এই সঙ্কল্পই করিয়া বসিল, তখন সে একা অন্য অভিমত প্রকাশ করিতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল খানিকটা লোভ।···সর্বশেষ রংলাল যখন বলিল, ওই সাঁওতাল-দের চেয়েও কি আমরা চক্রবর্তী-বাড়ীর পর?—তখন মনে মনে সে একটা ক্রুদ্ধ অভিমান অনুভব করিল···।" কিন্তু নবীনের মনে দ্বিধা আবার ফিরে এল শ্রীবাসের চক্রান্তে—"সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চারিদিক হইতে চক্রবর্তী-বাড়িকেই ফাঁকি দিবার আযোজন চলিতেছে। তাহারা, শ্রীবাস মজুমদার সকলেই ফাঁকি

দিতে চায় ঐ সহায়হীন চক্রবর্তী বাড়িকে, তাহারই পুরানো মনিবকে। এক মুহূর্তে তাহার মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল, তিনপুরুষের মনিবের পক্ষ হইয়া সমগ্র বাগদীবাহিনী লইয়া লড়াই দিবার জন্য তাহার লাঠিয়াল-জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।" নবীন চক্রবর্তীর হয়ে দাঙ্গা করে জেলে যায়। রংলালের চাতুর্য ও জমির লোভও বিপর্যস্ত হয় মজুমদার-মিলমালিকদের হাতে। উপন্যাসের প্রথমপর্বে রায়-চক্রবর্তী দ্বন্দ্বের সময় ইন্দ্রনাথ রায় যে ননী পালের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করেন ও যাকে গুলি করে চক্রবর্তী বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র মহীন্দ্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, সেই ননীপালও "একজন সর্বস্বান্ত চাষী। দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, ফৌজদারি মকদ্দমায় তাহার যথাসর্বস্ব গিয়াছে, জেলও সে কয়েকবার খাটিয়াছে।" তারাশঙ্কর চাষীদের জমিদার-কেন্দ্রিক সমাজের অংশ হিসাবেই এঁকেছেন, তারা সাঁওতালদের অবজ্ঞা করে, জমির লোভে অন্যায় ফাঁদে পা দেয়, আবার নবীনের মত এই জমিদারের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছু হটে না।

আধুনিক ইতিহাস চিন্তায় যাদের Subaltern বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে আদিবাসী ও নিম্ন জাতিবর্ণের কৃষিমজুর ও বর্গাদার ভাগচাষী এবং সদগোপ ইত্যাদি জমির মালিক চাষী, কালিন্দীতে প্রত্যক্ষ এসেছে। মিলের মজুররা আসে আভাসে ইঙ্গিতে। রাজনীতির দিক থেকে এই সাবঅলটার্‌ন্ দলগুলি আপেক্ষিকভাবে স্বশাসিত, তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সামুহিক মানসিকতা আছে। উচ্চবর্ণীয় এলিট রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের জগৎ থেকে এ জগৎ পৃথক। এই "দল" সমূহ জমিদারদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ইতিহাসে অনেকবারই প্রবৃত্ত হয়েছে, কৃষিবিদ্রোহের ইতিহাস কম নয় আমাদের দেশে। কিন্তু মোটামুটি hegemonic dominant classes-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এদের অধীন থেকে এদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। ইতিহাসের গবেষণায় সাধারণত এরা বিস্ফোরণের সময় দেখা দেয়—ফলে এরা হয়, বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের নায়ক নয় সামগ্রিকভাব নিষ্ক্রিয়তার প্রতিমূর্তি। কিন্তু এই দুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি স্তরেই এদের জটিল মানসিক অবস্থান। জাতি-বর্ণ, সম্প্রদায়, শ্রেণী, আঞ্চলিকতা-জাতীয়তা নানা প্রশ্ন ও প্রক্রিয়া এখানে ক্রিয়াশীল।* চক্রবর্তী-বাড়ীর ঝি মানদা রংলালকে বলে "এই ভোরবেলাতে

কি ভদ্দর নোকে ওঠে নাকি ?· এ কি চাষার ঘর পেয়েছ নাকি ?" কিংবা রংলাল নবীনকে বাগদী বলে অবজ্ঞা দেখায় ; সাঁওতালদের বুনো বেঙা বলে। শুধু তাই নয়, এদের ভূমিকা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকম হতে পারে—জমিদারের প্রতি অনুগত হয়েও জমির লোভে অন্য ফাঁদে যায়। তারাশঙ্কর এই সহযোগিতা-অধীনতা আবার চাষীদেব অসহায়তাকেই এঁকেছেন চাষীদের ক্ষেত্রে। দেখিয়েছেন তাদের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়াকে : জমিদার, মজুমদার-শ্রীবাস, মিল-মালিক সবায়ের হাত ঘুরে তারা একেবারেই, ধ্বংস হয়ে গেল। রংলালের জমি পাবাং-াঁচানোর সব চাতুর্যই ব্যর্থ হল। তারা যেন এক একজনের হাতের ক্রীডনক মাত্র। সাব-অলটারন্ জাগরণের কাহিনী তাবাশঙ্কর এ উপন্যাসে আঁকেন নি—এখানে অন্য এক জাগরণের কথা তিনি বলেন।

এই চাষীদেব প্রতিতুলনা হিসাবেই তারাশঙ্কর এনেছেন সাঁওতালদের। যে চর উপন্যাসের জোড়, সেই চরে প্রথম বসতি স্থাপন করে এই সাঁওতালরাই। "রংলাল হুশিয়ার লোক, প্রবীণ চাষী, ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন সে অনেকটাই বোঝে", এই চাষীদের পাশাপাশি সাঁওতালরা আছে। প্রায় যাযাবর এই সাঁওতালরা 'কালিন্দী' উপন্যাসে এসেছে তাদের লোকজীবনের পুরাণ, গল্প, গান, আকাড়া-সভ্যতা নিয়ে ; আবার বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় তারা কেমন ভেসে যায়, তথাকথিত সভ্যরা তাদের কুৎসিতভাবে ভোগ্যপণ্য করে, অত্যাচার করে—তাদের নিজেদের মধ্যেও আসে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাও তারাশঙ্কর প্রায় ঐতিহাসিক নৈর্ব্যক্তিকতায় আঁকেন। "নবীন রংলালের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, আমরা বলি সব বুনো বোঁঙার জাত। তা দেখ, বুদ্ধি দেখ। লক্ষণ-কল্যোণগুলি তো সব বোঝে ওরা।" রংলাল বলে, "ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালীজাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর ওই সব জন্তু জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে। ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল—কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপন মগজেই খানিকটা জায়গা-জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে, এইবার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হচ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটলো সব। বাস, আর যায় কোথা, লেগে গেল কাটাকাটি ! জমিদার বলছে চর আমাদের ; আমরা চাষীরা বলছি, ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারের চর উঠেছে, চর আমাদের। আসল ব্যাপার হল—ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা

ফলাচ্ছে বুঝলেন ?" এই আদিম অর্ধ উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ জাতি অহীন্দ্রকে মুগ্ধ করে, মোড়ল-মাঝি কমলকে তার মনে হয় "কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তরখণ্ড।" চাষীভূষির গল্প শোনা যার নেশা সেই অহীন্দ্র সাঁওতালদের সামনে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। সারীর মত মেয়ের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাকে যেমন মুগ্ধ করল, তেমনি এদের প্রত্যক্ষ ঋজু মনুষ্যত্বও তাকে ভিন্ন বৃত্তে নিয়ে যায়। "অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবার ভয়ও করে না"—তারাশঙ্কর এখানেও সংঘর্ষ-সংঘাত দ্বন্দ্বকে ধরেন নি, বরঞ্চ নানা প্রতারণা-শোষণের ফাঁদেপড়া মনুষ্যত্বের আদি-রূপ এই সাঁওতালদের ভেসে যাওয়াই দেখান। তবে রংলালদের জগৎ যে এদের জগৎ নয়, সেটি বোঝাবার জন্য সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব-পুরাণ-গান-নাটকে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে বোঝা যায়, এ জগৎ ভিন্ন।

জমিদার-চাষী-সাঁওতাল এই তিনমুখী বিশ্বের একেবারে প্রতিপক্ষে আসে বিমল মুখার্জি। মজুমদার—শ্রীবাসরা জমিদার-কেন্দ্রিক সমাজের শোষণের অঙ্গ। জমিদারী: অবক্ষয়ে এরা প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু মিল মালিক মুখার্জি এই গোটা জগতেরই বিরোধী, সেই জগতের ভাঙ্গনের মাধ্যম। শ্রীবাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এইউপমা ব্যবহার করেন, "মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে, তেমনি-ভাবেই হিসাবের খাতায় কলমের ডগায় কালির সূত্র টানিয়া যোগ দিয়া গুণ দিয়া জালখানিকে সে সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" মাকড়সার জালের উপমা জমিদারী জগতেরই সূক্ষ্মভাবে জমিগ্রাস করার। আর বিমলের কাছে ইন্দ্র রায়রা "ড্রোনস্ অব দি কানট্রি! ইডিয়টস! দিজ জমিণ্ডারস।" উপন্যাসের প্রথম দিকে অহীন্দ্র চরে গেলে সাঁওতালরা একটি অজগর সাপ দেখায়, তারা মেরেছে : "পল্লীর এক প্রান্তে এক বিশাল অজগর ক্ষতবিক্ষত দেহে মরিয়া তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে চিত্রিত মাংসস্তূপের মত।" এই সাপের উপমাই ঘুরে আসে বিমলবাবুর প্রসঙ্গে। এখানে আর ঐ অজগর মৃত নয়। "সারীর মত উচ্ছল চঞ্চল বর্বররাও বিমলবাবুকে ভয় করে, অজগরের মুখের অদূরবর্তী জীবের মত যেন অসাড় হইয়া যায়।" বিমল মুখার্জির কর্ম-ন্যায়-নীতি-মূল্য-বোধ জমিদারী জগতের, কৃষিবিশ্বের বাইরের—মজুমদার, শ্রীবাস, কলকাতার অজীর্ণ রোগী অচিন্ত্যবাবুকেই শুধু চরের কল গ্রাস করে না, "এখন রায়হাটের চেয়ে জিনিসপত্র চরেই কাটতি হয় বেশী, চরে মিস্ত্রী-মজুরেরা দরদস্তর করে কম, কেনেও পরিমাণে-বেশী।" মজুমদার যে সম্মান পায়, তা চক্রবর্তী বাড়ীর নায়েব হিসাবে নয়, কলের ম্যানেজার হিসাবে। যে মজুমদার আজীবন বংশ

পরম্পরায় রায়হাটের লোক, তারই ফাঁকিতে প্রতারণায় চক্রবর্তী বাড়ীর বৈষয়িক সর্বনাশ ঘটে, সেই মজুমদারেরই এখন মনে হয়, রায়হাটের "পথে একহাঁটু ধুলা হইয়াছে। চারিপাশে দীর্ঘকালের প্রাচীন গাছের ঘনছায়ার মধ্যে হিম যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পথের উপর মানুষ-জনও নাই।···পথের দুই পাশে প্রাচীনকালের নৌকার মত বাঁকানো চালকাঠামোটুকু কোঠাঘরগুলির দিকে চাহিয়া তাহার ঘৃণা হইল। বলিল, "হু, কি সব জঘন্য চালকাঠামো। সে কালের কি সবই ছিল কিম্ভুত-কিমাকার। যত জবড়জং—হাতির শুঁড়, পরী সিংহী—এই দিয়ে আবার বাহার করেছে। ঘর করবে বাংলোচাল সোজা একেবারে পাকা দালান-ঘরের মত।" নতুন কলের ম্যানেজারের এই স্বগতোক্তিতেই পরিবর্তনের চেহারাটি স্পষ্ট। এই ঘৃণা জমিদার জগতের মজুমদারের শেষ পর্যন্ত থাকে না—ইন্দ্রনাথ রায়ের কাছে মুখার্জি সাহেবের প্রস্তাব রাখতে রাখতেই তার আবার পুরনো আনুগত্য, জমিদার-কেন্দ্রিক মনোভাব ফিরে আসে। তবে তার ফলে রায়হাটের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে আসে ব্যথা। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে চরের কলের মালিকের চূড়ান্ত সংঘর্ষের কথা অনিবার্য জেনে তাকে ফিরতে হয়—অথচ প্রায় শরিকী দ্বন্দ্বেই মিল মালিককে ইন্দ্রনাথ আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। "মজুমদার ভারাক্রান্ত মন লইয়াই সংবাদ দিতে চলিয়াছিল। নদীর ঘাটে আবার যখন সে নামিল, তখন ওপারে বয়লারে বারোটার সিটি বাজিতেছে। কলরবে কোলাহলে চরটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ-পার হইতে চরটাকে বিচিত্র মনে হয়। কালিন্দীর কালো জলধারার কূলে সবুজ আস্তরণের মধ্যে রাঙা পথের ছক, নূতন ঘরবাড়ি, মানুষের চাঞ্চল্য কোলাহল, কুলীদের গান—অদ্ভুত! চরটা যেন এক চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণের দিকে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত।"

"এ-পারে রায়হাট নিস্তব্ধ; সমস্ত গ্রামখানা প্রাচীন কালের গাছে গাছে আচ্ছন্ন। গাছগুলির মাথায় রাশি রাশি ধুলা, কয়খানা প্রাচীন কালের দালানের বিবর্ণজীর্ণ চিলে-কোঠা কেবল গাছের উপরে জাগিয়া আছে ধুলি-ধূসর জটার কুণ্ডলীর মত। ও-পারের চরটার তুলনায় মনে হয়, যেন কোন লোলচর্মা পলিতকেশা জরতী ঘোলাটে চোখের স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে নিস্পন্দ নির্বাক।" এই দুটি পাশাপাশি চিত্রর মধ্যেই তারাশঙ্কর ইতিহাসের ইঙ্গিতকে ধরেছেন—কিশোরী ও জরতীর চিত্রকল্পে তিনি একটি জগতের বিদায় ও আর একটির আগমনের প্রক্রিয়াটিকে

এনেছেন। প্রসাধনে মত্ত কিশোরীর চিত্রকল্পটি অব্যর্থ—প্রাণচঞ্চল্য ও সেই চাঞ্চল্যের প্রকৃতিটি যেমন এতে ধরা পড়ে, তেমনি লোলচর্মা পলিতকেশার পরপারের দিকে নির্বাক চেয়ে থাকায় এ জগতের অবসানের ঘোষণা। বিমল মুখার্জির কাছে জমিদার-চাষী, মজুমদার, শ্রীবাস সকলেরই যে পরাজয়, চরে মিল-মালিকেরই জয়লাভ ইতিহাসের প্রক্রিয়াতেই ঘটছে। তারাশঙ্কর খুব তাৎপর্যের সঙ্গেই চরে প্রথমে সাঁওতাল, তারপর জমিদার চাষী, তারপর মিল-মালিকের প্রতিষ্ঠা দেখান—নতুন জমির ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার এই পরম্পরায় যেন সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনেরই ছবি ধরা পড়ে। বিমল মুখার্জিকে তারাশঙ্কর নিশ্চয়ই সহানুভূতির সঙ্গে আঁকেন নি—এই কলওয়ালা সারীকে জোর করে করায়ত্ত করে, তাকে মারে, তারপর অত্যাচার করে, সাঁওতালদের জমি আত্মসাৎ করে, তার আচরণ নিষ্ঠুর ও উদ্ধত, মজুরদের সে পশুদের মত দেখে—তাদের নেশাগ্রস্ত করে। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের মত সাঁওতালদের স্বাধীন জীবনের জায়গায় চরটাকে সেই করেছে কুলীব্যারাকের মত, "যেন স্তব্ধগতি ট্রেনের মত মনে হইতেছে।" তারাশঙ্কর জমিদারী আভিজাত্য ও দম্ভর পাশাপাশি বিমল মুখার্জির দম্ভ ও কর্ম পদ্ধতিকে দেখিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঐতিহাসিক বিবর্তনকে, প্রক্রিয়াকে তারাশঙ্কর অমান্য করতে পারেন নি। অহীন্দ্রর মা সুনীতি এ উপন্যাসের অন্যতম রিল্যায়েবল ন্যারেটর—তাঁর তিতিক্ষা, মানবিকতা, সবার প্রতি ভালবাসার কথা এ উপন্যাসে বারবার বলা হয়েছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে তাঁর "আজ মনে হইল কালের ভগ্নী কালিন্দী মহাকালের নির্দেশকে প্রতিফলিত করিয়া চলিতেছে। আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত—আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতোধারায় উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল।" "উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী"-র রেটরিকেই বোঝা যায় তারাশঙ্করের ঐতিহাসিক বীক্ষাকে। অথচ ইন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি: "চাষীরা সব আমাদের বিপক্ষ হয়ে কলের মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অথচ এতদিন খুন করলেও তারা আমাদের বিপক্ষে কথা বলে নি, বিচার বলে মেনে নিয়েছে।"

॥ ২ ॥

এই বৃহত্তর পটভূমিকায় তারাশঙ্কর রায়হাটের রায় ও চক্রবর্তী এই দুই শরিক জমিদারবংশের কাহিনী বলেছেন। ইন্দ্রনাথ রায় ও রামেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁদের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি, ইন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা অমল ও উমা, রামেশ্বরের পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রকে ঘিরে উপন্যাসের নাটক গড়ে উঠেছে। রায় ও চক্রবর্তী দুই পরিবারের সংঘাত উপন্যাসের প্রথম দিকে, তার অতীত উৎস ও ইতিহাস ও বিবৃত। এই সংঘাতের মূলে কিন্তু আর্থিক-অর্থনৈতিক বা জমিগত কারণ কিছু নয়—কুলীন শ্রোত্রিয় দ্বন্দ্ব। পরে রামেশ্বর-রাধারাণীর বিবাহে এ দ্বন্দ্ব বুঝি মেটে—তার আগে "পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তট-গ্রাসিনী তটিনী; সে তট ভাঙ্গিয়া কালীনদীর মত সম্পত্তি গ্রাস করিতে শুরু করিল। মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হইল।" ইন্দ্রনাথের ভগিনীর সঙ্গে সোমেশ্বরের পুত্র রামেশ্বরের বিবাহে দুই পরিবারে জোড় লাগে কিন্তু এই বিবাহের পরিণতি ভাল হয় না। রাধারাণী ও তার শিশুপুত্রের মৃত্যু হয় রহস্যজনকভাবেই—আবার বিবাদ মাথা চাড়া দেয়। রসিক কাব্যবিলাসী রামেশ্বরও "হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ-ব্রাহ্মণ, অন্যদিক দিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয়-অনুরাগী।" উপন্যাসের শুরুতে দুই পরিবারের দ্বন্দ্বই প্রকট, যদিও রামেশ্বর অন্ধকার ঘরে প্রায় উন্মাদ অবস্থায় যেন বন্দী, জ্যেষ্ঠ মহীন্দ্র পড়ালেখা ছেড়ে সবে জমিদারীর দায়িত্ব নিয়েছে, অহীন্দ্র লেখাপড়া করছে এবং মা সুনীতির আদলে জমিদারী তন্ত্রের বাইরের লোক। সুনীতি জমিদার কন্যা নন।

উপন্যাসের মূল থিম যেহেতু জমিদারী সংঘাত নয়, সেহেতু দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের প্রায় মধ্যপর্ব থেকেই অবসিত। অবসানের প্রাথমিক কারণও লক্ষণীয়: যে ননী পালকে, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরিবারকে জব্দ করার জন্য চরের জমির বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন, সেই ননী পাল মহীন্দ্রর সামনে তার মৃত বিমাতা রাধারাণীর কুৎসা উচ্চারণ করলে, মহীন্দ্র তাকে গুলি করে মারে ও দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাধারাণী ইন্দ্রনাথের সহোদরা: রাধারাণীকে জীবনে মহীন্দ্র দেখেনি, তথাপি মাতৃ অপমানের ক্রোধে সে ননীকে হত্যা করে। ইন্দ্র-নাথের জমিদারী আভিজাত্যে এর মূল্য অনেক—জমি নিয়ে সংঘর্ষ এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তারাশঙ্কর নিপুণভাবে এই অভিজাত আত্মমর্যাদা, দম্ভকে এঁকেছেন। এরপর উপন্যাসের অন্যতম থিম হয়, ইন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলওয়ালা বিমল মুখার্জির সঙ্গে সংঘাত—এই ঐতিহাসিক পর্যায়ের কংক্রীট বাস্তবায়ন ত্রুটি।

এরই সঙ্গে উপন্যাসের আর একটি প্রধান থিম ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়: অহীন্দ্র ও তার বিবর্তন। এই বিবর্তনেও ইতিহাস ছায়া ফেলে তাৎপর্যপূর্ণ সচেতনতায়। তারাশঙ্কর সাঁওতাল, চাষী ইত্যাদির সংগ্রাম, বিদ্রোহ দেখান না, কিন্তু তাদের অসহায়তা-আত্মসমর্পণের পটভূমিতেই জমিদারপুত্র অহীন্দ্রর উত্তরণ দেখান। ঐ দারিদ্র্য-শোষণ-অসহায়তা-আত্মসমর্পণ এই উত্তরণের তাৎপর্যকেই আরও গভীর করেছে।

তারাশঙ্কর বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অহীন্দ্রর নবচেতনায় উত্তরণের থিমটিকে আঁকেন। অহীন্দ্রর পিতামহ সোমেশ্বর সম্পর্কে তারাশঙ্কর জানান, "এই সময়ে বীরভূমের ইতিহাস-বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। সোমেশ্বর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাঁওতালদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। কপালে সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া তিনি নাকি সাঁওতাল বাহিনী পরিচালনাও করিয়াছিলেন।···সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, বলিত, রাঙা ঠাকুর।" অহীন্দ্র সোমেশ্বরের এই চেহারা পেয়েছে। বুড়ো কমল মাঝি তার শৈশবে সোমেশ্বরকে দেখেছিল, সে অহীন্দ্রকে দেখেই বলেই ওঠে, "হু ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ। হু ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।" সোমেশ্বরের কথা সাঁওতালরা কখনও ভোলেনি, তাদের প্রতি তারা মনে মনে অনুগতই থেকেছে। অহীন্দ্র চাষীদের সঙ্গে গল্প করে, তার মনোযোগ-উৎসাহ কখনোই জমিদারীতে ছিল না, কিন্তু সাঁওতালদের সংস্পর্শে এসে, সম্মুখীন হয়েই অচেতনভাবেই প্রথমে তার বিবর্তনের সূচনা ঘটে। সোমেশ্বরের সাঁওতাল বিদ্রোহে নেতৃত্বের উত্তরাধিকার এভাবে নবপর্যায়ে, নবদীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় পৌত্র অহীন্দ্রে—১৮৫৫-৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ১৯২০-৩০-এর দশকের কমিউনিস্ট হওয়ার শুদ্ধ আবেগ, এই দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র টেনে তারাশঙ্কর পরম্পরা-পরিবর্তনের ধারাটি দেখান। স্পষ্টই অহীন্দ্রকে উনিশশতকীয় মধ্যবিত্ত নাগরিক এলিট, রাজনৈতিক আইনগত ধারায় স্থাপন করেন না তিনি। কলকাতা অহীন্দ্রর নবচেতনার বিকাশের ক্ষেত্র ঠিকই, কিন্তু এর উৎস ঐ দ্বিতীয় জগতের রাজনীতি যেখানে প্রচণ্ড আদিবাসী বিদ্রোহ। জমিদারী কৃষিবিশ্বের বাইরে যেমন কলওয়ালা বিমল মুখার্জি, অহীন্দ্র তেমনি এই বিশ্বের বাইরের আর এক ঐতিহাসিক শক্তি, প্রক্রিয়া—এ প্রক্রিয়া মিল-মালিকের শোষণের প্রতিবাদী। সমগ্র জমিদার জগতের বিরুদ্ধে মিল-

মালিক, আবার এর উভয়ের বিপক্ষে অহীন্দ্র। অন্ততঃ এ উপন্যাসে মুক্তির পথ, সমাধানের পথ তারাশঙ্কর অহীন্দ্রেই খুঁজে পান, যদিও সে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তারই হয়। সোমেশ্বর মা-স্ত্রী-গৃহ ছেড়ে যখন সাঁওতাল বিদ্রোহে শালজঙ্গলে চলে গেলেন এক উলঙ্গ তলোয়ার নিয়ে, তখনকার বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখছেন, "শালজঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ড নিবিড় বনশ্রী—মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘ ছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সিন্দুরে চিত্রিত মুখ রক্ত মুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল।" আর অহীন্দ্র প্রথম যেদিন সাঁওতালদের চরে গেল সেদিন সে দেখে "দুই পাশে এক বুক উঁচু ঘনকাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গল ; তাহারই মধ্য দিয়া স্বল্পপরিসর পরিচ্ছন্ন একটি পথ সর্পিল ভঙ্গিতে চরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।...সাপের ফণার মত উদ্যত বঙ্কিম ডগাগুলি স্থানে স্থানে একেবারে পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের গায়ে ঠেকিয়া সেগুলি দোল খায়। মাঝে মাঝে চৈত্রের উতলা বাতাস আসিয়া ঘাসের জঙ্গলের একপ্রান্ত পর্যন্ত অবনত করিয়া দিয়া যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সনসন শব্দ।...ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যে দশ বারো ঘর আদিম অর্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে।" দুটি বর্ণনা পাশাপাশি পড়লে সাঁওতালদের ইতিহাসের এক পর্বান্তর লক্ষ করা যায়—সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার ব্যর্থতা তাদের ঠেলে দিয়েছে অন্য দিকে। "রক্তমুখ দানবেরা এখন আদিম অর্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ" মাত্র বাঁসা বাঁধবার জন্য ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর অহীন্দ্র এদের দেখেই মুগ্ধ হল, অভিভূত হল আদিম মানুষের প্রত্ন-প্রতিমায় এই মুগ্ধতার মধ্যেই রয়ে গেছে মূর্ত মানুষের মুক্তির সন্ধানী দ্বান্দ্বিক আকাশের দিকে তার অগ্রসরের বীজ। "পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, রাঙা ঠাকুরের (সোমেশ্বরের) বেটার বেটা আসিয়াছেন, আর তিনি নাকি ঠিক রাঙাঠাকুরের মত দেখিতে আগুনের মত গায়ের রং।" তার পাশেই সাঁওতালদের "কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তির মত দেহ, তেমনই নিটোল এবং দৃঢ় তৈলমসৃণ কষ্টিরমত উজ্জ্বল কালো।" আগুন ও কালোর এই বৈপরীত্যে, দ্বন্দ্ব-মিলনেই আসে নতুন বীক্ষা, আসে এক অচেনা গন্ধের মত, যা অনুভব করা যাচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না—"একটি অতি মধুর গন্ধ আসিয়া শ্বাসযন্ত্র ভরিয়া দিল।"

এর আগেই অবশ্য সুনীতির সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অহীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত: "অহি বলিল, ঐ তোমাদের এক ভয়। মানুষকে বিনা কারণে অপমান করা কি এতই সোজা মা? মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকায় কি করেছিলেন জান? সেখানে ইংরেজরা রাস্তায় যে ধারে যেত, রাস্তায় সে-ধারে কালা আদমীকে যেত দিত না। গেলে অপমান করত, জেল পর্যন্ত হত। মহাত্মাজী সমস্ত অপমান নির্যাতন সহ্য করে সেই রাস্তাতেই যেতে আরম্ভ করলেন। অপমানের ভয়ে বসে থাকলে কি কখনও সেই অধিকার পেত কালা আদমী?" এর সঙ্গে সাঁওতালদের কৃষ্ণবর্ণের শরীরে সৌন্দর্যে মুগ্ধ অহীন্দ্রকে দেখতে হবে। এখানে স্পষ্ট অহীন্দ্রব রাজনৈতিক দীক্ষার প্রাথমিক উন্মেষ গান্ধীর হাত ধরেই। ১৬ পৃষ্ঠার গান্ধীর উল্লেখের পরই ৩১ পৃষ্ঠায় দেখি, সুনীতি বলিলেন, "ওই ওর একনেশা। যত চাষী ভূষির সঙ্গে বসে গল্প করবে। বাপেরা নিন্দে করে, মহী তো আমার ওপরেই তাল ঝাড়বে।" মহীন্দ্রের দ্বীপান্তর হওয়ায় পর অহীন্দ্রকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জমিদারীর কর্ম ও পদ্ধতিব সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। শাস্তির আদেশ শুনেও মহীন্দ্রর অবিচলিত ভাব দেখে বিচারক প্রশংসা করলে "সরকারী উকিল হাসিয়া বলিলেন, yes sir! এর পিতামহ সাঁওতাল-হাঙ্গামার সময় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই করে মরেছিল। সামন্তবংশের খাঁটি রক্ত ওদের শরীরে—true blood"। অহীন্দ্রর বিদ্রোহ এরই বিরুদ্ধে—সাঁওতাল বিদ্রোহের স্পর্শ তাকে নিয়ে যায় ভিন্ন মেরুতে। জমিদারী কাজের স্বল্প কিন্তু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেই তার নিজস্ব দীক্ষাটি ক্রমশঃ গান্ধীবাদী সমন্বয়ের ভূমি ত্যাগ করতে শুরু করে। কিন্তু এ পরিবর্তন আসে নিশ্চিত কিন্তু ধীর গতিতে: কারণ মাকে অবস্থাবিপাকে নিজের হাতে রাঁধতে হচ্ছে, "ইহারই মধ্যে কোথাও আছে অসহনীয় অপরিসীম লজ্জা, যাহার ভারে তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।" স্পষ্টই, জমিদারী আভিজাত্যের রেশ এখনও তার মধ্যে।

কিন্তু এ পিছুটানও কেটে যায়। জমিদার তন্ত্রের ওপর তার বিরাগ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমনকি রংলাল-নবীনদের লোভ, তাকে প্রলোভন দেখানোর প্রচেষ্টা, অহীন্দ্রকে সমগ্র ব্যবস্থার ওপরই বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। তার চোখে ধরা পড়ল, এই চেতনাহীন কৃষকদের ভূমিকাহীনতা। "রংলাল ও নবীনদের দল একে একে প্রণাম সারিয়া চলিয়া গেল অহীন্দ্র একাই নির্জন স্তব্ধ কাছারি-বাড়ির দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া

রহিল।…ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্ন বিধবার মত। এত বড় বাড়িটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশে দুই দিকে দুইটা সুদীর্ঘ-শীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সন সন শব্দ করিতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন এই অনাথা বাড়িটাই বুকফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে।" অন্ধকার শোকাচ্ছন্ন বিধবার চিত্রকল্পে শুধু চক্রবর্তী বাড়ী নয়, গোটা জমিদার তন্ত্রের চিত্রই প্রতিফলিত। তবে এখানেও জমিদারী দীর্ঘশ্বাস: "মাথা হেঁট করিয়া প্রজারা সভয়ে অপেক্ষা করিয়া থাকিত এ বাড়ির মালিকের একটি মুখের কথার জন্য। আর একজন চাষীপ্রজা বলিয়া গেল, সম্মতি দেওয়া হউক বা না হউক, জোর করিয়া তাহারা জমি দখল করিবেই।" মজুমদারের অন্দরে আসা বা সুনীতির সাক্ষী দিতে আদালতে যাওয়াতেও এ ভাবেই মর্যাদার হানি ঘটে। অহীন্দ্রর এই দীর্ঘশ্বাস পরিবর্তিত হতে লাগল। চরের আকাশ-মুখী চিমনি, শব্দের ধাতব ঝঙ্কার, লরির এঞ্জিনের গর্জন, মানুষের কোলাহল-কলরবের গুঞ্জন রোল অহীন্দ্রকে আকর্ষণ করে। "অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়াইয়া এই অর্ধনির্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।" কিন্তু এই লোভী, শোষণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিজ্ঞানে তার মুক্তি নেই। "দুই পাশে সাঁওতাল-দের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি সমস্তই অকর্ষিত, কোথাও ফসল নাই; সমস্ত ক্ষেত্রভূমিটাই একটা ধূসর উদাসীনতায় সদ্য বিধবার মত বিষন্ন, রিক্ত।" বিধবার উপমাটি আবার ফিরে এল। আর এখানেই অহীন্দ্র প্রথম দুর্দান্ত ক্রোধের শারীরিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করল। যে সারীর মধ্যে সে উচ্ছল জীবনের শুদ্ধ গতিকে দেখেছিল, তার চরিত্রহীনতার কথা শুনে ও সারীর সঙ্গে দেখা হয়ে ক্রোধে তার "মাথা হইতে পা পর্যন্ত স্নায়ুগুলি গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান হইয়া টঙ্কার দিয়া উঠিল।" কলওয়ালার অত্যাচারের কথা সে ভাবছিল—সারীর স্বামী একদা অজগর মেরেছিল—আর কলওয়ালা অজগর আজ অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায়, পেষণে পেষণে রক্তহীন হত্যা করেছে সাঁওতালদের। সারীর আর্তনাদ, "আমাকে ঘরের ভিতর এই এতবড় ছুরি দেখালেক বাবু, কাঁড়ার চাবুক ক'রে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো" শুধু সারীর আর্তনাদ নয়, সব ভূমিজীবী-আদিবাসীর আর্তনাদ তাদের রাঙাবাবুর কাছে। এই অভূতপূর্ব ক্রোধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই অহীন্দ্র আর একধাপ

এগোয়। সাঁওতালদের মধ্যেই সে দেখল যুগ-যুগান্তরের চাষীকে—"ওদের বাঁচাতেই হবে অমল, Gold peasantry-কে রক্ষা করতেই হবে।...নো, নো, অমল, নট অ্যাজ এ প্রিন্স অর এ লর্ড, জমিদার বা ধনী হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখ দূর করতে হবে। জমিদার আর কলওয়ালার তফাৎ কোথায়?" ২০৯ পৃষ্ঠার এই সিদ্ধান্ত অহীন্দ্রকে নিয়ে গেল আর এক বৃত্তে—অন্য জীবনবীক্ষায়। ২২১ পৃষ্ঠায় দেখি অহীন্দ্র মার্কস পড়ছে, মাকে বলছে, "পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্মান, তাঁর নাম কাল মার্কস। আমরা যাদের বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোট-বড ভেদাভেদ, কোটিকোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্য সম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্রপশুর মত মানুষের কাডাকাড়ি, তার কারণ-নির্ধারণ-করেছেন এবং নিবারণের উপায়-পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন।" অহীন্দ্রর এই উত্তরণের সঙ্গেই তার জীবনের অন্য নাট্য সংলগ্ন: ইন্দ্রনাথের কন্যা উমার সঙ্গে তার বিবাহের মধ্য দিয়েই রায়-চক্রবর্তী পরিবারের বন্ধন নতুন করে হয়েছে। সোমেশ্বর গ্রামের সিদ্ধপীঠ সর্বরক্ষার আশ্রমে স্ত্রী শৈবলিনীকে রেখে সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগদেন, তাঁর পৌত্র অহীন্দ্র সাম্যবাদী বিপ্লবের আহ্বানে সাড়া দেয়—নববিবাহিত জীবনের, বধূর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য। সে বলে, "ভয় নেই, এ-যুগে গৌতমেরা সংসার ত্যাগ ক'রে নির্বাণের জন্যে বলে যান না। এ যুগের নির্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থার মধ্যে। ঘরে বসেই সে তপস্যা চলে।" তারাশঙ্কর অহীন্দ্র-উমার সম্পর্কটি এঁকেছেন যেমন মধুর-মসৃণতায়, আবার অহীন্দ্রর উত্তরণের সূত্রে দ্বন্দ্বময় করেও। নিজের উত্তরণের যন্ত্রণায় অহীন্দ্র উমার প্রতি মনোযোগ দেয় না, কিন্তু প্রথম যে ঘনিষ্ঠতার চিত্র আঁকেন তারাশঙ্কর তাতে অমলের উৎসাহে উমার "সাঁওতালদের মত সিঁথি বিলুপ্ত করিয়া চুল বাঁধা, খোঁপায় গাঁদাফুলের মালা, পরনে মোটা সুতার সাঁওতালী শাড়ি; এক নজরে উমাকে চিনিবার পর্যন্ত উপায় নাই।...উমা তাহার বুকের মধ্যেই সবেগে মাথা নাড়িল। অহীন্দ্র দুই হাতে তাহার মুখখানি আবার তুলিয়া ধরিল। উমা চোখ বন্ধ করিল, অকস্মাৎ অহীন্দ্র চুমায় চুমায় তাহার মুখখানি ভরিয়া দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।" উমার এই সাঁওতাল রমণীতে পরিবর্তন ও অহীন্দ্রর নিবিড় উচ্ছ্বাস প্রেমের মধ্যে অহীন্দ্রর উত্তরণই ধরা পড়ে—শ্রেণী উত্তরণের প্রয়াসটি চমৎকার ভাবে আসে। এরপরই অহীন্দ্র ও উমা, "উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, কালো কালো ছায়ার মত সারিবদ্ধ

কাহারা সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে উমা ও অহীন্দ্র ঘুমায় নাই। অহীন্দ্র উমাকে বলিয়াছে তাহার অন্তরের সকল চিন্তা সকল বেদনার কথা। উমা নিতান্ত অজ্ঞ পল্লীকন্যা নয়, সে শহরে বড় হইয়াছে, স্কুলে পড়িয়াছে। অহীন্দ্রর কথার প্রতিটি শব্দ না বুঝিলেও, আভাসে সে বুঝিয়াছে অনেক। তাহার তরুণ চিত্ত অহীন্দ্রের গৌরবে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।" সাঁওতালদের চর ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় অহীন্দ্রের নতুন চৈতন্যকে আরো স্থিরলক্ষ্যের দিকে ঠেলে দিল, সে ঝাঁপ দিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে। অমল বাড়ীতে সংবাদ দেয় কলকাতায় তার সঙ্গে অহীন্দ্রর দেখা হয় না, সে ফেরে অন্য ধরণের ছেলেদের সঙ্গে, "অহীনের একটা ঘোর পরিবর্তন হয়ে গেছে।" পুজোর ছুটিতে অহীন্দ্র বাড়ী এলে দেখা গেল তার দেহ শীর্ণ, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, শরীরের প্রতি অত্যাচার। "তাহার শীর্ণ দেহের মধ্যে চোখ দুইটি শুধু জ্বলজ্বল করিতেছে, কৃষ্ণপক্ষের আকাশের রক্তাভ যুগল মঙ্গল গ্রহের মত।" উপমাটি তাৎপর্যময়। অহীন্দ্র অন্ধকারে বসে থাকে—"কাছারি প্রাঙ্গণের নারিকেল-বৃক্ষশীর্ষগুলি ছাদের আলিসার অল্পদূরে শূন্যলোকে জটাজুটময় অশরীরীবৃন্দের মত স্তব্ধ হইয়া—যেন সভা করিয়া বসিয়া আছে; ঝাউগাছ দুইটার শীর্ণ দীর্ঘতনুময় শীর্ষদেশ হইতে ছেদহীন কাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে।" অহীন্দ্রর মানসিকতা এই চিত্রকল্পগুলিতে বিধৃত—সভার উপমা গুরুত্বপূর্ণ। উমার চোখে পড়ে খান দুই ইস্তাহার ও একটি চিঠি অহীন্দ্র বিস্মৃতি-বশে ফেলে গিয়েছিল। "মৃত্যু মাথায় করিয়া আমাদের এ অভিযান।" রাইফেলের ব্যারেল, ফাঁসির মঞ্চ অপেক্ষা করছে জেনেও ভোলা যায় না, "মানুষের আত্মঅজ্ঞাত স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত বিধানের ফলে অসংখ্য কোটি মানুষের অপমৃত্যু যুগ যুগ ধরিয়া ঘটিয়া আসিতেছে।" অহীন্দ্র শেষ ক'টি লাইনের পাশে দাগ দিয়ে লিখেছে, "আচ্ছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালেরা চর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি চোখে দেখিয়াছি।" বিহ্বল উমাকে অহীন্দ্র বলেছিল লেনিনের সহধর্মিণীর কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা। এক মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে অহীন্দ্র শেষবারের মত দেখা করতে এল—রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতান্ত্রিক যুবক অহীন্দ্র ইউ. পি থেকে আত্মগোপন করে চলে এসেছে, তাদের বিপ্লবের পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার ধরে ফেলেছে। তার চোখের সামনে সাঁওতাল কমল মাঝি, সারী, জমিদার, কলওয়ালা, ননী পাল, নবীন, শ্রীবাস-মজুমদার সব ভেসে উঠল—জমিদারের অলস ক্ষুধা, কলওয়ালার শোষণ, শ্রীবাস

মজুমদারের ষড়যন্ত্র, তার পাশে "রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি"—সাঁওতালদের স্থানান্তরে যাত্রা। অহীন্দ্র শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হল। উমা স্থির, তার আশা "একদিন তো তিনি ফিরে আসবেন।" এই স্বপ্নপ্রদীপ, শুদ্ধ তরুণ অহীন্দ্রকেই কি আবার দেখা গেল ১৯৬৭-৭১-এর বসন্ত নির্ঘোষে ?

॥ ৩ ॥

মহীন্দ্র ননীপালকে হত্যা করে দ্বীপান্তরে যায়—জমিদারতন্ত্রে এ ঘটনা অস্বাভাবিক বা অভূতপূর্ব নয়। কিন্তু অহীন্দ্র যে কারণে গ্রেপ্তার হন, তার যে জীবনবীক্ষা সেটি জমিদারী জগতে অভূতপূর্ব শুধু নয়,এ জগতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এতে হেমাঙ্গিনী আছড়ে পড়ে, ইন্দ্রনাথ অস্থির পায়চারি করে, সুনীতি মাটির প্রতিমার মত পড়ে, রামেশ্বর পাথরের মত। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন অহীন্দ্রের এই উত্তরণ ও গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়েই জমিদারতন্ত্রের, তার বংশানুক্রমিক অপরাধের অবসান যেন ঘটে। রামেশ্বর স্বীকার করেন, তিনিই রাধারাণীকে, তার সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করেন। জমিদারী জগতের ক্লেদ প্রকাশ পায় এভাবে। রামেশ্বর যখন রাধারাণীকে হত্যা করেন, তখন রাধারাণী অভিশাপ দিয়েছিল রামেশ্বর অন্ধ হবেন, তাঁর হাতে কুষ্ঠ হবে। বস্তুত. অভিশাপই রামেশ্বরকে তাড়িত করেছে: অন্ধকার ঘরে আলো থেকে দূরে থেকেছেন, হাতে কুষ্ঠ হয়েছে এই ভ্রম বিশ্বাসে বদ্ধ থেকেছেন। অহীন্দ্রর পরিণতির পরই এসব থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। "কিছুক্ষণ পরেই বাহিরে পাখীরা কলরব করিয়া প্রত্যুষ ঘোষণা করিয়া দিল। রামেশ্বর চকিত হইয়া বলিলেন ভোর হয়ে গেল, বলিতে বলিতে বিছানা হইতে নামিয়া তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন। আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সম্মুখে আকাশে মুক্তির বার্তা বহন করিয়া উদয়াচল হইতে মৃত্তিকার বুকে লক্ষ লক্ষ যোজনা অতিক্রম করিয়া ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে চারিদিক পরিস্কার হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত দেখা যাইতেছে—জীর্ণ রায়হাট, শীতের শীর্ণা কালিন্দী, ও-পারের চর, আকাশে উদ্ধত চিমনী, কলের সারি সারি অট্টালিকা, প্রশস্ত সুগঠিত রাজপথ, লোকজনে ঐশ্বর্যময়ীচর।" অহীন্দ্রর সাম্যবাদে দীক্ষায়, শ্রেণী সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক বিশ্ব-বীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ায় যুগযুগান্তরের অন্যায়ের মেঘ কাটে।

মন্বন্তর

স্বস্তি মণ্ডল

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থদশক এ দেশবাসীর জীবনে সবচেয়ে ব্যস্ততা ও বিক্ষোভের কাল রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাপক অস্থির পরিমণ্ডলটি সম্পর্কে এ সময়ের লেখকমাত্রেই বিচলিত বোধ করেছিলেন। সমকালীন দেশ-কাল-সমাজ অর্থনীতির এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপকে প্রায় প্রত্যেক লেখকই সাহিত্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দ্র ও কৃষাণচন্দ্র প্রায় প্রত্যেকের রচনাতেই এই আলোড়িত দশকটির বাস্তব আলেখ্য ধরবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই শ্রেণীতে রাখলে অন্যায় হবে না। কারণ তিনি তার সময়ের লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কালসচেতন ছিলেন। গ্রামীনজীবন ও তার রূপান্তর, প্রাচীন জীবনধারার পরিণতি, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্কট-সংশয় মুহূর্তকে তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে নানাভাবে ধরে রেখেছেন। এই কারণেই তাঁকে শুধু আঞ্চলিক অভিধায় চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিক রাঢ় পরিবেশের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি শুধু আঞ্চলিক জীবনধারার কথক নন। মূলত তারাশঙ্কর সমাজ বাস্তব সচেতন লেখক। অঞ্চলকেন্দ্রিক জীবনধারাও সময়ের পরিবর্তনে যে রূপান্তরের সম্মুখীন হচ্ছে তাকেই তিনি সচেতনভাবে ধরতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর সমাজবাস্তব-সচেতনতা ইতিহাসমনস্কতায় ঋদ্ধ করেছে তাঁর সাহিত্যকে। অবশ্য এই ইতিহাস-বোধ শুধু সমকালীন সময়ধারা সম্পর্কে তথ্যনির্ভর পরিসংখ্যান সৃষ্টিতে ভারবহ নয়। অন্বেষণধর্মী জিজ্ঞাসুর কৌতূহলে তা সজীব। চলিষ্ণু সামাজিক জীবন-ধারার অনিবার্য পরিণতির কারণ সন্ধানে তারাশঙ্কর প্রথম থেকেই অনুসন্ধিৎসু। তাই তাঁর পরিচিত অঞ্চল পরিবেশ ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় জীবনধারা কালোস্রোতে কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরছে, নতুন জীবনধারা বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে দিয়ে প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করছে, অর্থনৈতিক নির্ভরতার ভিত্তি নড়ে যাচ্ছে তা তিনি স্পষ্টভাবেই দেখাতে

চেয়েছেন। তিনি যথার্থভাবেই অভ্যস্ত পরিচিত প্রাচীন জীবনধারার ভাঙন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙনের স্বরূপকে চিনতে পেরেছিলেন। নতুন জীবনচেতনাকে তিনি সানন্দে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত হলেও প্রাচীনের অনিবার্য পতনকে অস্বীকার করেন নি। আমাদের সামাজিক অবস্থিতির এই কেন্দ্রীভূত দ্বন্দ্বটিকেই তিনি লেখকজীবনের শুরু থেকেই নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। ১৯২১-এর অসহযোগ থেকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর এবং তারও পরের বেশকিছু কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত পরিবর্তিত সমাজ রাজনীতিনির্ভর জীবনই ছিল তাঁর শিল্পচর্চার বিষয় ও আশ্রয়।

'মন্বন্তর' উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪২-৪৩এর যুদ্ধশঙ্কিত নগরজীবন। কলকাতার নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাসও এটি।[১] যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষপীড়িত জনজীবনের বেদনার করুণ ইতিবৃত্ত এ উপন্যাসের বাস্তব পরিবেশ রচনা করেছে। তিনি 'মন্বন্তর' কথাটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। অর্থনৈতিক সামাজিক মানবিক ও নৈতিক অবনতিকেই মন্বন্তর বলতে চেয়েছেন। সমূহবিনাশের কারণ হিসেবে যুদ্ধকেই দায়ী করেছেন। যুদ্ধ তাঁর কাছে মহামন্বন্তর। অন্যত্রও একথার প্রতিধ্বনি শোনা যাবে—'১৯৪২ সালে—কাল থেকে কালান্তরে পদক্ষেপের লগ্নে তাণ্ডবছন্দে শূন্যলোকে ললিত-বঙ্কিম ভঙ্গিমায় শূন্যে উত্তোলিত-দক্ষিণপাদ মহাকাল নিমীলিত রক্তিম বামচক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছেন সম্মুখের দিকে, দক্ষিণপদ শূন্যলোকে উত্তোলিত—বামপদ-খানি বর্তমানকালে স্থিত—কিন্তু আনন্দসুধা প্রমত্ততায় অস্থির। টলছে—নিজে যেন দুলছেন ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাতে পৃথিবী কাঁপছে; শূন্যলোকে তাণ্ডবের ছন্দ জেগেছে, সেই ছন্দে এসেছে আশ্বিনের সাইক্লোন; পিছনে পিছনে এসেছে মহামারী। প্রতিধ্বনির মত মানুষ বাজিয়েছে রণবাদ্য। জীবন হয়েছে তুবড়ির আগুনের ফোয়ারার মুখের ফুলকির মত। মুহূর্তের জন্য ঝকমকিয়ে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। বড় বড় জমিদার—ভূসম্পত্তিবানদের বাড়ি ফাটছে যার ফাটে নি তার বাড়িতে নোনা ধরেছে, শ্যাওলা পড়েছে। ব্যবসায়ীরা ফাঁপছে। আবার দু চারজন রাতারাতি ফকির হচ্ছে। মধ্যবিত্তরা সব হারাচ্ছে। গরীবেরা পথে পড়ে মরছে।' অর্থাৎ শুধু বিপন্নতা নয়; সমাজের অনিবার্য রূপরেখা তারাশঙ্করকে বিচলিত করেছে। বলবার ভঙ্গি নাটকীয় ও অধ্যাত্মবাদী হলেও বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। এই পর্বে ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের চিন্তাধারা, সাম্যবাদী রাজনীতি ও সেই

ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা তরুণ তরুণীদের কর্মোদ্দীপনা তারাশঙ্করকে অভিভূত করেছিল – তার প্রকাশও 'মন্বন্তর' উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্য হয়ে আছে।[২] কিন্তু এই উপন্যাসে আরও একটা দিক বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে-সে হলো তারাশঙ্করের সমাজবোধ। অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও যুগ পরিবর্তন, পতনের চেহারাটা ধরবার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ সন্ধানে এখানেও তিনি সমান সচেষ্ট। এ উপন্যাসের শিল্পগত ত্রুটি, তারাশঙ্করের দলীয় মতবাদও মতবাদ থেকে সরে আসা নিয়ে অজস্র বিতর্কের কথা মনে রেখেও তাঁর বাস্তবসমাজ সচেতনতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা কালে উপন্যাসটিকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। রিয়ালিটির অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখে মনে হয় এই পর্বে তাঁর কাছে সাহিত্য-শিল্পনীতির চেয়ে বাস্তবের বিপন্নতা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয়জীবনে মূল্যবোধের বিনাশ, সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার পতন ও নতুন অর্থনৈতিক বাস্তব ও ধনিকতন্ত্রের জন্মলগ্নকে তারাশঙ্কর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

উনিশশতকে ইংরেজের ছত্রছায়াতলে গড়ে ওঠা শহুরে বিত্তবান সম্প্রদায় বিংশ শতকেরসমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সামগ্রিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তারই পরিচয় দিয়েছেন 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সুখময় চক্রবর্তী পরিবারের ও প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপ রচনা করে। উপন্যাসে এই পরিবারটি কালের পরিণামী প্রতীকরূপ পেয়েছে। 'পচনশীল বিলাসীর গৃহের পতনকে বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। অবশ্য অন্যান্য উপন্যাসেও তারাশঙ্কর এমন অনেক বিলীয়মান গোষ্ঠীর পরিণতি দেখিয়েছেন। তারা প্রায় সকলেই গ্রামের স্বত্বভোগী জমিদারশ্রেণী। 'মন্বন্তরের' চক্রবর্তী পরিবার ইংরেজের পৃষ্ঠপোষক গ্রামীনভূস্বামী সামন্তপ্রভু না হলেও তাদেরই সগোত্রীয়। চক্রবর্তী পরিবারের পূর্বপুরুষ গত শতাব্দীর মানুষ। সুখময় চক্রবর্তী কলকাতার নতুন ধনী অভিজাত মানুষ। তাঁর ধনের অধিকাংশই এসেছে নিজের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিবৃত্তির ফলে। তারাশঙ্কর বলেন নি, সুখময় চক্রবর্তী কিভাবে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। তবে আমরা অনুমান করতে পারি সে সময় অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই ইংরেজের বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি ছিলেন। অর্থের অধিকাংশই উপার্জিত হয়েছিল তাদের তুষ্ট করে। পঞ্চাশ বিঘে জমির ওপর ভাড়াটে প্রজার রাজত্ব গড়ে সুখময় চক্রবর্তী সম্পদের একটা স্থিতি আনতে পেরেছিলেন। এছাড়াও কলকাতার নিষিদ্ধ স্থানে গোটা পনেরো ভাড়াটে বাড়ী থেকেও তাঁর আয় সুনিশ্চিত হয়েছিল। ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা,

মহলাযুক্ত বিশাল বাড়ী সবই তাঁর একার চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ধন সঞ্চয়ে ন্যায়নীতি প্রাধান্য পায় নি। সং অসৎ উপায়ে টাকা করাই তাঁর লক্ষ্য হলেও দানধ্যানের গৌরবও তাঁর ছিল। তিনি কর্মীপুরুষ ছিলেন ; আবার সভা-সমিতি সংস্কৃতির চর্চা করে যশস্বীও হয়েছিলেন। সঞ্চয় শেষে 'তিনিই একদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নবনির্মিত বৈঠকখানায় আমিরী চালে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন--ব্যাস করো' ।[৩] তিনিই শুরু করেছিলেন বিলাস, আড়ম্বর, সঙ্গীত আর মজলিস। হয়ে উঠেছিলেন সমাজের প্রধান ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠ-পোষক। শহরের বনেদি কালচারের শ্রীবৃদ্ধিতে উদার হস্ত ছিলেন। এমনি ভাবেই তিনি হয়েছিলেন বিশিষ্ট জন—'তাঁর জুড়ী যখন রাস্তায় বের হত তখন রাস্তার দুধারে লোক চেয়ে দেখত।' সময়ের বিবর্তনে সুখময় চক্রবর্তীর কাল শেষ হয়েছে। পরবর্তী বংশধরেরা শুধুই ভোগমত্ত হয়ে উঠলো। ফলে আয়ের ঘর বন্ধ হলো, ব্যয় বাহুল্য ক্রমেই প্রকট হলো। এক পুরুষের অর্জিত পরি-শ্রমের সম্পদ অধস্তন পুরুষের বিলাসে আলস্যে নিঃশেষিত হলো। ঐশ্বর্যের মিথ্যা আস্ফালন, দম্ভ, বিলাসিতার ফলে চরিত্রে সঞ্চিত হলো নানাধরনেব ত্রুটি। রুচি বিকৃতি, ব্যভিচার বংশধরদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটালো। পৌরুষের মিথ্যা দাম্ভিক প্রকাশে অন্তঃপুরও হলো লাঞ্ছিত। নিজেদের সন্তান সন্ততিকে অবহেলা, স্ত্রীকে পীড়ন করে পৌরুষের অস্তিত্ব রক্ষার মিথ্যা প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকার ফলে পরিবারটি ক্রমেই কালের গতিস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো—'একশ বছর আগে চক্রবর্তীরা জীবনদ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে কুস্তির আখড়াতে পালোয়ানের মত গায়ের ধুলো কাদা ধুয়ে কানে আতর মাখানো তুলো গুঁজে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে, সেই জীবন দ্বন্দ্ব শেষ করে ঘরে কপাট বন্ধ করে শুয়েছে—আর বাইরে বের হয় নি। বাইরের হাওয়া ঘরে ঢোকে নি। ওরাও সে হাওয়া গায়ে লাগায় নি। ফলে আজও তারা সেই মধ্যযুগের মানুষ'। সম্পদভোগ, লালসা পরিবারের নৈতিকবোধকেও নষ্ট করেছে তা তারাশঙ্কর মেজকর্তা চরিত্রে নিপুণ অথচ নির্মমভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—'মেজবাবুর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি —এককালে রূপবান পুরুষ ছিলেন। এখন তাঁর মুখের একদিকে প্যারালিসিস —দাঁত অনেকদিন পড়ে গেছে। দেহটা বসে যাওয়া বাড়ির মত বিকৃত হয়ে গেছে। সে আমলে থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন—বক্তৃতার ঢঙে কথা বলেন ; হাতে এক বোঝা মাদুলী, নীলা, পলা, গোমেধ, লোহা, তামা। অহরহ দেবতাকে ডাকেন, কোন অপরাধ করলাম দেবাদিদেব, এখন নিত্য নিয়মিত একখানা

পুরনো রেশমের নামাবলী গায়ে দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন ; সপ্তাহে একদিন করে পুরোহিতের মুখে শোনেন আপদুদ্ধার মন্ত্র। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়ে অথবা দুরন্ত গরমে বাতাস না পেয়ে ষাট বছর বয়স্কা স্ত্রীকে কোনদিন পাখার বাড়ি মারেন ; কোনদিন ঘরেই দরজা খুলে বাইরে বের করে দেন।' শুধু মেজকর্তাই নয়, পরবর্তী তৃতীয় চতুর্থ পুরুষের বংশধরেরাও লেখকের নিরাসক্ত অথচ নির্মম পর্যবেক্ষণে যথাযথ সত্য উদ্ঘাটিত করেছে—'বংশের প্রৌঢ়ত্ব তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণ হয়ে চতুর্থ পুরুষের বার্ধক্যের জীর্ণতা ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তৃতীয় পুরুষের সাত ভাই ও চার বোনের মধ্যে পাঁচজন পাগল ; বাকী কয়েকজনের জীবনের গতি পাওনাদারের ভয়ে খিড়কির পথে, আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের মত'।

ধনী পরিবারের মেয়েরাও ক্রমেই অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। পুরুষের রুচি-বিকৃতি, অবহেলা অহেতুক শাসন নির্যাতন ও ভোগস্পৃহার ফলে চক্রবর্তী পরিবারের মেয়েরাও বিকৃতভাবে রুচি চরিতার্থ করেছে। অবহেলা ঢাকতে প্রথমদিকে মেয়েরা সাজসজ্জায় মেতেছে। নতুন গয়না ভেঙে আবার গড়িয়ে জ্ঞাতিরমণীকে দেখিয়ে অকারণে ঈর্ষান্বিত করে আমোদ উপভোগের খেলায় তারা ছিল মত্ত। থিয়েটার, বায়োস্কোপ, তাস, পাশা আর নিন্দা সমালোচনা—এই ছিল মেয়ে মহলের পরিচিত চিত্র। বাকি সময়টা কাটত চাপা দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে হজম করে স্বামীদের প্রতীক্ষায়। অনুযোগ অভিযোগ কোনো মর্যাদা পেত না। উল্টে জুটতো প্রহার, লাঞ্ছনা। ক্রমেই এগুলো হয়ে গিয়েছিল গা সওয়া। তার বদলে একধরনের সংস্কারাচ্ছন্ন পাতিব্রত্যকে তারা লালন করেছে। মেজগিন্নীর স্বামীসেবা, কানাই-এর মার মদ্যপ স্বামীর মদের রসদ জোগান দেওয়ার চিত্র তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। নারীর স্বাভাবিক শালীনতাও পরিবার থেকে লুপ্ত হতে বসেছে তা ছোটখুড়ীর লাস্যময়ী রঙ্গ রসিকতার রূপ এঁকে তারাশঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পরিবারের অধিকাংশ শিশুসন্তানই অপুষ্টিতে ক্ষীণায়ু। যারা বেঁচে আছে তাদের বেশির ভাগেরই দেহের বয়স বাড়লেও মনের বয়স বাড়ে নি। পরিবারের কদর্য রুচি চরিতার্থ করতে গিয়ে কেউ কেউ চুরি করে, ভিক্ষে করে, উচ্চকণ্ঠে অশ্লীল গানে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। ছেলেরা এককালের সযত্নে লালিত পোষা পায়রাগুলোকে রাতের অন্ধকারে ধরে মাংস রেঁধে খেয়ে বিকৃত আমোদ উপভোগ করে।

উপন্যাসের একতৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এই বিরাট পরিবারের অবক্ষয়ের চিত্র নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের মতো লেখক বিলাসী পরিবারের নৈতিক-মানসিক-আর্থিক পতনের স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। জমিদারী জীবনের সঙ্গে তারাশঙ্করের এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। নিজেও ছিলেন ছোট তরফের জমিদার। ফলে জমিদার পরিবারের ভাঙনের রূপরেখা আঁকতে গিয়ে মমত্ববোধ, অতীতের প্রতি সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়েছেন বারবার। কিন্তু এই দ্বিতীয় বাসভূমি নগরজীবন সম্পর্কে তিনি মোহমুক্ত প্রথম থেকেই। তাই নগরজীবনের পুরনো সমাজব্যবস্থার পতনের কারণ সন্ধানে তিনি নির্মম আবেগবর্জিত। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও ইন্দ্রিয়াসক্তির ফলেই বিশাল পরিবারগুলি হৃতগৌরব হয়ে ধ্বংস হবে। চক্রবর্তী পরিবারের জীর্ণ ব্যধিগ্রস্ত বিকৃত মানুষগুলির মতোই বিশাল মহলযুক্ত বাড়ীটা জীর্ণ। আগাছার শিকড় ফাটল দিয়ে অনেকদূর প্রসারিত হয়েছে। ঘরে ঘরে পরিবারের শরিকেরা ঈর্ষা-কলহে লিপ্ত। তারা পৈত্রিক বিষয় অর্থাভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যে বিশাল বস্তি ছিল সুখময় চক্রবর্তীর ঐশ্বর্যের উৎস তা আজ বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে। পাওনাদারদের ঘোরাফেরায় পরিবারের পুরুষেরা শঙ্কিত। বিষয় সম্পত্তির সবই দেনার দায়ে গেছে, যা আছে তার অধিকাংশই চলে যাচ্ছে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর হাতে। এ শুধু চক্রবর্তী পরিবারের নয়, গত শতকের গড়ে ওঠা ধনী নাগরিক পরিবারদের অধিকাংশেরই আজ এই অবস্থা। একটা চরম আর্থিক সঙ্কট পরিবারগুলিকে চরমসীমায় পৌঁছে দিয়েছে—'কয়েক পুরুষের মধ্যে বাড়িটা বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে। কয়েকজনের ভাগে আজ মাড়োয়ারী এসে বাসা বেঁধেছে। যারা আছে—তাদের অবস্থা ওই চক্রবর্তীদের বংশের মত। পৃথিবীর প্রকাণ্ড বাড়িগুলোর মধ্যে ওই একই নাটকের অভিনয় হচ্ছে'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, শঙ্কিত পরিবেশ, খাদ্য-বস্ত্র-সঙ্কট এই পরিবারকে পরিণতির চরম প্রান্তে নিয়ে এসেছে। নানা ধরনের ছল-চাতুরী কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিয়ে পরিবারটি নিস্তরঙ্গ-ভাবে এতকাল টিকে থাকলেও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হলো না। লেখক উপন্যাসের নায়ক কানাইয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিণতির ভয়ঙ্কর ইতিহাস বিবৃত করেছেন।

কানাই সুখময় চক্রবর্তীর বংশধর। সীমাহীন ভোগের ফলে কানাইয়ের পিতার পরিবারটিও অন্যান্য চক্রবর্তী বংশধরদের মতোই অর্থকৌলীন্য হারিয়ে

দরিদ্র হয়ে পড়েছে। বিশাল প্রাসাদ তার জীর্ণতা নিয়ে মহাকালের ধ্বংসের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এই পরিবারের ব্যতিক্রম চরিত্র কানাই। এই পরিবেশের বিষাক্ত বাতাসে এ যুগের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা ও আদর্শে গঠিত কানাইয়ের অন্তর হাঁপিয়ে ওঠে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারিবারিক জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে সে ব্যর্থ হয়। কারণ – 'সুখময়চক্রবর্তীর বংশের ভাঙা বাড়ির ইঁটগুলো – ওই নোনা ধরা ইঁটগুলো পর্যন্ত ক্ষুধিত—শুধু ক্ষুধা নয়, তার অন্তরালে আছে যে ঘৃণ্য লোলুপতা – তাতেই তার স্থিরতার দৃঢ়তার ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে গেছে। ওই নোনা ধরা ইটগুলো ঢাকতে পলেস্তরা যতই খরচ সে করুক না কেন, তা আবার খসে পড়বে; তার নোনা ধরা স্বরূপ বেড়িয়ে পড়বে'। শেষে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে কানাই বেরিয়ে আসে পথে, বৃহৎজীবনের সন্ধানে। বিকৃত জীবন থেকে কানাইয়ের মুক্তি যেন পুরোনো বিকৃত জীবনের অভিশাপমুক্তির ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। আর ৪২-এর ২৪শে ডিসেম্বরে জাপানী বোমার আঘাতে সুখময় চক্রবর্তীর মোহভরা বাড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। ভূমিকম্পে ভগ্নশীর্ষ বিদীর্ণদেহ প্রাসাদের সঙ্গে তুলনীয় কানাইয়ের মেজদাদু মেজঠাকুমা, পরিবারের মানুষগুলির কালসমাধি হয়েছে। কালের অনিবার্য অব্যাহত গতিকে রোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং মানুষ একপুরুষের ন্যায় অন্যায়ে অর্জিত কীর্তিকে নিয়ে যায় চরম ধ্বংসের পথে। এমনিভাবেই শেষ হয়েছে 'রঘুপতির কোশল নগরী, যদুপতির মথুরাপুরী'। কানাই উপলব্ধি করেছে 'সম্পদ সঞ্চিত হলেই স্বভাব ধর্মে সে পচনশীল মিষ্টরসের মত ফেনায়িত মাদকরসে পরিণত হবেই'। এবং 'সম্পদ সঞ্চয়ের বিয়োগান্ত পরিণতি' অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবারের পতনেই সমাজ শোষণমুক্ত স্বর্গরাজ্য হয় নি। যুদ্ধ মানুষকে সুস্থ সমাজ পরিবেশ রক্ষা করতে দেবে না। কানাই তার পরিবারের চৌহোদ্দির বাইরে এসে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। যুদ্ধের বাজারে কন্ট্রাক্টের কাজের সুযোগে নতুন ধনিকতন্ত্রের ভয়ঙ্কর কুৎসিৎ চেহারাটা সে দেখতে পেয়েছে। খাদ্য মজুত ও কালোবাজারীর ফলে শহরে এক শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব সমাজদেহে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এরা কত সহজে দেশের মানুষের গ্রাসটা কেড়ে নিতে পারে; দেশের মূল্যসূচকটা নিয়ে নির্দ্বিধায় খেলা করতে পারে। অহঙ্কারীর মতো তারা সহজ বলে 'আমাদের গুদামের চাবি যদি এক সপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায় তবে আটদিনের দিন বাংলাদেশে উনোন জ্বলবে না'। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অর্থমূল্যে এরা বসুন্ধরাকে বশীভূত করার বাসনায় মেতে

ওঠে। উন্মত্তের মতো ভোগের নেশায় নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতেও উপন্যাসে অমলবাবুর মতো লোকেরা কুণ্ঠিত নয়।

কানাইয়ের পূর্বপরিচিত গীতা এদেরই লোভের শিকার হয়েছে। লেখক উপন্যাসে শুধু কানাইয়ের পরিবারের ধ্বংসচিত্রই আঁকেন নি। নাগরিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা আরো দুটি পরিবারের পরিণতিও দেখিয়েছেন—একটি গীতাদের পরিবার, অন্যটি মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী দেবপ্রসাদ সেনের পরিবার। গীতার বাবা প্রদ্যোত ভট্টাচার্য পণ্ডিতবংশের সন্তান হয়েও বহুকালের কুলপ্রথা পৌরোহিত্য ত্যাগ করে জীবিকা হিসেবে দালালী ব্যবসায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু সেখানে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। প্রভূত লোভ আর ভোগাকাঙ্ক্ষার ফলে আজ দরিদ্র। কিছুদিন চাকুরীজীবী হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই তাকে ছাঁটাই হতে হলো। যুদ্ধ এই পরিবারটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। দারিদ্র্য পারিবারিক-মানবিক সম্পর্ক, মূল্যবোধকে সম্পূর্ণভাব ধ্বংস করে ফেলেছে। যুদ্ধজনিত অভাবের দিনে প্রদ্যোৎ ও তার স্ত্রী তাদের মেয়ে গীতার শরীরের বিনিময়ে বেঁচে থাকবার পথ খুঁজে নিল। ছেলে হীরেণ নানাধরনের ন্যায় অন্যায় পথে অভাব মেটাতে শুরু করল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা নীচতা এদের নির্মম ভাবে গ্রাস করেছে। শেষ পর্যন্ত অক্ষম, বিকৃত লোভী স্বামীর পীড়ণে গীতার মা সরোজিনী বিধবার বেশে মেয়ের সর্বনাশকারীর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেল; শেষপর্যন্ত সেও ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিল।

এই দুটি পরিবারের তুলনায় নেপী ও নীলার পিতা দেবপ্রসাদের পরিবার অনেক সুস্থ স্বাভাবিক। উপন্যাসে এই পরিবারটি মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতীক হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মিক সঙ্কট, আদর্শের সংঘাত লেখক দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এরাও যুদ্ধের আগ্রাসী হিংস্রতা থেকে রেহাই পায়নি। আদর্শবাদী ব্যবহারজীবী দেবপ্রসাদ নতুন শিক্ষাধারায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু নাগরিকজীবনের আধুনিকতাকে, প্রগতিকে তিনি মনে প্রাণে স্বীকার করতে পারেন নি। নেপীর রাজনৈতিক ভাবনা ও মেয়ে নীলার আত্মসচেতনতাকে দেবপ্রসাদ সমর্থন করতে পারেন নি। উচ্চ-শিক্ষিতা নীলার স্বাধীন মেলামেশা, বিশেষত বিদেশী সৈনিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষণশীল দেবপ্রসাদের কাছে নাগরিক জীবনের অভিশাপ, যন্ত্রসভ্যতার কুফল ও উচ্ছৃঙ্খলা বলে মনে হয়েছে। অথচ যুদ্ধের বাজারে আর্থিক অনটনের হাত থেকে উদ্ধার পেতে নীলাও চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছে এবং মেয়ের উপার্জন

দেবপ্রসাদকে গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু তার স্বাধীন মেলামেশাকে তিনি কোনোভাবেই অনুমোদন করছেন না। অদ্ভুত স্ববিরোধ মধ্যবিত্ত মানুষগুলিকে যে ক্রমেই সংশয়গ্রস্ত করছে সেটাই তারাশঙ্কর দেখাতে চান। অথচ আধুনিকা নীলা পিতার আচরণে আহত হলো। তার আত্মমর্যাদা আহত হলো। সে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিল পার্টির বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয়দার কাছে। দেবপ্রসাদের পরিবার এছাড়াও আর্থিক বিপন্নতায় জর্জরিত হলো। তাঁর ওকালতীর পসার কমে গেছে যুদ্ধের বাজারে। বড়ো ছেলের চাকরী গেছে। তার ওপর বোমার আতঙ্ক ও যুদ্ধ পরিবারটিকে শেষ আঘাত হানলো। বোমার আতঙ্কে ত্রস্ত পুত্রবধূর শরীর চাপে কোলের সন্তানের মৃত্যু ঘটল। কিন্তু সংস্কারপন্থী মধ্যবিত্ত একে কর্মফল বলে বিশ্বাস করে। দেবপ্রসাদও তাই করলেন। নীলার কাজের ফল তাঁর বংশধরকে পেতে হলো এই ক্ষুব্ধতা দেবপ্রসাদকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তিনি সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার আগে অনুগত জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্দেশ দিলেন কৃষি জীবনে ফিরে বংশধরদের চাষবাস শেখাতে, আর মেয়েদের যেন আধুনিক শিক্ষা না দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে দেবপ্রসাদের জীবনে দারিদ্র্য ও যুদ্ধের আঘাত তাঁকে যত না বিচলিত করেছে তার চেয়ে তিনি বেশি বিপর্যস্ত হয়েছেন পুরোনো চিন্তা-ধারার সঙ্গে নতুনকালের জীবনধারার মিল ঘটাতে না পেরে—'তাঁর মনে হলো এ তাঁর উপর বিধাতার দণ্ড, জীবনে যে পাপ তাঁর সংসারে পুঞ্জীভূত হয়েছে নীলার কর্মে, নেপীর কর্মের ফলে,—যে পাপ তিনি করেছেন কন্যাকে পুত্রকে কুলধর্ম লঙ্ঘন করার স্বাধীনতা দিয়ে এ তারই দণ্ড'। দেবপ্রসাদ আমাদের কাছে কাল পলাতক বলে গণ্য হবেন। উপন্যাসে অন্য পরিবারগুলি কালের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু দেবপ্রসাদ কালগতিকে অস্বীকার করেছেন। এ চরিত্র তারাশঙ্করের রক্ষণশীল চেতনার প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক চরিত্র বলে মনে করলে ভুল হবে না। 'গণদেবতা'র ন্যায়রত্ন, 'আরোগ্যনিকেতনে'র জীবনমশায়ের সমগোত্রীয় দেবপ্রসাদ। কিন্তু রক্ষণশীল দেবপ্রসাদ যেমন আছেন তেমনি আছে তার পুত্র কন্যা যারা নতুন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। ন্যায়-রত্ন যেমন পারেন নি বিশ্বনাথকে ঠেকিয়ে রাখতে তেমনি দেবপ্রসাদও পারলেন না একালের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রাণিত পুত্র ও কন্যার জীবন ও কর্মধারার গতিকে প্রতিহত করতে। ফলে নিঃসঙ্গ একাকী দেবপ্রসাদ সরে গেলেন পরিবর্তমান কালপ্রবাহের পথ থেকে।

নগরপরিবেশে বেড়ে ওঠা একাধিক পরিবারকে স্থাপন করে অনেকটা

সাংবাদিকের মতো তারাশঙ্কর অর্থনীতিনির্ভর চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনকে যথাযথ করতে চেয়েছেন। শিল্পবিচারে, চরিত্র ব্যাখানে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। কারণ চরিত্রগুলিকে বিশেষ বক্তব্যের প্রতিপাদ্য সত্য করে আঁকতে চেয়েছেন বলে তারা কৃত্রিম, আড়ষ্ট বলে মনে হয়। কানাই নীলা, তাদের সমস্যা দ্বন্দ্ব শিল্প বিচারে অসম্পূর্ণ আংশিকতা দুষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু সমাজ জীবনের রূপরেখা অঙ্কনে তারাশঙ্কব নিঃসন্দেহে সৎ ও নির্ভিক।

.. ২...

এই সততা আরো পূর্ণতা পেযেছে সমকালীন বাস্তবচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে। 'মন্বন্তর'-এর বাস্তবতার স্বরূপ বুঝতে গেলে এই শতকের বিশতিরিশের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। 'মন্বন্তর' কিন্তু তেরশোপঞ্চাশ বা ৪৩-এর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষতাড়িত দিনগুলির আলেখ্য নয়। ৪২-এর অক্টোবর থেকে ৪৩-এর মার্চ মাস—এই হলো উপন্যাসের কাল পরিধি। পটভূমি সারা বাংলাদেশ নয়, শুধু কলকাতা এর পট জুড়ে আছে। নাগরিকজীবন, শহর কলকাতা, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, যুদ্ধকালীন পরিবেশ উপন্যাসে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ দ্বিগুণ ভাবে পূরণ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার যে করভাব, শোষণ ও পীড়নের পথ ধরেছিল তার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এই—এদেশেব সাধারণ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল; কৃষিনির্ভর অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়তে থাকে। গ্রাম জীবন স্বভাবতই প্রচলিত জীবনধারার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে। অনিবার্যভাবেই গ্রাম হয়ে উঠল শহবাভিমুখী। যৌথ একান্নবর্তী পরিবার সামান্য অজুহাতে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। সামন্ততান্ত্রিক প্রথানির্ভর জাতজীবিকার প্রতি আস্থা হারিযে চাকুরীজীবী হওয়ায় প্রবণতাও বাড়তে থাকে। এর ওপর উনিশশ উনত্রিশের দেশব্যাপী অর্থ নৈতিক মন্দা দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে সম্পূর্ণভাবে, বিপর্যস্ত করে ফেলল। দারিদ্র্য, হতাশা মূল্যবোধ হীনতা ক্রমেই সমাজদেহে মহীরূহ রূপ পাচ্ছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী আত্মসচেতন হয়ে উঠল। এই পর্বের রাজনৈতিক পটভূমি আগের দশকগুলির তুলনায় চঞ্চল। স্বাধীনতা আন্দোলনের চেহারা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক উন্মাদনা ব্যাপক বৃহৎ পট খুঁজছিল। দেশের মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ক্রমেই সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় উদগ্রীব হতে থাকে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে থাকে এবং মত ও পথের পার্থক্য হেতু ভিন্নপথে মুক্তির জন্য সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সে-গুলির কর্মপদ্ধতির বিচিত্র গতির মধ্যে সেই অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল দেশবাসীর। রেঙ্গুন, বর্মা থেকে যুদ্ধত্রস্ত মানুষ বাংলাদেশে ভিড় করতে শুরু করল। কলকাতা শহরের ওপর একাধিকবার জাপানী বোমা পড়ায় শহরবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে শহরতলি, গ্রামাঞ্চলেই শুধু নয়, দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে গেল। ফলে খাদ্যবণ্টনব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ইতিমধ্যে ক্রীপস্ দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় ৪২-এর আগস্টে দেশনেতা ডাক দিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের। ব্রিটিশ শাসন দমননীতির চরম ব্যবহার ঘটালো। দেশনেতাদের প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ। অন্যদিকে এই বছরই ১৬ই আশ্বিন দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে গেল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে আর ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ, মেদিনীপুর হুগলী জেলার অনেকাংশ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মাঠের ফসল বিশেষত আমনধানের ক্ষতি হলো। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের রূপ নিল। ঘূর্ণিঝড়তাড়িত এলাকার মানুষেরা ৪২-এর অক্টোবরের শেষ থেকেই কলকাতা শহরের পথে ঘাটে, এয়াররেড শেলটারে আশ্রয় নিতে শুরু করল। দুর্গত মানুষের ভিড়, খাদ্যের জন্য হাহাকার, মৃত্যুর বিভীষিকা মহানগরীর বাতাসকে ক্রমেই দুর্বিষহ করে তুলল। অথচ সরকারী তরফ থেকে কোনো ত্রাণব্যবস্থার উদ্যোগ তখনো নেওয়া হয় নি। পরিবর্তে প্রশাসন বারবার ঘোষণা করল বাংলায় খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। সরকারের বদ্ধ ধারণা দেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চাষীর ঘরে খাদ্য মজুত আছে, তাঁরা চেষ্টা করেও বার করতে পারছেন না। অথচ অন্যদিকে দেশীয় ব্যবসায়ীরা যুদ্ধ ও বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যায়ভাবে খাদ্য মজুত ও কালোবাজারীতে মেতে উঠেছে। তাদের প্রতি সরকারকে কোনো ব্যবস্থা নিতেও দেখা যায় নি। এর ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য রসদ সংগ্রহে শাসকশক্তির শোষণ ভয়াবহ আকার নিল। এইসব নানা কারণে দেশের খাদ্যনীতি, বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ল। দেশ জুড়ে দেখা দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মন্বন্তর এর আগের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসকে অতিক্রম করল। কারণ দেশের অজন্মা, অনাবৃষ্টির ফলে এই খাদ্যাভাব নয়। এর মূলে রয়েছে স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর আগ্রাসী লোভ। সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর 'কালোঘোড়া' উপন্যাসে স্বার্থ-

লোভীর মূল্যবোধহীন অর্থগৃধ্নু তার নিখুঁত চিত্র আঁকা হয়েছে। খাদ্যমজুত ও কালোবাজারীর সুযোগ নিয়ে দেশীয় ব্যবসায়ী ও শাসকশক্তি একসঙ্গে দেশের মানুষকে চরম দুর্গতির উপান্তে নিয়ে গেল, এ ছাড়াও শাসকশক্তির অক্ষমতা, অপশাসন গোটা জাতিকে চরম সর্বনাশের শেষধাপে পৌঁছে দিল।

শুধু তারাশঙ্কর নয়, সমকালীন অনেক লেখকের রচনাতেও মন্বন্তরের স্বরূপ নানাভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের দেয় আঘাতের চেহারাটা কী বীভৎস হতে পারে তা লেখক শিল্পীর অভিজ্ঞতায় যথার্থ ভাবেই ধরা পড়েছিল।৪

সাংবাদিকের মতো তারাশঙ্কর বাস্তব আলেখ্যের তথ্য সাজিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য অবক্ষয়িত সমাজের গতিপ্রকৃতি ও পরিণাম চিহ্নিত করা। উপন্যাসের চরিত্রগুলি লেখকের ভাবাদর্শের বাহক হওয়ায় কৃত্রিম দ্বন্দ্বহীন হলেও বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে কিন্তু সে আড়ষ্টতা নেই। বরং এখানে তার স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—কলকাতার আকাশে বোমারু বিমান, বাতাসে বারুদের গন্ধ মানুষ উৎকণ্ঠিত ক্রমাগত সাইরেনের শব্দে। রাস্তায় রাস্তায় 'সারবন্দী চলেছে মিলিটারী লরী, খাঁকী ইউনিফর্ম, মাথায় লাল টুপি, হাতে লাল অক্ষরে এম. পি. লেখা কালো ব্যাজ বেঁধে মিলিটারী পুলিশ।' আর চলেছে 'সবুজ হলদে রঙের চিত্র বিচিত্র করা নানা আকারে লরী তার মধ্যে বহুরকমের সরঞ্জাম, জ্বালানী কাঠ থেকে মেসিন গান।' শহরের কণ্ট্রোলের দোকানে সারবন্দী মানুষের ভিড়। খাদ্য, বস্ত্র, চিনি, কেরোসিন সবই অগ্নিমূল্য দুষ্প্রাপ্য।

বোমার আতঙ্কে কলকাতা থেকে দলে দলে মানুষ চলে যাচ্ছে এ দৃশ্যও যেমন সত্য, তেমনি সত্য কলকাতার রাস্তায় ক্ষুধার্ত মেদিনীপুর, বর্ধমান হুগলী, চব্বিশপরগণার গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভিড়। তারা ফিরছে শহরের আস্তাকুঁড়ের পাশে, গৃহস্থের দরজায় খাদ্যের আশায়। কিন্তু তারাশঙ্কর দেখেছেন শহর তাদের রক্ষা করতে পারে নি। মিলিটারি ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে, না হলে রাস্তার ধারে অনাহারে, ব্যাধিতে তারা দলে দলে মরছে। লেখকের মতে 'ভিক্ষা ওদের পেশা নয়, কিন্তু ওরা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।' এটাই তাঁর ক্ষোভের কারণ। তিনি দেখিয়েছেন, বর্ধমানের গ্রামের ভাগচাষীর ছেলে কলকাতার পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করে। তার আশা যুদ্ধ থামলে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে আবার ঘরে ফিরবে। যুদ্ধ তাকে এত বিচলিত, উত্তেজিত করেছে যে সে ঠাকুর দেবতার গানের বদলে যুদ্ধ, বোমা, বুভুক্ষু মানুষের ক্ষিধের

কথা নিয়ে গান বাঁধে।

শহরের মানুষও এই যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পায় নি। ৪২-এর শেষে, ৪৩-এর শুরুতে শহরের ত্রিশ চল্লিশ টাকার কেরাণীর ঘরেও অর্ধাশন শুরু হয়েছিল বলে তারাশঙ্কর মনে করেন। তিনি আরো দেখেছেন নগর-জীবন জুড়ে চলেছে এক নৃশংস বঞ্চনা আর শোষণ। তিনি শুনেছেন 'মহানগরী যেন চীৎকার করছে ম্যায় ভুখাহু'।

কিন্তু যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুনাফালোভের চরম দিকটিই তারাশঙ্করকে বেশি বিচলিত করেছে। তিনি মানুষের এ রকম মর্মান্তিক চেহারা আগে আঁকেন নি। স্বার্থান্ধ, লোভী মানুষ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে মানবতার বিরুদ্ধাচারে মেতেছে—'যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলে যে সর্বনাশা বিকৃতক্ষুধা কুম্ভকর্ণের রূপ নিয়ে উঠছে,' এবং অন্যদিকে দরিদ্র মানুষ ক্ষুধার দায়ে অসহায় ভাবে যে আত্মবিক্রয় করছে সেই কথাটাই তারাশঙ্করের বলবার ছিল। উপন্যাসের নায়িকা নীলা দেখেছে গুণদাবাবুর স্ত্রী মৃত সন্তানের মুখ সযত্নে মুছিয়ে দিতে দিতে বলছেন 'তোর সঙ্গে আমি যেতে পারলাম না, রইলাম খবরটা তোর বাপকে দিতে হবে; তাঁকে সেদিন সান্ত্বনা দিতে হবে। তুই কেমন ভাবে ওষুধের অভাবে মরেছিস—দোকানে ওষুধ থাকতে পাঁচ টাকার ওষুধের দাম পঁচিশটাকা চেয়ে ওষুধ দেয় নি দোকানদার।' তিনি বেঁচে থাকবেন শুধু 'বুড়ো হয়ে সেই কথা' বলবেন ওই ছোটখোকার ছেলেদের অর্থাৎ আগামী প্রজন্মের কাছে, তাই যেতে পারলেন না।

এই যুদ্ধ তারাশঙ্করের কাছে মহামন্বন্তর, বিধ্বংসী অবক্ষয় বলে চিহ্নিত হলেও এরই মধ্যে যে রূপান্তরের ইঙ্গিত রয়েছে এ বিশ্বাস তারাশঙ্কর করেন। তিনি দেখেছেন যুদ্ধ আর বঞ্চনার মাঝে নেপী যার পোষাকী নাম নৃপেন, এদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজের ছাত্রেরা সব ছেড়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনীতির ভিন্ন আদর্শের মধ্যে আস্থার আশ্রয় খোঁজে। দেশের কাজে ত্রাণ সাহায্য নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। নীলার মতো মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের শিক্ষিত মেয়েরা সব সংকোচ সরিয়ে রেখে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরিবারের সমান অংশীদার হয়। মেয়েদের বাইরের কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসার প্রবণতা, সক্রিয় রাজনীতিতে আকর্ষণ কিন্তু সমাজ সবক্ষেত্রে অনুমোদন করে না। গুণদাবাবুর স্ত্রীকে কিছুটা তাচ্ছিল্য নিয়ে বলতে শোনা যায়—'তুমি তো আজকালকার মেয়ে। স্বদেশী করে বেড়াও।' কিন্তু নীলা এ ব্যঙ্গে কুণ্ঠিত

নয়। 'নতুন যুগের আধুনিক মেয়ে—তার জীবনে সে একটা আদর্শকেও গ্রহণ করেছে; যার জন্য এত কালের প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসকে ত্যাগ করলেই চলবে না, মাটির বুক থেকে তাকে মুছে ফেলতে হবে; কেননা তার আদর্শের সকল কাম্য পার্থিব বাস্তব।'

এই পরিবর্তনশীল সমাজের বাস্তব রূপরেখা আঁকতে আঁকতে লেখক অনাগত ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন—'কণ্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েদের কিউ। হিন্দু মুসলমান, হিন্দুস্থানী, বাঙালী—স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য। গৃহস্থঘরের বিধবা সধবা, কুমারী শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোরখা নেই, ঘোমটা নেই। হয়তো বোরখা, ঘোমটা এদের চিরকালের জন্যই খসে গেল। এই চরমতম দুর্গতির মধ্যেই এসে গেল আবরণ থেকে মুক্তি।'

শুধু তাই নয়, নীলা ধর্মতলার মোড়ে জুতো পালিশরত বালক ব্যবসায়ীদের দেখে কল্পনা করেছে—বর্ণাশ্রম ধর্মের অপঘাত সমাপ্তি বোধ করি এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই ছেলেদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুচি এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি—কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও মধ্যে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বর্ণহিন্দু এমন কি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কতজন আছে তার হিসেবে কেউ রাখে নি। রাখবার আগ্রহও নেই—কারণ এ যেন প্রাচীন বৃদ্ধের মৃত্যু—স্নায়ু, শিরা সমস্ত ইন্দ্রিয় জরায় জীর্ণ হয়ে স্বাভাবিক বিলম্বিত মৃত্যু মরছে। জাতি, ধর্ম বর্ণ সমস্তেব অতীত ধরিত্রীর বুকে রূপ হতে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বহমান প্রাণশক্তির প্রবাহ একান্ত নিরাসক্তভাবেই মুক্তির আগ্রহে নব কলেরব প্রয়াণ করছে।'

এমনি ভাবে প্রথাবৃত্তি কুলবৃত্তির ক্রম পরিবর্তন নতুন অর্থনীতি নির্ভর সমাজের ইঙ্গিতবহ। আর অভিজাত চক্রবর্তী পরিবারের ধ্বংসের এবং পুরাতন সমাজ অর্থনীতির গ্লানি নির্ভর অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পতনও যে অনিবার্য—এই সমাজ বাস্তব চেতনার সঠিক পথটিকেই তারাশঙ্কর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে সন্ধান করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসের মতো 'মন্বন্তর' ও তাঁর কাছে মানুষের বিপন্নতার শেষ দলিল হয়ে থাকে নি। নাগরিক জীবনের চরম মূল্যবোধহীনতার করুণ আর্তির মাঝখানেও তিনি রূপান্তরিত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন এবং সেটি সম্পূর্ণ তাঁর স্বকীয় মানসভঙ্গির প্রকাশ।

১. ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম

প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩-এ বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ভূমিকায় লেখক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন—'মন্বন্তর প্রকাশিত হল। দেশের বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে বাঙালীর এ যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে-মেয়ের জীবন নিয়ে বই লিখার কল্পনা আমার ছিল…একটি আলোচনা বাসরের বিতর্ক থেকে মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং 'মন্বন্তর' লিখতে আরম্ভ করি।' এই উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক 'আমার সাহিত্য জীবন' ২য় খণ্ড, ১৩৭২-এ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২. ১৯৪১-এর ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সম্মেলনে তারাশঙ্কর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাস লেখার সময় তাঁর চিন্তাধারা শিল্পীসংঘের কর্মবিধিকে অনুমোদন করছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সাল থেকেই ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের কার্য-কলাপে তিনি বিচলিত বোধ করেন। ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে তিনি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন এবং এরপর ধীরে ধীরে সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর মতব্যাখ্যা করেছেন 'আমার সাহিত্য জীবন' দ্বিতীয়খণ্ডে।

৩. উদ্ধৃতিগুলি মিত্র ও ঘোষ সম্পাদিত তারাশঙ্কর রচনাবলী ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯১ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪. পঞ্চাশের মন্বন্তর ও সমকালীন দেশের দুরবস্থা নিয়ে তারাশঙ্কর ছাড়াও আরো অনেকেই গল্প উপন্যাস লিখেছেন। গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস—'পঞ্চাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী', 'তেরশো পঞ্চাশ' দুর্ভিক্ষ পীড়িত সমাজ জীবনকে অবলম্বন করে লেখা সবচেয়ে সার্থক উপন্যাস; বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'কালো-ঘোড়া', 'শতাব্দীর অভিশাপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তর কালের গল্প সংগ্রহের' অধিকাংশ গল্প; নবেন্দু ঘোষের 'ডাকদিয়ে যাই' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের অর্থ নৈতিক, মানসিক অবক্ষয়ের তিক্ত চেহারাটা ধরা পড়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ—

১। পঞ্চাশের মন্বন্তর—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫১।
২। বাংলায় মন্বন্তর—দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। সংস্কৃতি ও সমাজ পত্রিকা, ক্রেসিডা।

ধাত্রীদেবতায় তারাশঙ্কর

রেখা চক্রবর্তী

'ধাত্রীদেবতা'কে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে দ্বিধা হলেও এই উপন্যাস যে তাঁর স্মরণীয় কীর্তি—একথা স্বীকার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ক্ষণে ১৯৩৯ সালে 'ধাত্রীদেবতা' প্রকাশিত হয়। অতএব যুদ্ধ-সমসাময়িক বা যুদ্ধোত্তর কালের প্রভাব সেখানে থাকা স্বাভাবিক নয়। তবে মনে রাখা দরকার এর আগে তারাশঙ্করের 'রাইকমল', 'জলসাঘর', 'রসকলি' প্রভৃতি রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব একদিকে তাঁর সাহিত্যচর্চার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন ও শিল্পরীতি ক্রমশ গড়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের সঙ্গে দেশকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষণীয়। আর এই থেকেই তাঁর সমাজবোধ স্পষ্ট হয়েছে, তিনি দেশকালকে পটভূমিরূপে প্রয়োগ করেন নি, তার তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রয়াসী ছিলেন। আবার কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা রক্ষা করেও তিনি প্রাচীন আখ্যান বা saga রচনা করতে চান। সেই হিসাবে 'ধাত্রীদেবতা' নিছক শিবনাথের কাহিনী নয়, বিশ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকের বাংলা দেশের ইতিহাস। প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব-বিষয়টি তারাশঙ্করের প্রিয় বলেই তাঁর রচনায় বার বার উপস্থিত। 'ধাত্রীদেবতা'য় দ্বন্দ্ব রূপে এটি না এলেও দুই পক্ষ স্পষ্ট। পুরনো জমিদার এখন মধ্যবিত্তে পরিণত, কিন্তু অভ্যস্ত প্রথা ও সংস্কার তবু যায় না। অন্যদিকে যে কলকারখানা ও তাকে কেন্দ্র করে নতুন ধনিক শ্রেণী গড়ে উঠেছে, তাকে ঠিক ধনতন্ত্র বলা চলে না। কারণ এই নব্য ধনতন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের প্রকৃত বিরোধ নেই। সমস্ত ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য না হলেও একটি পরিবর্তন যে ঘটছে, তা তারাশঙ্কর লক্ষ্য করেছেন। তবে এই পরিবর্তনকে তিনি গ্রহণ করেছেন কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। সাহিত্যজীবনের শেষদিকে তারাশঙ্করের চেতনায় যে অধ্যাত্মবোধের বিকাশ, তাতে আকস্মিক মনে করা হয়। কিন্তু ভাবা দরকার, তাঁর রচনায় একটি আদর্শবাদ শুরু থেকেই ছিল। দেখা যায়—ধাত্রীদেবতায় যার সূচনা, কালিন্দীতে তার অগ্রগতি, গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে তার পরিণাম। এইদিক থেকে ধাত্রীদেবতা উপন্যাসের নতুনভাবে বিচারের প্রয়োজন আছে মনে হয়।

তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে রাজনীতি-দর্শন বা তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। তারাশঙ্কর নিজে জমিদার—বংশের সন্তান হয়েও স্বাধীনতা-আন্দোলনে জড়িত হয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলন—দুই ধারাতেই তিনি যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর একাধিক উপন্যাসে একদিকে যেমন বিপ্লববাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনই গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনও বারবার তাঁর রচনায় ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্করের মানস-জগতে ক্রমবিবর্তন ও উপন্যাসে তার প্রকাশ নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে, 'ধাত্রী-দেবতা'র রাজনীতি-দর্শনও আলোচনার বিষয় হয়েছে ইতিপূর্বেই। আপাতত লক্ষণীয় তারাশঙ্করের স্বদেশচেতনা 'ধাত্রীদেবতা'তে কিভাবে স্থান করে নিয়েছে। তারাশঙ্কর আত্মকথনকালে বলেছেন, '১৯৩২ সাল থেকে সাহিত্যের পথে পা দিয়ে চৈতালী ঘূর্ণি থেকে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি রচনার মধ্যে এই স্বাধীনতাযুদ্ধের রূপ ও মহিমাকেই প্রকাশ করেছি। এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আমার জীবনযুদ্ধের জয়কামনার স্বরূপ। এবং সেইটি হয়ে উঠেছিল আমার লক্ষ্য। দেশের স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখব। সত্য বলতে এ দেখে যাব, দেখতে পাব, এমন আশা তো করতে পারিনি! এর জন্য যুদ্ধ করতে করতেই চোখ বুজব এই ধারণাই ছিল। এবং সাহিত্যের ধ্যান এই কামনাকেই আশ্রয় করে আমার ভাগ্যগুণে সরস্বতীর আরতি-প্রদীপ হযে উঠেছিল।' একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মতোই তারা-শঙ্কর স্বদেশকে তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। এ স্বদেশ অবশ্যই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর একটি গ্রাম বা শহর নয়, তারাশঙ্করের স্বদেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু এই মাতৃভূমিকে তিনি আপন বলে জেনেছিলেন তাঁর জন্মভূমি লাভপুর গ্রামকে ভালবেসেই, তাঁর মা ও পিসিমার কাছেই তাঁর এই ভালবাসার শিক্ষা-দীক্ষা। তারাশঙ্কর নিজে মন্তব্য করেছেন, 'ধাত্রীদেবতা আমার আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস' এবং 'আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে মাংসে, মেদে মজ্জায়, চিন্তায় মননে ধাতুগত হয়ে আছে তাঁদের প্রথম তিনজনের তিনি একজন—বাবা-মা-পিসীমা।'[২] ধাত্রীদেবতার রামরতনবাবু ও গোঁসাইবাবা চরিত্র দুটি তাঁর চেনা জগতে চোখে দেখা নীলরতনবাবু মাষ্টার মহাশয় ও রামজী সাধুর চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। তাই এই উপন্যাসে তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা যেমন ছায়াপাত করেছে, তেমনি তাঁর ব্যক্তি-চিন্তার প্রকাশও ঘটেছে। তারা-

শঙ্করের বৃহত্তর ভারতবর্ষ এই ক্ষুদ্র লাভপুর গ্রামের দর্পণেই যেন প্রতিবিম্বিত ; এখান থেকেই তাঁর জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনীয় রসদ সংগৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন অথবা রাজনৈতিক মতবাদ এখানে বড় কথা নয়, তরুণ মনের সেই পুষ্টির কথাই তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—'মাটির ভূমির যেমন তৃপ্তি আপন বক্ষের শস্যে, অন্নে, জলে, বাতাসে অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মানুষকে পুষ্ট করায়, তেমনি আরও একটি গভীরতর তৃপ্তি এই মাটির আছে, সেটি ওই মাটির বুকের সমাজের সংস্কার সংস্কৃতি থেকে সন্তানের মনটিকে পুষ্ট করায়।

লাভপুরে আমার জীবন কেটেছিল, এক নাগাড় বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত। এখানেই এই মনটি পেয়েছিলাম। আমার মনের সৎ অসৎ বিচারের যে ধারাটি তার দিক্ নির্ণয় করে দিয়েছে—এই লাভপুরের মৃত্তিকা, লাভপুরের সমাজ।'[৩]

'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথের শিক্ষা হয়েছে বিবিধ বিচিত্রভাবে। তার মা জ্যোতির্ময়ী তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে শুনিয়েছেন, হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছেন, দেশে ঘরে ঝগড়া করতে বারণ করে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। তার পিসিমা শৈলজা দেবী তার কাছে বীজমন্ত্রের মত উচ্চারণ করেছেন, 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের' এবং 'না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত'। গোঁসাই বাবার কাছে সে দেশবিদেশের বীরত্বকাহিনী ও যুদ্ধবিগ্রহের গল্প শুনেছেন। রামরতনবাবুর কাছেও সে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। গ্রামের পটভূমিকায় সমগ্র দেশকে ধরার চেষ্টা 'ধাত্রীদেবতা'য় আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। একাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনা—

'মা বলিলেন, মাঠে একা কি ভাবিস শিবু, পিসীমা তোর বলছিল আমায় ? শিবু মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আনন্দমঠে"র সেইখানটা মনে আছে মা—মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন ? আমি তাই দেখতে চেষ্টা করি মা।

মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চোখে তাঁহার একটি শুভ্র হর্ষোজ্জ্বল দীপ্তি।

শিবনাথ বলিল, বুঝতে পারি না মা। সেই মূর্তিও কল্পনা করতে পারি না। সেই আকাশ, সেই নদী, সেই মাঠ, সেই ফসল—

মা বলিলেন, দেশ কি মাটি শিবনাথ ? দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে। তুই আমাদের পটো পাড়াটা দেখেছিস শিবু ?

আর তো পটোরা নেই ; সব মরে গেছে, কজন ছিল পালিয়ে গেছে।

আমার বিয়ের পরও আমি দেখেছি শিবু, ওই পটো-পাড়ার কি চলতি! বড় বড় জোয়ান পট দেখিয়ে গান করত, মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। যে জায়গা দিন রাত্রি হাসি গান আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত, সেই জায়গা আজ কি হয়েছে! ওইখানে ভেবে দেখ, মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন!

শিবুর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ মহামারীর প্রকোপ উপশমের পর গ্রামে শ্মশানে রক্ষা-কালীর পূজার বর্ণনাতেও অনুরূপ প্রয়াস লক্ষণীয়—

'সুশীল প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, এ দেবতার এই হল উপযুক্ত পূজামণ্ডপ। শ্মশানের মাঝখানে, ওপরে অনাবৃত আকাশ, চারিপাশে শেয়াল-কুকুরে চিৎকার; এ না হলে মানায় না।

পূর্ণ মুগ্ধভাবে বলিল, অপূর্ব মূর্তি! এমন পরিকল্পনা বোধ হয় কোন কালে হয় নি।

শিবনাথের মনে পড়িয়া গেল, সে বলিল, "কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালীমাময়ী। হৃত সর্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। ...মা যা হইয়াছেন।"

এই ষোড়শ পরিচ্ছেদেই ইতিপূর্বে কলেরা উপলক্ষে গ্রামে ম্যাজিক—ল্যাণ্টার্ন লেকচার ও সেই বিষয়ে সুশীলের উক্তির মাধ্যমে এই মত ব্যক্ত হয়েছে যে, এ দেশের মানুষের অশেষ দুর্গতির জন্য তাদের অজ্ঞতা বা অশিক্ষাকে দায়ী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতাই এ জাতির দুঃখের কারণ; যে জাতি দাসত্ববন্ধনে বদ্ধ, সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বঞ্চিত হয়েই থাকে।

শিবনাথের নিজস্ব গৃহ, পরিবার, পরিবেশ, সমাজ—এই সব কিছুর মধ্যে সে ধীরে ধীরে দেশকে অনুভব করতে পেরেছে। তার বাল্যবিবাহ, ঘোড়ায় চড়া, পালকি প্রভৃতির কথা শুনে কলকাতা থেকে আসা মেডিক্যাল ভল্যান্টিয়ার সুশীল ব্যঙ্গ করে শিবনাথের বাড়ি আর তার পরিবেশকে 'ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিরিয়ড অব দি গ্রেট মোগলস' বললে শিবনাথ উত্তপ্ত হয়ে উত্তর দেয়, 'সে যুগ কিন্তু এই ফিরিঙ্গী যুগের চেয়ে অনেক ভাল ছিল সুশীলবাবু। উই হ্যাড আওয়ার ইণ্ডিপেডেন্স ইন দি ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড পিরিয়ড অব দি গ্রেট মোগল্‌স' (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ)। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় সুশীলের চিঠিতে শিবনাথ

অনুপ্রাণিত হয়েছে। সে লিখেছে, 'আপনি আর দেশে বসিয়া কেন? কলেজ খুলিতে আর কয়দিনই বা বিলম্ব! আপনি এখানে চলিয়া আসুন। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেশের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবেন।' শিবনাথ কলকাতায় এসেছে এবং সুশীল-পূর্ণর কর্মান্দোলনে যুক্ত হয়ে'অন্যত্র ও গেছে। এরপর রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য সে লক্ষ্য করেছে, বিভিন্ন ভাবে তাদের দ্বারা শিক্ষালাভ করেছে, এরই সঙ্গে নিজের চিন্তাকে পরিণত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যে উত্তেজনায় সে নিজের সোনার চেন, ঘড়ি, বোতাম ও আংটি সুশীলের হাতে তুলে দেয়, তা দেশপ্রেমের উত্তেজনা। সুশীল ও পূর্ণ তাকে উদ্দীপ্ত করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দলের নীতিতে সে সন্তুষ্ট হতে পাবে না। পূর্ণর হাতে তারই দলের প্রবীণ বিপ্লবী নেতার মৃত্যু শিবনাথকে নতুন চিন্তায় আবিষ্ট করেছে। এই আকস্মিক ঘটনার আঘাতে স্তব্ধ শিবনাথ ঠিক তার পরেই হারিয়েছে তার মাকে। এবাব তার স্বদেশ-চেতনা গণ্ডীমুক্ত হয়ে বৃহত্তর অনুভূতিতে ব্যাপ্ত হয়েছে। গ্রামের রূপের মধ্যেই শিবনাথ এতদিন সমগ্র দেশের রূপকে উপলব্ধি করেছিল, এবার সে রূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বিশ্বরূপ। মায়ের মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ করে তার মন এক অদ্ভুত উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন হয়েছে। সে এই প্রকৃতিতে সমগ্র সৃষ্টির জীবন স্পন্দন অনুভব করেছে, সমগ্র ধরিত্রীকে দেখতে পেয়েছে। তার মা, গ্রাম্য প্রকৃতি, মাতৃভূমি ও জগজ্জননী তার চোখে একই রূপে দেখা দিয়েছেন—

'কি অপূর্ব আজিকার ধরিত্রীর রূপ! তাহার মা ছিলেন এই জ্যোৎস্না-বর্ণময়ী নিশীথের মত প্রশান্ত স্থৈর্যময়ী, দিবসের কলরবের উন্মত্ততা তাঁহার জীবনে ছিল না, তিনি ছিলেন এমনই নৈশপ্রকৃতির মত অশ্রান্ত মর্মসঙ্গীতময়ী। তাহার মনে পড়িয়া গেল—শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীম্, ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদলশোভিনীম্, সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্, সুখদাং বরদাং মাতরম্—বন্দেমাতরম্।' (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ)

এবার শিবনাথ গৌরীকে নিয়ে সংসার-জীবন শুরু করেছে, কিন্তু তার মনে সুপ্ত আছে দেশের স্বাধীনতার কামনা। সে পথ খুঁজেছে রক্তাক্ত পথের কথা ভেবে সে শিহরিত হয়ে উঠেছে। গ্রামের রিক্ত দৈন্য-রূপের মধ্যেই সে স্বদেশের হাহাকার শুনেছে, তৃষ্ণার্ত মাটি কথা কয়েছে, মৃত্তিকার আবরণের তলায় শিবনাথ প্রত্যক্ষ করেছে জাগ্রত ধরিত্রী-দেবতাকে। চিন্ময়ী মা তার চোখে মৃন্ময়ী মায়ের রূপে দেখা দিয়েছেন। সন্তান-সম্ভবা গৌরী তাকে মুক্তি দিয়ে পিত্রালয়ে চলে

গেলে শিবনাথ দুঃখিত হলেও স্বস্তি বোধ করে। এবার তার কর্মক্ষেত্র ময়ূরাক্ষীর তীরে এক চরভূমিতে। এখানে সে কৃষিকাজ শুরু করেছে, নাইট স্কুল ও ডাক্তারখানা চালু করেছে, চরকা ও তাঁত প্রবর্ত্তন করেছে। এই ঘটনার সময় —১৯২১ সাল। স্পষ্ট বোঝা গেল শিবনাথ সহিংস সশস্ত্র বিপ্লব-পন্থা থেকে সরে এসেছে। ধীর স্থির শান্ত অথচ দৃঢ় প্রকৃতির সেই বিপ্লবী-নেতার ভুলের মাশুল তথা আকস্মিক মৃত্যু তাকে বিচলিত করেছে। এবার সে যোগ দিয়েছে অসহযোগ আন্দোলনে। কিন্তু দলমতের পার্থক্য ও কোনো বিশিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ শিবনাথের জীবনে সত্য নয়, 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসেও সে কথা শেষ কথা নয়। তাই নির্জনবাসের সময়ে একক চেষ্টায় ক্লান্তিহীন ভাবে কাজ করেও শিবনাথের শান্তি ও তৃপ্তি হয় নি। ময়ূরাক্ষীর বালুকাগর্ভে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করেছে—

'মাটির ভিতর সে মাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিয়াছিল। দেখিতেও পাইয়াছে, কিন্তু যে মূর্তিতে সে মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। মায়ের এ মূর্তি যেন গৃহস্থ বধূর মূর্তি, ক্ষুদ্র গণ্ডি-ঘেরা একখানি বাড়ির ভিতর এ মা সন্তান পালন করেন, স্নেহে বিগলিত শান্ত সলজ্জভাবে পরম মমতায় সন্তানকে বুকে আঁকড়াইয়া শুধু ধরিয়া রাখেন। তাহার মনে পড়িয়া যায়—"সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।" এ মা, সেই মা। বিরাট মহিমায় যে মা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আপন মহিমার দীপ্তিতে আকাশ-বাতাস জল-স্থল ঝলমল করিয়া দাঁড়াইবেন, সে মূর্তিতে মা কবে দেখা দিবেন?'

এখানে সে বহুদিন পরে আবার সুশীলের দেখা পেয়েছে। পূর্ণর গৌরবময় মৃত্যু এবং সুশীলের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনে শিবনাথ আবার উত্তেজনা বোধ করেছে। শিবনাথ থেমে থাকতে চায় নি, ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান পায়নি। 'গণদেবতা'র দেবনাথ এমন ভাবেই পথ খুঁজেছে, গ্রামের গণ্ডী থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। কিন্তু তারও কর্মবৃত্তের আবর্তনের স্থির লক্ষ্য ছিল একটিই, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কঙ্কণা—শিবকালীপুর। ন্যায়রত্নের বাড়িতে যে রথযাত্রা, দেবনাথ তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পদাতিক দেবনাথের প্রশ্ন—'এ রথ কোথায় গিয়া থামিবে, কে জানে?' রথযাত্রা এখানে দেবুর কাছে ধর্মীয় উৎসব মাত্র নয়, একে সে গ্রামীন সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গমাত্র মনে করে না। এই উপলক্ষে পঞ্চগ্রামের চাষী মাতব্বরেরা ন্যায়রত্নের ঠাকুর বাড়িতে সমবেত হবে। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে একত্রিত করার মাধ্যম

বলেই যেন দেবু পণ্ডিতের কাছে এটি গুরুত্ব অর্জন করেছে। যে আঞ্চলিকতা তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনায় একটি বড় লক্ষণ, তা কখনই জাতীয়তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করে নি, দেশের রূপের মধ্যেই সমগ্রকে অনুভব করেছে তাঁর উপন্যাসের নায়করা। আবার রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্যও এই সব নায়কদের স্বদেশচেতনাকে সঙ্কীর্ণ করে দিতে পারে নি। শিবনাথের জীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল, কিন্তু কোথাও সে স্থির আশ্রয় পায় নি। যুগধর্মের প্রভাবে রাজনীতির প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের রচনায় বারবার এসেছে, কিন্তু তাতে তাঁর নায়করা যেন পুরো আশ্রয় পায় নি। রাজনীতি শিবনাথের স্বদেশচেতনাকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করেছে। এইজন্যই সুশীলের সঙ্গে কথোপকথন কালে তাদের পথকে শিবনাথ চরম মনে করলেও পরম বলে ভাবতে পারে নি। হিংসাত্মক নীতিতে তার অবিশ্বাসের জন্যই সে শুধু এ কথা বলে নি। শিবনাথ তখন শুধু দেশের স্বাধীনতা চেয়েছে বৃহত্তর কল্যাণের সোপান রূপে। তাই 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পরিণতিকে অনেকটা চেষ্টাকৃত বা আরোপিত মনে করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু শিবনাথের যে পথ-পরিক্রমা উপন্যাসের পর্বে পর্বে রূপান্বিত হয়েছে, তাতে শেষের পরিচ্ছেদে শিবনাথের পিসিমার উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে স্বগতোক্তিকে তার আত্মপরিচয় ও পথ-সন্ধান বলেই মনে হয়—

'সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমায় বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।'

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, লাভপুরে তারাশঙ্করের নবসংস্কৃত কাছারি-বাড়ির গেটে মার্বল প্লেটে অনুরূপ উক্তি রয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'এই উক্তিটি বিশেষভাবে ধাত্রীদেবতার মর্মগত সত্য হলেও সাধারণভাবে ওরই মধ্যে তারাশঙ্করের সামগ্রিক জীবনবোধের মর্মগত সত্য বিধৃত রয়েছে। বাস্তু থেকে দেশ, দেশ থেকে ধরিত্রী, ধরিত্রী থেকে আকাশ। সূত্রাকারে এই হল তারাশঙ্করের মানসবিবর্তনের ইতিহাস।'[8] মা-পিসিমার শিক্ষায় গ্রামের পরিবেশে শিবনাথের যে জ্ঞানোন্মেষ, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আন্দোলনে নেমে পড়া ও কারাবরণে তারই পরিণতি, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শিবনাথের সামনে আছে

অনন্ত পথ তার অন্তরে আছে পরম জিজ্ঞাসা, অতএব চলতে তাকে হবেই।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথ কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাকে ঘিরে প্রধান—অপ্রধান বহু চরিত্রের সমাবেশ এখানে। 'কালিন্দী' 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'পাষাণপুরী', 'চৈতালী ঘূর্ণি'—প্রভৃতি বেশ কয়েকটি উপন্যাসেই তারাশঙ্কর অগণিত চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি চরিত্র সর্বাত্মক প্রাধান্য পায় নি। 'কবি', 'সন্দীপন পাঠশালা' প্রভৃতি দু-একটি রচনায় নায়কের আত্মোপলব্ধি এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপন্যাসের প্রধান বিষয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিজীবন এবং কর্মক্ষেত্র ও ভাবনার রাজ্য একসূত্রে গ্রথিত হয় নি। সীতারাম ও নিতাই কবিয়ালকে তাদের উৎপত্তিক্ষেত্র ও স্বস্থানে তেমন ভাবে আমরা দেখিনি, যেমন দেখেছি শিবনাথকে। তাই শিবনাথ 'প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট' মনে করেছে, জমিদারি ছেড়েছে, কিন্তু প্রাচীন আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার গৌরবকে অবহেলা করে নি। দেশের সম্বন্ধে তার ধারণার সূত্রপাত এখানেই, আবার এরই মধ্যে সে আত্মপরিচয় লাভ করেছে। শিবনাথ এইভাবেই বারবার তার জীবনে নিজের সঙ্গে পরিপার্শ্বের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, কর্মের সঙ্গে ভাবের ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় ঘটিয়েছে। বালক শিবনাথের খেলাধূলা, হোঁড়োলের বাচ্চা ধরার কিশোরসুলভ প্রবণতা, মা-পিসিমার প্রতি ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত মনোভাব অথচ তারই সঙ্গে স্বাধীনচিত্ততা, তার অভিমান-রাগ-দুঃখ আবার একই কালে অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ, উচ্চ আদর্শ—এই সমস্ত নিয়ে একটি সাধারণ অথচ স্বতন্ত্র প্রকৃতির কিশোরকে লক্ষ্য করা গেছে। শিবনাথের অতি সাধারণ ও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে তার বিবাহ-উপলক্ষ্যে। শিবনাথ আপত্তি করেছিল তার গৃহশিক্ষক রামরতনবাবুর অনিচ্ছায়, তার মায়ের অনুরোধে রামরতনবাবু সম্মতি দিলে শিবনাথ আর অনাগ্রহ দেখায় না, 'কারণ মাষ্টারের আদেশ শিরোধার্য করিলেও বিবাহের প্রতি তাহার বিদ্বেষ তো ছিলই না, বরং অনুরাগই ছিল।' ফুলশয্যার রাত্রে ভ্রাতৃবধূদের অনুরোধমাত্রেই সোৎসাহে সে গান আরম্ভ করে দিয়েছে। এমন প্রাণবন্ত কৈশোরে হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষের সময়ে তারাশঙ্করের আর কোনো নায়ককে দেখা যায় নি। আবার এর ঠিক পরের বর্ণনা—শিক্ষক রামরতনবাবু সম্মানরক্ষার্থে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, শিবনাথ আদর্শের দিক থেকে তাকে সমর্থন জানিয়েছে, আবার তার আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাতর হয়েছে। বিদায়কালে শিবনাথ যে সাশ্রুনেত্রে

তার গুরুর পদধূলি গ্রহণ করেছে, এটি তার সাময়িক আবেগ বা উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, এ তার যথার্থ আন্তরিক ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। কৈশোরকাল মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষপর্ব। শিশু নায়ক অনেক গল্প-উপন্যাসেই দেখা গেছে, কিশোর নায়কও দুর্লভ নয়, কিন্তু কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সময়টি মানব-জীবনে প্রস্তুতি পর্ব, এই কালকে চিত্রিত করা কঠিন। কোনো মানুষের নিজের পক্ষেও এই পরিবর্তন বা উত্তরণের কাহিনী বর্ণনা করা সহজ নয়। তাই সাহিত্যে আমরা এমন নায়ক কম দেখেছি, যে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'তে অপুর জীবনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের স্তরগুলি বিবৃতি করেছেন। অপুর বয়ঃসন্ধির লক্ষণস্বরূপ মা'কে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, লীলার প্রতি আসক্তি, বিবাহের পর এক নতুনত্ব ও বিহ্বলতার অনুভূতি—প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অপুকে লেখক ঠিক সাংসারিক জীব হিসাবে দেখাতে চান নি, তাই তার পরিণতির মধ্যে সর্বত্র স্বাভাবিকতা নেই। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কৈশোরকালের রূপে যথাযথ রূপে দেখিয়েছেন, কিন্তু তারপরে মাঝের কয়েকটি বছরের বিবরণ তিনি দেননি, এরপরে আবার কাহিনী শুরু হয়েছে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীকান্ত যখন তার বন্ধু কুমার সাহেবের শিকার-পার্টিতে গিয়ে রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারীর সঙ্গে আলাপরত, তখনকার বিবরণে। অতএব শ্রীকান্ত চরিত্রের পরিণতি বা ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি, বরং বলা যায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে তার কৈশোর-অভিযানের বর্ণনাগুলি তার জীবনের বা চরিত্রের পূর্বভূমিকা এবং পরিচয়স্বরূপ উপস্থিত। এদিক থেকে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস ও তার নায়ক শিবনাথ বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। শিবনাথকে আমরা চোখের সামনে তার সমস্ত চরিত্র-লক্ষণ নিয়ে বিকশিত হতে দেখেছি।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথের দাম্পত্য—জীবনের কথা বলা যেতে পারে, যেটি এ উপন্যাসে এইটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তারাশঙ্কর তাঁর--গল্প উপন্যাসে বহু দম্পতি, তাদের জীবনযাত্রা ও পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা করেছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কয়েকটি উপন্যাস, যেখানে নায়ক আদর্শবাদী, সেইগুলির কথাই উল্লেখ করা হবে। 'কালিন্দী', 'সন্দীপন পাঠশালা' 'গণদেবতা' এবং 'ধাত্রীদেবতা'—এই চারটি উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নায়কের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গেছে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে অহীন্দ্র তার স্ত্রী উমার মধ্যে পেয়েছে তার যোগ্য সহধর্মিনী ও সহমর্মিণীকে। উমা তার স্বামীর

মনের কথা বোঝে, তার আদর্শ ও কল্পনাকে অনুভব করে, সেই স্বপ্নকে নিজের বলে গৌরব ও তৃপ্তি অনুভব করে। অহীন্দ্র তার অনুপমা জননীর উপযুক্ত সন্তান, তাঁর কাছেই তার সমস্ত শিক্ষার সূত্রপাত। কিন্তু তাঁকেও সে নিজের বিপ্লব-সংক্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারার বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না, যা সে বলতে পেরেছে উমাকে। উমা অহীন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী, তার সকল চিন্তার অংশভাগিনী। তাই, 'অহীন্দ্র উমাকে বলিয়াছে তাহার অন্তরের সকল চিন্তা সকল বেদনার কথা। উমা নিতান্ত অজ্ঞ পল্লীকন্যা নয় সে শহরে বড় হইয়াছে, স্কুলে পড়িয়াছে। অহীন্দ্রের কথার প্রতিটি শব্দ না বুঝিলেও, আভাসে সে বুঝিয়াছে অনেক। তাহার তরুণ চিত্ত অহীন্দ্রের গৌরবে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।' (৩১ শ অধ্যায়) 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেবনাথ ঘোষ বা দেবু পণ্ডিতের স্ত্রী-ভাগ্য ভাল—'তাহার স্ত্রীটি বড় ভাল মেয়ে। ধবধবে রঙ, খাঁদা নাক, মুখখানি কোমল—অতি মিষ্টি তাহার চোখের দৃষ্টি। আকারে ছোটখাট, মাথায় একপিঠ চুল—সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপরে দেবুর মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে।' দেবুর স্ত্রী বিলু উমার মত শিক্ষিতা নয়, তার স্বামী দেবনাথও অহীন্দ্রের মতো শিক্ষিত নয় তবু শিক্ষাজাত যে বুদ্ধি, আদর্শ ও নীতিজ্ঞান দেবুর ছিল, বিলু তার দ্বারা অভিভূত। সে তার স্বামীর প্রত্যেক কথা ও কাজকে সমর্থন করতো; দেবু কখনো কোনো অন্যায় করবে না, এ বিশ্বাস তার ছিল। তাই দেবুর কারাবরণে সে দুঃখ পেলেও গৌরব বোধ করেছে, দেবুর কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজনে সে হাসিমুখে ছেলের হাত থেকে বালা খুলে দিয়েছে। মাত্র একবারই বিলুকে অভিমান করতে দেখা গেছে। নিজের প্রতি নয়, পুত্রের প্রতি স্বামীর অবহেলায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই নিজেকে সংবরণ করে আবার কল্যাণ-প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। তাই এই স্ত্রীকে হারিয়ে দেবুর জীবন ভরে ওঠে অপরিসীম শূন্যতায়। 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম পণ্ডিত কিন্তু তার স্ত্রীকে হারিয়ে ঠিক এমন কথা ভাবে নি। যদিও এক বিষণ্ণ করুণ শোকানুভূতিতে তার মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। মনোরমা মৃত্যুর আগে তার স্বামী সীতারামের হাত ধরে বারবার বলেছে, 'তোমাকে আমি সুখী করতে পারি নাই। আশীর্বাদ কর, যেন পরজন্মে তোমাকে পাই, তোমার মনের মত হয়ে তোমাকে সুখী করতে পারি।'

(সতেরো পরিচ্ছেদ) সীতারাম মৃত্যুপথযাত্রিনীর মুখের এই কথায় চমকে উঠলেও নিজের মনে একে স্বীকার না করে পারে নি। মনোরমা তার মনের গতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেও পারে নি। গ্রাম্য অশিক্ষিতা এই পত্নীকে নিয়ে আদর্শবাদী, শিক্ষানুরাগী, নীতিপরায়ণ শিক্ষক সীতারাম সর্বাংশে সুখী হতে পারে নি। তার জীবনে এক পরিচ্ছন্ন মার্জিত সংস্কারমুক্ত শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত পরিবার ও সমাজের কল্পনা ছিল। এ অভাব মনোরমা মেটাতে পারে নি, এই আশা-স্বপ্ন দিয়েই সে এক শিক্ষিতা তরুণীকে ঘিরে কল্পনার ফানুস গড়েছিল। অথচ মনোরমাকে সে ভালবাসত, তাই এই দুর্বলতাকে সে গোপন পাপ বলেই মনে করতো, এইখানেই মনোরমার সঙ্গে তার একটি দূরত্ব ছিল। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের বিবাহ হয়েছে কৈশোরকালে, তার ছাত্রাবস্থাতেই। বিবাহ বিষয়ে তার কিছুমাত্র অনাসক্তি ছিল না, শুধু গৃহ-শিক্ষক রামরতন বাবুর অমতের জন্যই সে প্রথমে আপত্তি করেছিল। নয় বছরের বালিকা গৌরীকে সে যখন জীবনে গ্রহণ করেছে, তখন বিবাহের সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য বুঝতে পারার ক্ষমতা তার ছিল না, গৌরীর তো নয়ই। কিশোর-দম্পতির সম্পর্ক তারাশঙ্কর কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। শিবনাথের সঙ্গে গৌরীর কলহ, গৌরীকে নিয়ে শিবনাথের পদ্য লেখা, পিসিমার সঙ্গে গৌরীর বিবাদ এবং গৌরীর পিত্রালয়ে যাওয়া—এই নিয়ে শিবনাথের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পর্বের যে রূপ দেখা গেছে, তাতে তার শান্তিপূর্ণ সুখী ভবিষ্যতের কোনো আভাস পাওয়া যায় না। গৌরী এক নব্য ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা, যেখানে আভিজাত্য বা বংশমর্যাদা নেই, আবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক নেই। তাই এই বালিকা বধূ নাস্তি বা গৌরী যে পরে শিবনাথের উপযুক্ত হতে পারবে না, তা সূচনাতেই প্রতিভাত হয়েছে। শিবনাথ গৌরীর অমার্জিত স্থূলতাকে সহ্য করতে পারতো না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে বয়োধর্মে বধূর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল তীব্র। তাই শিবনাথ যেদিন এক উৎসবপূর্ণ পরিবেশে কাছারিবাড়ীতে প্রথম বসেছে, সেদিন প্রচণ্ড উন্মাদনা, কল্পনা ও সহস্র চিন্তার মধ্যে তার মনে পড়েছে স্ত্রীকে। ডোমবধূকে কেন্দ্র করে গ্রামে তার নামে যে রটনা হয়েছিল, তা লোকমুখে শুনে উত্তেজিত হয়ে গৌরী যে চিঠি দেয়, সেটি শিবনাথের জীবনে প্রথম একটি কঠিন আঘাত। এতদিন পর্যন্ত গৌরীর সঙ্গে তার নিজস্ব কোনো বিবাদ বা বিরোধ ঘটে নি, প্রধানত পিসিমার সম্মান রাখতেই সে যা কিছু বলেছে গৌরীকে ও তার পিতৃ-

কুলকে। কিন্তু গৌরীর এই চিঠি যেন শিবনাথকে সচেতন করে তুলেছে অনেকটা, তার নিজের সম্মানে ও পৌরুষে আঘাত লাগাতেই সে ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছে, এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানায় নি। শিবনাথ যে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত, মা—পিসিমার স্নেহছায়া থেকে আপন ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ তার দাম্পত্য সম্পর্ক তাকে জীবনের কঠিন ভূমিতে নামিয়ে এনেছে। এর পরে মাতৃবিয়োগে সে শোকগ্রস্ত অবস্থায় গৌরীকে কাছে পেয়ে প্রথমে তিক্ততা বোধ করলেও স্বাভাবিক জীবধর্মের প্রেরণায় তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই কারণেই এবার পিসিমার মুখে কাশীবাসের সংকল্প শুনে সে মনে মনে উত্যক্ত হয়ে তাতে সম্মতি দেয়। পিসিমা চলে যাবার পর দাম্পত্য-সম্পর্ক আর আবৃত থাকে নি. স্পষ্টতই শিবনাথ এবার গৌরীর নিদারুণ স্বার্থপরতা ও বৈষয়িকতার পরিচয় পেয়েছে। শিবনাথ গৌরীর এই রূপ দেখে শিহরিত হয়েছে এই কারণে যে, যে গৌরী তার স্ত্রী, অত্যাজ্য। গৌরীকে সে নিজে ত্যাগ করে নি, গৌরীই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। শিবনাথ কিছুতেই তার মনোরঞ্জনের জন্য নিজের আদর্শকে ক্ষুন্ন করতে পারে নি। গ্রাম, সমাজ, দেশ ও জাতিকে নিয়ে যে চিন্তার জগতে তার মুক্ত বিহার—গৌরী সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু এইটুকু হলেও ক্ষতি ছিল না, যদি গৌরী তার কলহপ্রিয় মুখর স্বভাবের জন্য সংসারে অশান্তির সৃষ্টি না করতো। শিবনাথ গৃহকোণ শান্তি ও কল্যাণের প্রতিমা রূপেও গৌরীকে পায় নি, আবার চিন্তাভাবনা, আদর্শ—কল্পনার ক্ষেত্রে সঙ্গীরূপেও পায় নি। নিছক প্রবৃত্তির তাগিদে এমন রমণীর সান্নিধ্যে আসা শিবনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই গৌরী বিদায় নিতে সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে, এবারে সে যথার্থ কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করতে পেরেছে। মহত্তর সেবার ব্রতে, সমাজ-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিবনাথ কাজ শুরু করেছে, কিন্তু এ কাজে বাধা অর্থ নৈতিক ভাবে এসেছে। তার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার আর কোনো উপায় থাকে নি। অথচ গৌরীর স্বার্থান্ধতার কথা ভেবে সে সম্পত্তি পরিত্যাগ করার কথাও চিন্তা করতে পারে নি। গৌরী তার যথার্থ সহধর্মিনী হলে তার নীতি ও আদর্শ রক্ষা করা অনেক সহজ হতো, এটিই শিবনাথের ধারণা। সকল কাজে স্ত্রীকে অংশভাগিনী করার ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু গৌরীর বিরোধিতায় তা হয় নি। তাই অহীন্দ্র-উমার মতো একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্রকে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে দেখা যায় নি। শিবনাথ ভেবেছে, 'গৌরী যদি তাহার জীবনে দুইটি নদীর জলধারার মত

মিশাইয়া দিতে পারিত, তবে উপায় ছিল। গৌরীব টাকার কথা মনে করিয়াই শুধু এ কথা সে ভাবে নাই। সে যদি শিবনাথের আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিত, তবে যে সে প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট—এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া এ সমস্ত বর্জন করিতে পারিত। জীবিকা? এতবড় বিস্তীর্ণ দেশ—মা-ধরিত্রীর প্রসারিত বক্ষ, তাহারই মধ্যে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে স্তন্যপায়ী শিশুর মত মায়ের বুক হইতে রস সংগ্রহ করিত।' (২৯ শ অধ্যায়) গৌরী যে স্বামীর স্বপ্ন-কল্পনা, আশা—আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ-নীতিকে বুঝতে পারতো না, তাই নয়, সাধারণভাবে ভালবাসবার ক্ষমতাই তার ছিল না। 'সন্দীপন পাঠশালা'র সীতারাম পণ্ডিত তার স্ত্রী মনোরমার কাছে অন্য কিছু না পেলেও স্নেহ-ভালবাসা, মমতা ও সেবাযত্ন পেয়েছিল। বিক্ষুব্ধ, যন্ত্রনাদগ্ধ ও অশান্তচিত্ত শিবনাথ ঘরের ও বাইরের সহজ ভাবনার আন্দোলনে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে হঠাৎ তার কাছারি বাড়িতে অতি দরিদ্র শ্রীহীন রোগগ্রস্ত দম্পতির যে ভালবাসার পরিচয় পেয়েছে, সে যেন তাব বঞ্চিত জীবনের পরিপূরক। শিবনাথ গৌরীর সম্বন্ধে আর একবার চিন্তা করেছে নতুনভাবে, যখন তার সন্তান—সম্ভাবনার কথা শুনেছে। শিবনাথ স্ত্রীকে ভালবাসতো, তাকে স্বেচ্ছায় অবহেলা বা অনাদর করে নি, তার দোষ-ত্রুটি ক্ষমার চেষ্টা সে বারবার করেছে। গৌরীর সন্তান তারও সন্তান, সে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন-কল্পনাকে পূর্ণ করবে, এই আশায় সে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। গৌরীকে সে বিপুল শক্তিশালিনী মনে করেছে, সম্ভবত নিজের মা-পিসিমার স্নেহচ্ছায়া ও লালণ—পালণের স্মৃতি তাকে বিচলিত করেছে, গৌরীকে সে পত্নীত্বে যে মর্যাদা দিতে পারে নি, মাতৃত্বে তা দিতে চেয়েছে। কিন্তু গৌরী এই মর্যাদাও নেয় নি, সে আবার চলে গেছে। দাম্পত্য-সম্পর্কের এই বিশ্লেষণের পরিণতি যেন আকস্মিক বা আরোপিত মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে বক্তব্য 'ধাত্রীদেবতা' আদর্শপ্রধান উপন্যাস, বিশেষ একটি ভাবকে এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। শিবনাথের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন, তার এক উপলব্ধি ও জীবন-দর্শনই উপন্যাসের মূল কথা। পিসিমাকে ধাত্রীদেবতা রূপে প্রত্যক্ষ করা এবং গৌরীর পারিবর্তন ও স্বামী প্রেমের আস্বাদ—এগুলি ঘটনা গত বা চরিত্রগত দিক থেকে প্রত্যাশিত হয়তো নয়, কিন্তু উপন্যাসের মূল লক্ষ্যে পৌছতে গেলে এই পরিণতি অস্বাভাবিক মনে হয় না। উনত্রিশ অধ্যায়ে শিবনাথ নিজের কাছারি বাড়িতে রুগ্ন জীর্ণ দম্পতিকে দেখেছে, তাদের গভীর প্রেমের পরিচয় পেয়েছে তাতে সে

মুগ্ধ হয়েছে—'শিবনাথ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সমস্ত অন্তর বিপুল তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে; কুৎসিত জীর্ণ দেহের মধ্যে জীবনের এমন সুমধুর প্রকাশ দেখিয়া তাহার সকল ক্ষোভ যেন মিটিয়া গিয়াছে।' স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির মধ্যে শিবনাথ জীবনের সুমধুর প্রকাশ দেখতে পায় বলেই তার বৃহত্তর কর্মান্দোলন শুরু করার আগে পিসিমার আশীর্বাদ এবং গৌরীর ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসের শেষাংশে গৌরীকে শিবনাথের উপযুক্ত সহধর্মিণী রূপে উপস্থাপিত করে তারাশঙ্কর শিবনাথকে জীবনে পূর্ণ রূপে দেখিয়েছেন। শিবনাথ ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তে উত্তরণ করতে চেয়েছে, স্বদেশ প্রেমেরও উর্ধ্বে এক মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা তার এই জীবন-সাধনায় অসম্পূর্ণ থাকে, যদি ব্যক্তি-জীবনে স্নেহ-প্রেমে অপূর্ণতা থাকে। শিবনাথের পরিপূর্ণ রূপ ঔপন্যাসিকের অভীপ্সিত ছিল, তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী উপন্যাসের ঘটনা স্রোত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, চরিত্র চালিত হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে একটি মানুষের জীবনের খণ্ডাংশের বিবরণ, একটি দেশের বিশেষ এক অঞ্চলের বিশিষ্ট রূপ এবং একটি জাতির বিশেষ এক সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস পাঠ শেষ করে পাঠকের মনে এর কোনোটিই বিশেষ স্বতন্ত্র রূপে ধরা দেয় না, সব ছাপিয়ে অন্য একটি সুরই বেজে ওঠে। সে সুর শিবনাথ নামে এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এক জীবন-জিজ্ঞাসার, জগৎ সম্বন্ধে এক মহান অনুভূতির। তারাশঙ্কর বাস্তববাদী সাহিত্যিক না রোমান্টিক সাহিত্যিক, এ প্রশ্নের অবতারণা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ।'ধাত্রীদেবতা'য় চরিত্র-চিত্রণ, গ্রামীন সমাজচিত্র অঙ্কন প্রভৃতিতে তারাশঙ্কর নিখুঁত বস্তুচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। আবার উপন্যাসের মূল ভাব বা বক্তব্য এবং পরিণতিতে তারাশঙ্করের আদর্শবাদ সুস্পষ্ট। অতএব শ্রেণীবিচারের তর্কে না গিয়ে দেখা দরকার এর রসাবেদন পাঠকচিত্তে কেমন। উপন্যাসের পরিণামে পিসিমা ও গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের মিলন দেখে একে মিলনান্ত বলা যায় না, কারণ—এই মিলনেই সব সমস্যার সমাধান হয় নি। যদিও পরিণতিতে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, যাতে শোক বা করুণার সঞ্চার হয়, তবুও এক বিষাদকরুণ সুর শেষ পর্যন্ত ধ্বনিত হয়ে ওঠে। শিবনাথের ভাবুকতা ও জিজ্ঞাসা পাঠককে স্পর্শ করে, বিস্মিত ও ব্যথিত করে। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের নামকরণের কথাও বলা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের নাম শুধু প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

গল্প, উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে তাৎপর্য থাকে। উপন্যাসের নামকরণে কখনো লেখকের ব্যক্তিগত রুচি বা প্রবণতা প্রাধান্য পায়, কখনো আবার নামকরণ হয় বিষয়কেন্দ্রিক। কোনো কোনো উপন্যাসে ঘটনা বা চরিত্রের অনুযায়ী নামকরণ হয়, আবার কোথাও ভাববস্তুকে আশ্রয় করে লেখক উপন্যাসের নাম দেন। তারাশঙ্করের অধিকাংশ উপন্যাসই আদর্শপ্রধান, কোথাও চরিত্র প্রধান উপন্যাসে লক্ষণ মিশ্রিত হয়েছে। তাই ধাত্রীদেবতা'কে শিবনাথ নামে একটি ব্যক্তির জীবনেতিহাস না বলে তার জীবনোপলব্ধি বলা যেতে পারে। এখানে কোনো ঘটনা বা চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি, একটি ভাবই সব কিছু মিলিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে। শিবনাথ দুদিক থেকে পরিণত হয়েছে—তত্ত্ব এবং কর্ম। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র গোরা ছাড়া এমন পুরুষ চরিত্র উল্লেখ্য-ভাবে চোখে পড়ে না, যার জীবনে ভাব, আদর্শ বা তত্ত্বের সঙ্গে কর্ম বা আচরণের সংযোগ ঘটে তাকে পরিণতি দিয়েছে। শিবনাথের তত্ত্বগত পরিণতিকে দেখানো হয়েছে বহুবিধ অধ্যায়নের মাধ্যমে ; আর তাকে প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজনীতি, জমিদারী সংকটের মাধ্যমে অর্থনীতি ও প্রজা সমস্যার মাধ্যমে সমাজ-নীতির মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এইভাবেই শিবনাথ দেহে ও মনে সামঞ্জস্য সাধন করেছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে, পরিণতি পেয়েছে। এদিক থেকে 'ধাত্রীদেবতা'কে একটি গঠমান জীবনের কাহিনী বলা যায়, শিবনাথের বিকাশোন্মুখ সত্তার বিবরণ এই উপন্যাসে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি এক স্থানে ঘটবেই, শিবনাথের যাত্রা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পথিক সে, এগিয়ে চলেছে, তার পথ শেষ হয় নি। অন্তহীন তার জিজ্ঞাসা, সব প্রশ্নের উত্তর সে পায় নি, জীবন-রহস্যের সব মীমাংসা তার কাছে হয় নি।

শিবনাথ চরিত্র বা 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস সুগঠিত বা সুসম্পূর্ণ বলা যায় না। অনেক অসামঞ্জস্য, অসংগতি ও শিথিলতা এখানে সন্ধান করলে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব দোষ ত্রুটির কথা বড় করে না বলে যদি বলা যায় যে, একটি ব্যক্তির জ্ঞান-চিন্তা ও কর্মের আলোকে এক মহৎ জীবন-ভাবনাকে প্রতিভাসিত করবার চেষ্টাতেই 'ধাত্রীদেবতা' এক উচ্চাঙ্গের উপন্যাসের গৌরব অর্জন করেছে, তা হলে তার প্রতি অবিচার করা হয় না। 'ধাত্রীদেবতা' তারাশঙ্করের শিল্পসফল রচনা হয়তো নয় কিন্তু তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার ক্রম-বিকাশের মাঝখানে এটি দাঁড়িয়ে আছে। 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'আগুন' থেকে যে যাত্রা শুরু, 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', সন্দীপন পাঠশালা', 'হাঁসুলী

বাঁকের উপকথা'তে তার পরিণতি। নানা পথ পরিক্রমা করে এই যে লক্ষ্যে পৌছনো, এরই মধ্যে আছে 'ধাত্রীদেবতা'। অথচ এতেই শিল্পী তারাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ ঘটিয়ে ছিলেন, এতেই তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রথম সার্থক স্বীকৃতি। অতএব 'ধাত্রীদেবতা' সব দিক থেকেই তারাশঙ্করের রচনাধারায় বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

উল্লেখপঞ্জী :

১। "আমার কথা", তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শনিবারের চিঠি', তারাশঙ্কর সংখ্যা।
২। 'কৈশোর স্মৃতি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। "আমার কথা", তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "শনিবারের চিঠি", তারাশঙ্কর সংখ্যা।
৪। "ভারত শিল্পী তারাশঙ্কর", জগদীশ ভট্টাচার্য, 'শনিবারের চিঠি', তারাশঙ্কর সংখ্যা।

তারাশঙ্কর ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

সরোজ দত্ত

গত ৫০-৫৫ বছরের মধ্যে এমন কতকগুলি বাঙলা উপন্যাস লেখা হয়েছে, যাদের মধ্যে সামাজিক রূপান্তরের চিহ্ন কোথাও আলতোভাবে, কোথাও বা বেশ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কারো হাতে ব্যাপারটা লিখতে লিখতেই এসে গিয়ে থাকবে, আবার কেউ কেউ যে বেশ সচেতনভাবেই ব্যাপারটাকে টেনে এনেছেন, সে-ও বোঝা যায়। পথিকৃৎ সম্ভবতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পথের পাঁচালী" (১৩৩৬) উপন্যাসে প্রথম এরোপ্লেন উড়তে দেখা গিয়েছিল নিশ্চিন্দিপুরের আকাশে। সেখানকার নিরুৎসুক অধিবাসীরা বড় একটা আগ্রহ দেখায় নি ব্যাপারটায়, আর উপন্যাসেও এ-ঘটনার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কুড়ি বছর পরে বিভূতিভূষণ তাঁর "ইছামতী" উপন্যাসে সামাজিক ভাঙাগড়াকে বেশ দক্ষ হাতে আঁকলেও, তার মধ্য থেকে বিভূতি-ভূষণের সমাজ-জিজ্ঞাসার কোনো পরিচয় আমরা পাইনা। সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা স্বীকৃতি আছে। তাঁর "পুতুল-নাচের ইতিকথা" এবং "পদ্মানদীর মাঝি"—দুটি উপন্যাসই প্রকাশিত হয় ১৩৪৩-এ। কিন্তু শশী যেমন গোপালের হাতের অর্বাচীন ক্রীড়নক, কুবেরও তেমনি হোসেন মিয়া-র হাতের পুতুল। দ্বিধা, দুর্বলতা, ভীরুতা, অসহায়তা, গোপন বাসনা, এই শশী এবং কুবের চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। পরিবেশ-পরি-স্থিতিকে আয়ত্ত করবার শক্তির কথা না হয় না-ই ভাবা গেল, তাকে বোঝবার উপযুক্ত ইচ্ছাটাও এদের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। বাইরের চাকচিক্যে শশী-কে কুবেরের তুলনায় একটু বেশি মার্জিত মনে হয় এইমাত্র, অন্যথায় চরিত্রদুটির মূল কাঠামো অভিন্ন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনকথার মধ্যে অন্য যে-সব বৃহৎ তাৎপর্যের কথা ভাবা হয় তার অনেকটাই আরোপিত। বরং বছর চার-পাঁচ পরে "শহরতলী" উপন্যাসের দুটি খণ্ডে তিনি যে-সব চরিত্র নিয়ে তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগ গড়ে তুলেছেন, তারা শশী বা কুবেরের মতো এতটা জড় নয়। সময়ের পরিবর্তনকে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই পায়। ক্রমশঃ আমরা এই ধারাতেই আরো কিছু উপন্যাস রচিত হ'তে দেখি, যেমন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য-র মরামাটি" (১৩৪৮), তারাশঙ্করের "গণদেবতা" (১৩৪৯),

"পঞ্চগ্রাম" (১৩৫০), "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" (১৩৫৪), সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোঁড়াইচরিত মানস"-এর দুটি খণ্ড, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৩৫৬ ও ১৩৫৮। ইতিমধ্যে ১৩৫৭-তে গুণময় মান্না লিখেছেন "লখীন্দর দিগার", ষাট-এর দশকে তিনি সম্পূর্ণ করেছেন দুখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহদায়তন উপন্যাস "জুনাপুর স্টীল" আরো পরে "শালবনী"। অমিয়ভূষণ মজুমদারের "গড় শ্রীখণ্ড"র প্রকাশকাল ১৩৬৩। এই সময়সীমার মধ্যে বা সামান্য আগে পরে লেখা আরো কিছু উপন্যাসের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। অদ্বৈত মল্ল বর্মণের "তিতাস একটি নদীর নাম", সমরেশ বসুর "বি. টি. রোডের ধারে" "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "বারো ঘর এক উঠান" এবং হয়তো মনোজ বসুর "বন কেটে বসত"-কেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আর সাম্প্রতিককালে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর "অরণ্যের অধিকার" এবং "চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর" এই তালিকায় সম্রান্ত সংযোজনা। বেশ বোঝা যায়, জলের বুকে স্রোতের টান ক্রমশঃ প্রখর।

কোনো সন্দেহ নেই যে, কাহিনীর বিষয় নির্বাচন, আবেদন ও পরিণামগত দিক থেকে উপন্যাসগুলির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই বড়। আবার এ-ও বেঠিক নয় যে একটা সাধারণ সূত্রে ধরা যায় ব'লেই উপন্যাসগুলিকে একসঙ্গেই নেওয়া যায়। হয়তো তিতাসের তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে-ভাবে হারিয়ে যায়, উৎসাদিত হবার পরও "বন কেটে বসত"-এর দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী সেভাবে হারিয়ে না গিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জীবনের খোঁজে নতুন বসতি গ'ড়ে তোলে, হয়তো কলে-খাটা করালীর মধ্যে "জুনাপুর স্টীল"-এর বিদ্রোহের দীপ্তি নেই ; হয়তো 'শহরতলী"-র মানুষেরা বারো ঘরের এক উঠোনে জড়ো হ'য়ে অবনমনের ভূমিকাটাকে তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেনা ; এবং হয়তো "মরামাটি" বা "গড় শ্রীখণ্ড"-র মানুষেরা চোট্টিমুণ্ডার মতো ব্যূহ রচনায় তেমন সমর্থ নয়—তা হ'লেও যেখানে তারা অভিন্ন সেটা এই যে এইসব উপন্যাসের মানুষের জীবন চলমান সময়ের আধার হ'য়ে উঠতে পেরেছে। সময় এদের জীবন ছুঁয়ে গিয়েছে কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও অর্থনৈতিক, কোথাও সামাজিক আবার কোথাও বা মিশ্র চলন-ধর্মে। উপন্যাসের নরনারী কেউই আপন অন্তরালে খুব একটা দুর্গম নয়, বরং দেশকালের মাত্রাতেই তাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ। গত পঞ্চাশ বছরে বাঙলা উপন্যাসের একটা প্রবল সত্য চলমান জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-বিধান। স্বভাবতঃই এই বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই তারাশঙ্করের "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"-ও ঐ

বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পাবে।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সমালোচকেরা কয়েকটি বিষয়ে একমত। তারাশঙ্কর তাঁর বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে নিবিড় প্রশ্রয়ে তিনি গ্রামের নীচুতলার মানুষদের কথা বলেন, সেই একই মমতা এবং সহানুভূতি থেকে তিনি কীর্তন করেন পতনোম্মুখ জমিদারতন্ত্রের মহিমা। করালীর মধ্য দিয়ে তিনি নতুন বাস্তবতাকে আঁকতে স্পৃহা বোধ করেন বটে কিন্তু বনোয়ারীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব গোপন থাকে না; কেননা এই পরিবর্তন তিনি ধরবার চেষ্টা করেন শুধুই বুদ্ধির সাক্ষ্য মারফৎ, তার পিছনে তারাশঙ্করের অধ্যাত্মসম্মতি নেই। এই পরিবর্তনের অনিবার্যতার স্বপক্ষে তাঁকে তেমনি উৎসাহিত হ'তেও দেখা যায় না, যেহেতু এই পরিবর্তন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নয়। নিজের অন্ধ, আদিম, বলিষ্ঠ আবেগের সামর্থ্যে তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে চান কালস্রোতের স্বচ্ছন্দ গতিকে। এই আকাঙ্ক্ষার মূলে আছে তারাশঙ্করের নীতি-নিরপেক্ষ অদম্য এক প্রাণ-পিপাসা, সেই কারণে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা ঐতিহাসিক পক্রিয়ায় তিনি বিশেষ আস্থাশীল নন। এখান থেকেই উঠে আসে তাঁর অতীতের প্রতি মোহমুগ্ধ একটা দৃষ্টি, আর ঠিক সেইখানেই এসে তারাশঙ্করের কাছে ব্যাহত হয় নতুন কালের মানুষের উদ্যোগী পুরুষকার। তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনও এই দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক ব'লে মনে করাও হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের সন্তান হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক উদারতার দিকটিও তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে চিত্রিত হ'তে দেখা যায়। সময় কারো মুখাপেক্ষী নয়—একথা ভুলে গিয়ে তারাশঙ্কর যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অভিরুচিকে এতটা প্রাধান্য দেন, তখন তাঁর রচনায় যে মহৎ শিল্পের নির্বিশেষ লাবণ্যের অভাব সূচিত হয়, সমালোচকের প্রখর দৃষ্টি সেখানেও সজাগ।

শুধু যে তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস থেকেই এ-সব কথা মনে আসে তা-ই নয়, তার আত্মকথাগুলিতে, বিশেষ করে "আমার কালের কথা"-য় স্বয়ং তারা-শঙ্করই এই সূত্রগুলিকে তাঁর পাঠক এবং সমালোচকদের হাতে তুলে দেন। যথেষ্ট দার্ঢ্যের সঙ্গেই তিনি সেখানে বলেছেন, তাঁর মন সেকাল-কে কালা-পাহাড়ের ভাঙ্গা-প্রতিমার মতো বিসর্জন দিতে পারে না। অথচ সেকাল নিয়ে যে বড় বেশি গর্বের কিছু নেই, সে-সব কথা তারাশঙ্করই উপস্থিত করেন সঙ্গে সঙ্গে। পরিবর্তন যখন প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এসেছে, তখনই শুরু হয়েছে অর্থ নৈতিক বিপ্লব এবং গ্রামের অর্থ চ'লে গিয়েছে বাইরে। শক্তি-

সামর্থ্যহীন ভীরু দরিদ্র গ্রামের মানুষদের সাধ্য ছিলনা শহরে গিয়ে, কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থেকে সে অর্থ গ্রামে ফিরিয়ে আনা। সে সংঘাত থেকে তাবা বরং পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে পশ্চাদপশরণের মধ্য দিয়ে। শুধু গ্রামের দরিদ্ররাই বা কেন, তাঁর কালের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সেই সাহসের চিহ্নমাত্র দেখেন নি তারাশঙ্কর। বরং এই বিপর্যয় বিকৃতিই এনে দিয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে। তারাশঙ্কর সাক্ষী—তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত ক্লেদ যত পঙ্ক সবই তারা নিক্ষেপ করেছে ঐ হতভাগ্য দরিদ্রদের জীবনে, বিষিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনপাত্র। দেখেছেন তারাশঙ্কর "অসহায় মানুষেরা মানত করেছে, পূজা করেছে, ভাল করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীমা-র নাম করে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম করে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দর নাম করে"। তাদের ঘৃণা করতে পারেন না তারাশঙ্কর, বেদনা অনুভব করেন তাদের জন্যে। আর সেই সঙ্গে সন্ধানে রত থাকেন সর্বগ্রাসী দাহ থেকে কোনো অস্বার্থক প্রত্যয়কে খুঁজে নিতে—যাকে তিনি বলেছেন "নির্মাল্যের সন্ধান"।

নতুন কাল এবং হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবনে সেই কালের প্রতিভূ করালীকে কিন্তু তারাশঙ্কর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এইজন্যেই বনওয়ারীর চোখে মেলে দিয়েছেন এক মুগ্ধদৃষ্টি: "আজই যেন করালীকে সে নতুন করে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্য কুড়িয়ে আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমন সবিস্ময়ে সাগ্রহে সম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তেমনিভাবে তাকে দেখল বনওয়ারী"। ভাবনা তার গড়িয়ে যায় আরও অনেক দূরে: "করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জৎ রেখে সোজা রাস্তায় চলে, তবে করালী হতেই কাহারপাহাড় অনেক 'হিতমঙ্গল' হবে বলেই বনওয়ারীর বিশ্বাস। নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহারপাড়াকে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই ওই কলকারখানার তেলকালি-ভরা অলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কীবহন ছাড়বে, পিতি-পুরুষের কুলকর্ম জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েরাও যাবে পিছনে পিছনে। বনওয়ারী তা হতে দিতে পারবে না। কখনও না। তাই সে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে আদর করে তার আবদার রেখে কোলগত করে নিতে চায়"। সমগ্র কাহার-পাড়ার হিতাহিতের বাইরে বনওয়ারীর ব্যক্তিজীবন বিশেষ নেই। কাহারদের

বসতি যে হাঁসুলীবাঁকে, সেখানকার মাটিতে, মাটির অন্নে বনওয়ারী নিজের প্রাণের গন্ধ খুঁজে পায়, সেখানকার বাতাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস, সেখানকার সূর্যের তেজেই বনওয়ারীর মধ্যে শক্তিসামর্থ্যরূপে ফুটে ওঠে, কাহারদের জীবনের উৎসবেই বনওয়ারীর প্রাণস্পন্দন। এই কাহারপাড়ার তথা কাহারদের হিতার্থেই করালীর শক্তিকে তার দরকার। করালী শক্তিমান। সেই শক্তির অপচয় নিবারণার্থেই মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারী করালীর প্রতি তার শাসনের কাঠিন্য শিথিল করেছে, লঙ্ঘন করেছে কাহারদের ন্যায়শাস্ত্রের বিধান। অন্যথায়, নয়নের সঙ্গে পাখীর ছাড়পত্রের আগেই পাখীকে নিয়ে করালীর শহরে যাওয়া হাঁসুলীবাঁকের সামাজিক বিধানে গুরুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। সেই দণ্ডবিধানের পরিবর্তে মাতব্বর বনওয়ারী পাখী-করালীকে হাঁসুলীবাঁকে ফিরিয়েই এনেছে। সমাজহিতের ভাবনা থেকে তারাশঙ্কর সম্ভবতঃ বনওয়ারী-করালীর একটা সন্ধির কথা ভেবেছিলেন, চেয়েছিলেন পুরনোর সঙ্গে নতুনের একটা সঙ্গতি বিধান করতে।

করালীর শক্তির অপচয় নিবারণের মতো পাখীর ভবিষ্যৎকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার কথাও, মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারীকেই ভাবতে হয়। না হ'লে হাঁসুলীবাঁকের আর এক মেয়ের মতো—সিধুর মতো—পাখীর জীবনও 'আস্তা-কুড়ে' গড়িয়ে যেতে পারে: "সিধু এখন আঁস্তাকুড়ের অন্নের সমান। আঁস্তাকুড়ে যে অন্ন পড়ে, সে অন্ন আর তুলে নেবার উপায় নেই। কিন্তু সে অন্নও তো লক্ষ্মী! তার জন্য মন না কেঁদে তো পারে না"। বিশুষ্ক বা বিশীর্ণ কোনো নৈতিকতা তারাশঙ্করের সংবেদনশীলতার অবসান ঘটাতে পারে না। তাঁর জীবনভাবনার মূলে আছে এই প্রবল সহানুভূতি, অকৃত্রিম মমতাবোধ। অবশ্য গ্রামের জীবনে এই কলুষ যে কাহার-কন্যাদের স্পর্শ করে না এমন নয়। কিন্তু তাকে তারা বিধির বিধান হিসেবে মনে করে ব'লেই একধরণের সহনশীলতার মধ্যদিয়েই কাহারেরা মেনে নেয় তাদের বউ-ঝিদের এই আচরণ। পাখীর মা, বসন, নিত্যরাত্রে বেশভূষা সেরে একাই চ'লে যেত বাবুদের বাগানবাড়িতে। এখনও উচ্চবিত্তদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত গ্লানি এই অন্ত্যজ জাতির মেয়েরাই ধারণ করে—কাহারপাড়ায় সোরগোল জাগে না তাতে। পাপ-পুণ্য, মেয়েদের সতীত্বের মূল্য কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী বোঝে, "কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা, তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সেবা করে

হাড়ি ডোম বাউড়ী কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এ সব। কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার জন্মের এ কর্ম যে স্বীকার করতেই হবে"।

বিধির বিধান ব'লে এসব মেনে নেওয়ার মধ্যে বনওয়ারী তথা কাহারদের আরেকটা আশ্বাসের জায়গাও আছে—"বিপদে আপদে মনিবেরা অনেক কবেন। কাহারেরা স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠে—অ্যানেক অ্যানেক করেন। অসুখে-বিসুখে খোঁজ করেন, কিছু হলে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সা কড়ি ধার দেন, পথ্যের জন্য পুরানো মিহি চাল, আমসত্ত্ব, আচার এমনিতেই দেন, বিঘটন কিছু ঘটলেও তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। রতনদের দুঃখে নিজেও হেদো মণ্ডল কাঁদেন, আপ্তবাক্য বলেন, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, তাতে সত্যই অন্তর জুড়িয়ে যায় রতনদের"। বনওয়ারী, রতন, পরম—মণ্ডল, বাবুমশাইদের 'আশ্চয়' ক'রেই তারা জীবনধারণ করে। তাদের জীবনবোধ বড়ই অব্যবহিত, সেইসঙ্গে তাদের জীবনদেবতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও। তাদের বাসস্থানই তাদের দেবভূমি। সেখানকার বেলগাছে তাদের দেবতা 'কালারদ্দু'র বসত, ভয়ঙ্কর কালসাপ সেই দেবতার বাহন। চেনাশোনার বাইরে কিছু নেই কাহারদের জীবনে; কোনো ভাবের দেবতার অন্বেষণে গরজ বোধ করে না তারা: "এ দুনিয়া আজব কারখানা।···বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যেসী আসে, সবাই ঐ এক কথাই শুনিয়ে যায়। কাহারেরা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরাণ-পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত। মায়ের 'গভ্য'র মধ্যে বসে কারিগর খাঁচা তৈরি করে—হাড়ের শলা তৈরী করে পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেয়, তার মধ্যে ফুড়ুৎ করে এসে ঢোকে একটি পরাণ-পাখী।···তারপরে আবার একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। ভেবে ভেবে কুল কিনারা মিলত না, কাহাররা 'পিতিপুরুষ'-ক্রমে নীলবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে 'পরাণ-পাখী'র আনাগোনার পথের দাগ আর সেই আজব কারিগরের আস্তানা খুঁজত, খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বাবাঠাকুরের বেলতলায় এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে পড়ে বার বার বলত—অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা! কোলের কাছে অন্ধকার, তুমি 'অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে,—আর তোমাকে আমরা খুঁজে মরছি কোথা কোন্ বেহ্মাণ্ডে বেহ্মাণ্ডে"। আসলে ভূমি, নারী, শ্রমসামর্থ্য আর প্রত্যক্ষতা—এই চতুঃসীমার মধ্যেই হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবন বিস্তৃত। আর কোনো ভাবনায়

ভাবিত নয় তারা। নতুনকাল তাদের জীবনকে স্পর্শ করে ঠিকই এবং স্পর্শ ক'রেই ছিটকে দেয় তাদের মূল প্রবাহ থেকে। অতঃপর পার্শ্বস্থ তটরেখায় তাদের অচট জীবন-যাপন, সেইখানেই তারা তাদের কর্মক্লিষ্ট প্রাণ কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখে। এইভাবেই তাদের জীবন হয়ে ওঠে উদাসীন অন্ধ নিয়তির মতো নির্মম সময়ের বিচিত্র রঙ্গভূমি—সময় তাদের প্রাণচঞ্চল করে না, পর্যুদস্ত করে। আর করালী আসে তারই দোসর হ'য়ে।

করালী তাদের স্থিরনিশ্চিত জীবনের ভিত্তিতে আঘাত ক'রেই তাদের বিবশ, বিভ্রান্ত এবং ম্রিয়মাণ ক'রে ফেলে। বাবার বাহনকে করালী পুড়িয়ে মারে, বাবুদের নামে চন্নপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসে নালিশ করে, দরখাস্ত ক'রে সে সজাতির জন্যে প্রয়োজনে কেরোসিনের বন্দোবস্ত করে। মোড়লদের সঙ্গে, বাবুদের সঙ্গে আবহমান কালের সম্পর্কও সে ছিন্ন করতে চায়ঃ "বলি—বেটা কিসের মশায়, বেটা? বলেই সে হন হন করে চলে গেল। বলতে বলতে গেল—বেটা শালা হারামজাদা গুখোর বেটা নেগেই আছে—ভদ্দনোকের মুখে নেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে! অঃ—"

স্পষ্টতঃই করালী 'বিধির বিধান' বলে নম্র নতমুখে এসব মেনে নিতে পারেনা—অভ্যস্ততার বিরুদ্ধে এ তার স্পষ্ট প্রতিবাদ। শিরোধার্য করা নয়, শির তুলতেই চায় করালী। তার কথাগুলি যে নিতান্ত মিথ্যা নয়, কাহারদের মধ্যে এমন একটা চেতনার অস্ফুট অঙ্কুরও দেখা যায়। তথাপি, করালী দৈত্য কিম্বা শয়তান, না কি রাজপুত্র সে, নতুনকালের মাতব্বর—এই সংশয়ে কাহারেরা পীড়িত হ'তেই থাকে। কারণ, তাদের জীবনে বেদ-উপনিষদের অভিজাত দেবতা বা বিশ্বস্রষ্টার কোনো ভূমিকা নেই; কিন্তু তাদের "ঈশ" বা উপাস্য বাবা 'কালারুদ্দু'-র আবাসস্থল যে বেলগাছ, তার নীচের মাটি যে বাবার থান, বাবার বাহন, এমনকি যে-সব প্রভুদের—ঘোষ, চৌধুরী বা মণ্ডলদের—সান্নিধ্যে বা স্পর্শে তারা তাদের লৌকিক দেবতার লোকায়ত স্পর্শ লাভ করে, সে-সব অবহেলা করা মানেই কাহারদের জীবনকে নিঃসম্বল ক'রে দেওয়া—এই শূন্যতায় তারা কেমন ক'রে বাঁচে!

সমাজ-ইতিহাসের দিক থেকে মিথ্যে না হ'তেও পারে যে এই ধরনের জীবনবোধের পিছনে আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাবিহিত শোষণের গোপন চক্রান্ত। মানুষ যেখানে দ্বিপদ প্রাণী মাত্র, সেখানে মানুষের মাপে চাইবার মতো মানসিকতা তারা পাবে কোথায়? তাই ঘোষ-চৌধুরী-মণ্ডলদের 'আশ্রয়'

ক'রেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়—সেই তাদের সৎসঙ্গ, সেই তাদের স্বর্গবাস। উপরে থাকা সংজাতেরাও জানেন, যদি সামান্য দাক্ষিণ্য বিতরণের মধ্যেই অন্ত্যজ শ্রেণীর নির্ভরতার ঘোরটাকে নিবিড় ক'রে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেই সামান্য বিনিয়োগের সুযোগেই পুরুষ-পরম্পরায় তাদের জীবনীশক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অক্ষয় অধিকার বজায় থাকে। এই অবস্থায় তারা ভোলবার অবকাশই পায় না যে তাদের জীবন ঐ সংজাতির চরণসেবাতেই উৎসর্গীকৃত। বরং কালে কালে অনুসৃত হ'তে হ'তে এ-আচরণ এমন একটা মসৃণতায় ফুটে ওঠে যে, এর অন্তস্তলে বঞ্চনার তীক্ষ্ণতাটুকু যায় লুপ্ত হ'য়ে। পরম হরষে ঐ আমসত্ত্ব, মিহিচাল আর আপ্তবাক্যের স্বাদে, তারা অবোধের মতো বুঝে যায়, উৎপাদন করাটাই তাদের কাজ, ভোগের অধিকার শুধু সামন্ত প্রভুদের। ঐতিহাসিক কারণেই এই সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পরির্তন ঘটতে বাধ্য। তারাশঙ্কর যখন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন ভারতবর্ষে এইসব ভাগ্যহতদের বিশ্বাসের ঘোর সবে বিঘ্নিত হ'তে শুরু করেছে। তারাশঙ্কর ইংরেজের উপনিবেশ ভারতবর্ষে সেই পরিবর্তন নিরীক্ষণ করেছেন রীতিমতো উৎসাহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে। কারণ ঐতিহাসিক নিয়মে ফিউডালইজম-এর পরেই ক্যাপিটালইজম্-এর যাত্রা সুরু। ভারতবর্ষ নামক ইংরেজ উপনিবেশে ধনতান্ত্রিক শক্তির বিকাশটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সেই খিন্ন আবির্ভাব যে বিকৃতমূর্তিতে দেখা দিয়েছিল, তাতে শঙ্কিত হবার সমূহ কারণ ছিল।

কোনো স্বাধীন দেশে, পরিবর্তনের সূত্রে, সামন্ততন্ত্রকে সরিয়ে যখন ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তথা সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে তখন ধনতান্ত্রিকতার কুশ্রীতা আর শোষণের মধ্যে বিপর্যয়কর, নির্মম, কঠিন অথচ সবল শক্তির একটা রূপও আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়: "The bourgeoisie, during its rule of scarce one hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all the preceeding generations together. Subjection of Nature's forces to man, machinery, application of chemistry to industry and agriculture, steam navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents for

cultivation, canalisation of rivers, whole populations conjured out of ground—what earlier century had even a presentiment that such productive forces slumbered in the lap of social labour"? ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের যা' কিছু গুরুত্ব তা কেবল উৎপাদনের সহায়ক শ্রমশক্তির আধার হিসেবে। সুতরাং দেখা যায়: "The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physieian, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage-labourers". শুধু সামাজিক সম্পর্কগুলিই শেষ হয়ে যায় তাই-ই নয়, একই সূত্রে বিনষ্ট হ'তে থাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজনির্ণীত পারিবারিক যোগাযোগের সূত্রাবলী: "The bourgeois clap-trap about the family and education, about the hallowed co-relation of parent and child, becomes all the more disgusting, the more, by the action of Modern Industry, all family ties among the proletarians are torn asunder, and their children t ransformed into simple articles of commerce and instruments of labour". যাবতীয় কলুষ বা গ্লানি সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনিবার্যভাবে বা অপরিহার্যভাবে তার মহৎ সামাজিক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। প্রথমতঃ উৎপাদন ক্ষমতার আধার হিসেবে মানুষ তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয়তঃ সম্পর্ক-নিরপেক্ষভাবে মানুষ তার ব্যক্তিগত অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় আর তৃতীয়তঃ সম্পদের অপর্যাপ্ত সমারোহের কিছু না কিছু ফল বঞ্চিতদের জীবনেও বর্তায়। অতঃপর অধিকতর ফললাভের বাসনায়, নিজের অধিকার ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন মানুষ, ব্যক্তিগতভাবে নয় সমষ্টিগতভাবে নিজেদের শক্তিকে সংহত করার ভাবতে শেখে। এইভাবে সংঘশক্তি তাদের জীবনসত্য তথা জীবনীশক্তির প্রতীক হ'য়ে ওঠে। সেখান থেকে তারা যে শোষণমুক্ত, গ্লানিমুক্ত, মর্যাদাবোধসম্পন্ন জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করে, তাকে আর প্রাংশুলভ্য ফলের প্রতি বামনের হাস্যকর বাহু-আন্দোলন ব'লে উপেক্ষা করা ধৃষ্টতা দেখায় না কেউ।

তারাশঙ্করের সামনে যে-সমাজ সত্য ছিল, তার আগাগোড়া কাঠামোটাই

সামন্ততান্ত্রিক—ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের হাওয়া সেই সমাজের এখানে ওখানে ছুঁয়ে গিয়েছে মাত্র। এবং দেশটা যেহেতু তখনও ইংরেজের উপনিবেশ, সেই কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন ক্ষমতার বলিষ্ঠতা এবং ঐশ্বর্যের সমারোহের দীপ্তি সে সমাজে ততটা স্পষ্ট নয়, উপনিবেশ ব'লেই তার কুশ্রীতার দিকটা যত বেশি মাত্রায় এবং প্রত্যক্ষভাবে সেখানে ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে শিল্পপতিদের উদ্যোগ, দেখা যায়, প্রধানতঃ কয়লাখনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং আমাদের অর্থনৈতিক তথা শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পপতিদের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য। স্বাধীন দেশ হিসেবে, ভারতবর্ষে যদি ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটত, ভারতীয় শিল্পপতিদের উদ্যোগের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাধীন সংযোগ ঘটত, তা হ'লে তথাকথিত নীচ বা অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন, বাকি জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একযোগে প্রভাবিত হ'তে পারত। কিন্তু ভারতবর্ষ নামক উপনিবেশে তা হয় নি ব'লেই, এই পরিবর্তন তারাশঙ্করের কাছে কোনো উজ্জীবনের ভূমিকা নিয়ে আসেনি—আসলে এমন কোনো উজ্জীবনের ভূমিকা সেদিন দেশের মাটিতেই সত্য ছিল না। বরং তারাশঙ্কর রীতিমতো সন্ত্রস্ত বোধ করেছেন, কারণ এতদিন সামন্ত-প্রভুরা তাদের আশ্রিত এইসব কাহার, বাউরী, বাগ্দীদের যেটুকু প্রাণের স্পর্শ দিয়ে আসছিলেন, নতুন পরিবর্তনে তা-ও উবে যায়—বনওয়ারীর এতকালের মনিব ঘোষেরা তার ভাগের জমি ছাড়িয়ে নেয়। অতঃপর তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের মৌনমূক মানুষেরা যদি তাদের সামান্যকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, তা হ'লে সেই বোধটুকু সত্যিই যে তাদের জীবন-সংলগ্ন, একথা অস্বীকার করাটা কি খুব ন্যায়সঙ্গত হবে ?

নতুনকালের প্রতিনিধি করালী, সেই বা কোন্ আশার পথ দেখায় ? এটা ঠিক, করালী, কাহারদের অভ্যস্ত জীবনচর্যার আড়ালে যে শোচনীয়তা আছে, তাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করেছে ; বড় রুক্ষ প্রশ্ন তার : "জাত কার আছে ? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে ?···লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্জাতের—ভদ্রলোকের পা চেটে পড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ করে মুখ বুজে সহ্য কর।···কুলকম্ম ! কুলকম্ম তো জাঙ্গলের চাষীদের মান্দেরী কৃষাণি রাখালি ? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা ! পেটে ভাত জোটেনা, পরনে কাপড়

জোটেনা।…তুমি মাতব্বর গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ। লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে পেট ভরে খাবার মত পরবার মত রোজগার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে" ? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয়, এই তবে নতুন কালের শানিত রূপ! যা প্রাচীন অর্থহীন বিচার-বিবেচনাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে! যুক্তির পথে একালের মানুষকে চিরাচরিত বিশ্বাস এবং নির্ভরতার জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের কর্মক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে! ঐ কল-কারখানার শ্রমিক জীবনেই আছে তাদের নিত্য অবমাননা, নিত্য বুভুক্ষা থেকে পরিত্রাণের পথ! কিন্তু পরে পরেই যখন জানা যায় করালীর নামে চুরির নালিশ করে পাখী নিজে, জানা যায় মদের নেশায় সে সমান বেসামাল হয়, দেখা যায় শুধু পাখী নয় অন্য মেয়েমানুষের প্রতিও সে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে লালসাপরায়ণ এবং রক্তের তেজে আর রোজগারের গরমে সে অসুস্থ বনওয়ারীকে ফেলে তারই দ্বিতীয় পক্ষ সুবাসীকে নিয়ে উধাও হয়, তখন কি মনে হয়না ঐ করালীকে আশ্রয় করে কাহারপাড়ার 'হিতমঙ্গলে'র কথা ভাবাটা বনওয়ারীর পক্ষে ভুলই হয়েছিল? আর এ কথা তো জানাই আছে কল-কারখানা আর খনির মালিক শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দেয় বটে, পরিবর্তে তার শ্রম-ই মাত্র নেয়না, সেইসঙ্গে নেয় তার স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, আয়ু এবং মনুষ্যত্বের যা কিছু বৈভব। ঘোষদের বাগানবাড়ীতে অভিসারের শেষে বসন তার হাঁসুলীবাঁকের ঘরে ফিরে আসত, কিন্তু নতুন সভ্যতার সৃষ্টি, নাম না জানা শ্রমিকের টানে করালীর মা কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়; কালোশশীর ঠমকে মুগ্ধ বনওয়ারী শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিধানকে মান্য ক'রে গোপনতার একটা আবরণ টানতে বাধ্য হয় অন্ততঃ, কিন্তু সুবাসীকে লোপাট ক'রে করালী সেই আচরিত জীবন ধর্মকেই লঙ্ঘন করে। অথচ নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে করালী যে ঠিক অবহিত এবং দ্বিধাহীন তেমন কথাও ভাবা যায়না। করালীর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মূল্যবোধকে আঘাত করাটাও সম্পূর্ণ নয়, তা হ'লে আধুনিকতার প্রতিবন্ধক বনওয়ারীর মৃত্যুর পরে সে বনওয়ারীর স্বর্গকামনায় শালকাঠের চিতাশয্যা রচনা থেকে নিবৃত্ত থাকত। আর করালীর অনুসারী হাঁসুলীবাঁকের সেই তরুণ কাহার ছেলেরা? বনওয়ারীর নিষেধ অমান্য ক'রে যারা 'চন্নপুরের' কলের শ্রমিকে পরিণত, তারাও কেন "চন্নপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা

ওই হাঁসুলীবাঁকের দিকে" ? করালী বা তার অনুচরদের এই ধরনের আচরণের অর্থ একটাই—হাঁসুলীবাঁকের জীবনে যাবতীয় অসম্মান সত্ত্বেও মাটি ছিল তাদের পায়ের নীচে, সেখানে অধঃপতিত সেই জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারা পেত কিছু উষ্ণ স্পর্শ। পরিবর্তিত জীবনে অসম্মানের বোঝাটা হাল্কা হয়নি তেমন, বরং সংশয়ে পীড়িত হ'তে হ'তে, বিপর্যস্ত মন নিয়ে তারা হারানো সজীবতার সন্ধানে ফেরে, অর্ঘ্য দিয়ে বসে পুরনো মূল্যবোধকেই। ধনতন্ত্রের স্পর্ধিত অভিযান তাদের চোখে সামন্ততন্ত্রের মন্থরতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে তেমনভাবে মেলে ধরে নি। আবার ধনতন্ত্রের শোষণের পরিণামটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের সংগ্রামী ভূমিকার কথাও তাদের মনে আসেনা। সুতরাং তারাশঙ্কর যদি এই খিন্ন ধনতন্ত্র (Sick Capitalism) এবং তার শীর্ণ প্রতিনিধি করালীর উপর শেষ পর্যন্ত আস্থা হারিয়েই থাকেন, তবে সেটা তাঁর ইতিহাসসম্মত বিবেচনা ব'লেই গণ্য করা উচিত। এই পরিবর্তনে কিছু চমক আছে বড়জোর, নতুন কোনো মূল্যবোধের সন্ধান সেখানে অনুপস্থিত।

কূট তর্ক তোলা যায় অবশ্য। ইতিহাসের পদক্ষেপ, সামাজিক রূপান্তর—সব কিছুকে তারাশঙ্কর যদি তাঁর বুদ্ধির সামর্থ্যেই বুঝে থাকেন, তবে করালীর মতো একটি অপুষ্ট চরিত্রকে কেন তিনি বনওয়ারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত করলেন ? তার থেকে সবল কোনো চরিত্রকে তিনি কালের প্রতিভূ-রূপে আঁকতেও পারতেন। হয়তো পারতেন, তবে সে চরিত্র সত্য হ'ত কিনা সে-বিষয়ে কি নিঃসংশয় হওয়া যায় ? কারণ করালীর থেকে বলিষ্ঠ কোনো চরিত্র তখনকার আধুনিকতার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তো বটেই, দ্বিতীয়ার্ধের এই শেষের লগ্নেও আমাদের সমাজ মূলতঃ সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা প্রকরণ ও বিশ্বাসবোধের অনেক কাছাকাছি। আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন এখনও এমন পরিণতি লাভ করে নি, যা থেকে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব। এবং সেটা যতদিন সম্ভব না হবে, ততদিন লাঞ্ছিত-নিপীড়িতের জয়যাত্রার ছবি অলীক ব'লে মনে হবে। তারাশঙ্কর একা নন, বাঙলা কথা সাহিত্যের শিল্পীরা তাদের সমবেত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই ধারণাটাকেই প্রামাণ্য ব'লে তুলে ধরেছেন। এইজন্যে, বাঙলা উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভের ছবি আছে এখানে ওখানে, কোনো সামগ্রিক সমাজ-বিপ্লবের আয়োজন নেই কোথাও।

অথচ দেখা যায়, তারাশঙ্করকে নিয়েই ক্ষোভটা একটু বেশি মাত্রাতেই

প্রকাশ পায়। কারণটা হয়তো এই একালে তিনিই সব চেয়ে সক্ষম শিল্পী। তিনি যখন ইতিহাসের লিখনের পাঠোদ্ধার করছিলেন, তখন ১৯০০ থেকে ১৯৫০ এর মধ্যবর্তীপর্বে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের দাবি এবং সেইসূত্রে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য থেকে গভীর বাণী শোনবার মতো পারঙ্গমতা দেখাবার অধিকার তো তাঁরই ছিল! এই অভিমানের মধ্য দিয়েই কিন্তু ধরা পড়ে—তারাশঙ্করের লেখায় আমরা শুধু আমাদের আকাঙ্ক্ষাজনিত পরিণামই দেখতে চাই এ কথা ভুলে গিয়ে যে, "যুগকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা, তাহাও সত্য নহে—কল্পনায় সে স্বাতন্ত্র্য যতই ব্যক্তিত্ব মহিমায় মণ্ডিত হোক, তাহাতে কাব্যের উৎকর্ষহানি হয়। কাব্য যতই সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক হোক,—যুগ, জাতি ও দেশের ভাবচৈতন্যের উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে"।

তারাশঙ্করের 'রাধা' : এক আশ্চর্য দ্বৈরথ

তরুণ মুখোপাধ্যায়

১

তারাশঙ্করের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাসগুলির মধ্যে অবশ্যই 'রাধা'র নাম নেই। অথচ 'রাধা'র তন্নিষ্ঠ পাঠককে স্বীকার করতেই হবে, এই উপন্যাসে একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও মহাকাব্যিক উপন্যাসের বীজ দুর্লভ নয়। অন্ততঃ আকারে তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসই যে মহাকাব্যিক, একথা মানতেই হবে। 'রাধা'-ও তার খুব ব্যতিক্রম নয়।

সাধারণ ভাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে বিলুপ্ত প্রায় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে উদীয়মান শিল্পসভ্যতার দ্বন্দ্ব, সামন্তযুগের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ; আঞ্চলিক জীবন ও নীচুতলার মানুষের চিত্র আঁকার দিকে ঝোঁক এবং শাক্ত-বৈষ্ণব সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও মিলন দেখানোর আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। 'রাধা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর তাঁর প্রিয় বৈষ্ণবীয় উপাখ্যানকে নতুন করে তুলে ধরেছেন। যা ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি রসকলি, মালাচন্দন, হারানো সুর, প্রসাদমালা ইত্যাদি গল্পে ও রাইকমল উপন্যাসে। তবে 'রাধা' উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় প্রচ্ছদে শুধু প্রেমের গল্প নয়, একটি ঐতিহাসিক সংকটকালকেও তিনি তুলে ধরেছেন।

'রাধা' উপন্যাসের উৎস সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকই একমত, যে, মহারাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব আচার্য বাংলাদেশে স্বকীয়ামত প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে রাধামোহন ঠাকুর প্রমুখের কাছে অজয়পত্র লিখে দেন ; এরই ভিত্তি-তে 'রাধা' উপন্যাস লেখা হয়েছে।[১] একথা সত্য, অনেক কাল ধরেই আমাদের দেশে স্বকীয়াবাদ ও পরকীয়া বাদের দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে তার পরাজয় নির্ণীত হয়েছিল কিনা, তা' যতটা কিংবদন্তী, ততটা ঐতিহাসিক নয়। অন্ততঃ তারাশঙ্কর যে দলিলটিকে তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি রূপে ব্যবহার করেছেন, আমরা জানি, পরবর্তীকালে তার যাথার্থ্য স্বীকৃতি পায় নি। কেননা অনুরূপ দলিল একাধিক পাওয়া গেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পণ্ডিতেরা তার বিশ্লেষণ করেছেন। সম্প্রতি

(১) বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়—রণেন্দ্রনাথ দেব। পৃ: ১৮১-৮২।

কালের জনৈক গবেষক প্রমাণ করেছেন, আমাদের দেশে কখনোই স্বকীয়া ও পরকীয়া নিয়ে কোনো বিচারসভা বসে নি।[২] দলিলগুলি বিচার করেও তিনি দেখিয়েছেন, সেগুলি জাল।

কিংবদন্তী বা জাল দলিল নিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা যায় কিনা, এরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে। তার উত্তরে আমরা বলতে পারি, সেটা কোনো প্রতিবন্ধক নয়। উপন্যাসে যদি সেই সময়ের দেশ-কাল-মানবজীবন সত্য ও বিশ্বস্ত ভাবে চিত্রিত হয়, তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে বাধা থাকে না। যদিও সেই সঙ্গে দেখা দরকার, সেই ইতিহাস উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনকে কতখানি ছুঁয়ে-ছেনে গিয়েছে।

একথা ঠিক, যে, 'রাধা' উপন্যাসে ইতিহাস বহিরাগত। যদিও সেই ইতিহাসের চিত্রপট অকৃত্রিম, নিঁখুত, জীবন্ত। অষ্টাদশ শতকের এক সামগ্রিক বিপর্যয়েব ছবি তিনি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। যেখানে একদিকে বঙ্গদেশে জাফর খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দৌলার শাসন ; অন্যদিকে ঔরংজীবের পতন নাদির শাহের নৃশংস আক্রমণ। এই বিপর্যস্ত সময়ে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু, সরফরাজখাঁর অযোগ্যতা, আলিবর্দীর হাতে তার পরাজয়। এই হানাহানির মাঝখানে মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থান, বর্গীর হানা, ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্ব। এবং এইসবের ফলশ্রুতি পরবর্তী কালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। যার ইতিহাস 'আনন্দমঠে' ধরা আছে। তারাশঙ্কর তার অব্যবহিত পূর্বের ইতিহাসটুকু নিয়েছেন।

যে সামগ্রিক বিপর্যয় সমগ্র বাংলাদেশকে দুর্বল করেছিল, তারই সুযোগে ছোট ছোট ভূস্বামী, জমিদার স্বায়ত্তশাসনে তৎপর হয়ে ওঠেন ; বেড়ে ওঠে মাৎস্যন্যায় ; শৈব সন্ন্যাসীরা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে বিভিন্ন দলে যোগদান করে। যাকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কেউ কেউ। এই পটভূমিতেই মাধবানন্দের কাহিনী লিখেছেন তারাশঙ্কর। যে মাধবানন্দ বংশীধারী নয়, চক্রধারী কংসারি কৃষ্ণের উপাসক। যাঁর সহচর কেশবানন্দ। এই কেশবানন্দই প্রকৃত রাজনীতিবিদ এবং সক্রিয়কর্মী। তারই প্রচেষ্টায় সমগ্র হিন্দুস্থানের খবর সংগ্রহ, রাজেন্দ্রগিরি গোঁসাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংঘ ও দল সংগঠন সম্ভব হয়েছে। তারাশঙ্কর এই রাজনৈতিক ইতিহাসের নিখুঁত

(২) বাংলার বৈষ্ণবসমাজ, সঙ্গীত সাহিত্য —ডঃ বাসন্তী চৌধুরী। পৃঃ ৩১-৩৯।

ও জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। এমন কি বর্গী বিধ্বস্ত অঞ্চলের যে রূপ মাধবানন্দ ধ্যানে দেখতে পান, তাও আমাদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ বা রক্তাক্ত ইতিহাস ছাপিয়ে ভেসে ওঠে একটি মুখ—প্রেমের মুখ ; যা মাধবানন্দ ধ্যানে, জাগরণে বহুবার দেখেছেন (১০ম পরিচ্ছেদ)। সমগ্র উপন্যাসেও এই মুখই প্রধান। এই একটি মুখের হাসি কান্নায় আন্দোলিত হয়েছেন মাধবানন্দ : জেগে উঠেছে তাঁর সুপ্ত ও ক্ষুধিত ভালোবাসা। জীবনের সকাল ও মধ্যাহ্ন জুড়ে যাকে তিনি বারংবার অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন ; জীবনের অপরাহ্নে এসে তাকেই দিয়েছেন সাদর স্বীকৃতি।

'রাধা' উপন্যাসের নামকরণও বুঝি এই জন্যই যে, 'রাধা' তিনিই যিনি আরাধনা করেন। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছেড়ে দিলেও যাকে সেই মানবিক ও লৌকিক টান-ভালোবাসা : প্রেমের জন্য, প্রেমিকের জন্য অক্লান্ত প্রতীক্ষা আর সাধনা। সেই দুরূহ তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছে কিশোরী মোহিনী। একদিন সারাদেহ দিয়ে যে মাধবানন্দকে সে চেয়েছিল, যার দিকে তাকিয়ে তার আঁচলের জমা পলাশগুলি অজান্তেই নিবেদিত হয়েছিল—ওই পলাশের মতো রাঙা কামনা দিয়ে যে ঘিরতে চেয়েছিল কৃচ্ছ্রসাধক মাধবানন্দকে। উপন্যাসের শেষে দেখি, সেই মোহিনী কামনাকে প্রেমে রূপান্তরিত করেছে ; দেহ হয়েছে মন। সব আরাধনা, সব সাধনা জীবন ও মৃত্যু পেরিয়ে এক পরম মিলনকে আঁকড়ে ধরেছে।

ইতিহাস যে 'রাধা' উপন্যাসের মুখ্যরস নয় তা' আমরা জানি, কেন না, মাধবানন্দ-মোহিনীর দীর্ঘ ইতিবৃত্তে ইতিহাস কোনো নতুন মাত্রা যোগ করে নি, তাদের অন্তর্জীবনকে বিমথিত করে নি। ইতিহাস এখানে চালচিত্র মাত্র। বড়জোর মাধবানন্দের বীর্য প্রকাশের চকিত উদ্ভাসনের পটভূমি। যদিও 'রাধা' উপন্যাসের শুরু থেকেই শক্তির আরাধনাই বড় দেখা গেছে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত শক্তি নয়, প্রেমই এই উপন্যাসের অঙ্গীরস। চক্রধারী কংসারি কৃষ্ণ হাতে তুলে নিয়েছেন বাঁশী। আর সেই সুরে তুচ্ছ হয়ে গেছে রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, বর্গীর বা নাদিরশা'র নৃশংসতা, জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। এই কারণেই মনস্বী সমালোচক লেখেন :

> উপন্যাসটি নামে ঐতিহাসিক হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা অন্তর্জীবনের কাহিনী। ইহার বহির্ঘটনা সমূহ এই অন্তর্জীবনের আবেগচক্রে ঘূর্ণায়িত। ইহার ঐতিহাসিক অংশ অনেকটা বাহির হইতে আরোপিত। ইহার মর্মকথার সহিত শিথিল সংলগ্ন।[৩]

---

(৩) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ ৫৮৯।

যদিও এই সঙ্গে তিনি মনে করেন, 'রাধা' বাঙালীর ধর্মচেতনার বিবর্তনকে তুলে ধরেছে। সেই ধর্মচেতনা যে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদের দ্বন্দ্ব তা, আমরা আলোচনার প্রারম্ভেই জেনে গেছি। ঘটনাটি সত্য বা জনশ্রুতি নির্ভর যাই হোক না কেন, এই উপন্যাসে সেই ঘটনার গুরুত্ব যে প্রবল, একথা মানতেই হয় অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব সমাজের একাংশের ছবি যে নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছেন, এ-ও সত্য কথা। আর সেই ছবি থেকেই উঠে আসেন মাধবানন্দ-র মতো ব্যক্তিত্বময় কঠিন কঠোর সাধক। যিনি তাঁর গুরুদেব কৃষ্ণদেবের পরাজয় মেনে নিতে কুণ্ঠিত এবং একক প্রচেষ্টায় রাধাবিহীন কৃষ্ণের বীর্যময় রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর। শ্যামরূপা গড় তাঁর সেই মহতী ইচ্ছার স্থাপত্য।

'রাধা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই এই নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সকলকে সচকিত করেছে, যাঁর অতীত ঐশ্বর্যময় অথচ যিনি সর্বত্যাগী ; রূপ যৌবনে যিনি অগ্নিকল্প, তিনিই কামিনী-বিদ্বেষী। এই অদ্ভুত বৈপরীত্য-ই নবীন সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছে। চিরদিনের দেহবাদী কৃষ্ণদাসী পর্যন্ত হতবাক্ হয়ে গেছে। কন্যা মোহিনীকে নিয়ে তাঁর পদতলে মাথা নুইয়েছে। কিন্তু মাধবানন্দ ? তিনি এসব থেকে দূরে, উদাসীন। নারীসঙ্গ ও প্রসঙ্গ তার কাছে বিষবৎ। বিরোধ এখানেই। চতুরিকা নিপুণিকা কৃষ্ণদাসী এতখানি পৌরুষ মেনে নিতে নারাজ। তার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে সমস্ত পুরুষই নারীর রূপ-যৌবনে নিমজ্জিত রাধারমণ বা অক্রূর সরকারের লোলুপতার সঙ্গে সে পরিচিত। তাই মাধবানন্দের প্রত্যাখ্যান, ঔদাসীন্য তার কাছে বিস্ময়কর এবং অস্বাভাবিক মনে হয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। নিজের অবসিত যৌবনের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভ হয় কৃষ্ণদাসীর। এবং তখনি দেখতে পায় নবোদ্ভিন্নযৌবনা মোহিনীকে। মাধবানন্দের তপস্যা ভঙ্গের একমাত্র যোগ্য মাধ্যম এই কিশোরী। শুরু হয় প্রেমের, কামের দীক্ষা। নিষ্পাপ কিশোরী হৃদয়ে জেগে ওঠে মাধবানন্দের ভাবগম্ভীর মূর্তি—যেখানে প্রেম আর পূজা একাকার।

…২…

সেই সময়ের বাংলাদেশের ছবিটি তারাশঙ্করের ভাষায় নিখুঁত ভাবেই ধরা পড়েছে—

> বাংলাদেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনে ছিল, জীবনকে সাগরসঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে। ফলে দেশের অবস্থা হয়েছে বিলের মত। মাছেরা যেমন এক্ষেত্রে সাগরসঙ্গমে পৌঁছুতে পারে না, সাগরের স্বাদ পায় না—বিলের জল তলেই চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীমের সীমা, অতলের তল পাওয়ার ভ্রান্ত আস্বাদে বিভোর থাকে —মানুষেরাও তেমনি আচার আচরণ পালনের মধ্যেই পরমপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে।
>
> (রাধা/প্রথম পরিচ্ছেদ/পৃঃ ৫)

এই ঘোলা জলের বুকেই মাধবানন্দের সাদাপালের নৌকা বয়ে গেছে। তাই মাধবানন্দকে ঘিরে লেখক experiment করতে চান, একদিকে তাঁর অতীত জীবন, স্বকীয়া ভজন ; অন্যদিকে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনীর সান্নিধ্য ; বর্গীর ও অক্রূরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ। এভাবেই মাধবানন্দ পেরোতে থাকেন অভিজ্ঞতার স্তর। নিছক সাধন ভজনের বাইরেও তাঁকে যেতে হয় রাজনৈতিক পরিবেশে। সহায় কেশবানন্দ। একসময় সমস্ত ঘটনাই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মাধবানন্দকে শিখণ্ডী রেখে তাঁর শিষ্য কেশবানন্দ সঙ্ঘ দল তৈরী করে। রাজনৈতিক বিরোধ মেতে ওঠে। দ্বিতীয় 'আনন্দমঠ' তৈরী করতে চায় কেশবানন্দ। এবং সেই চরম মুহূর্তেই পর পর ঘটে যায় এমন কতগুলি ঘটনা, যা মাধবানন্দকে সচেতন ও আত্মগ্লানিযুক্ত করে। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ, অক্রূর এবং গোপালনন্দকে হত্যা এবং সেই সঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী-মোহিনীকে কঠোর প্রত্যাখ্যান মাধবানন্দের মনোরাজ্যে বিপ্লব এনে দেয়। অসুস্থতা যার প্রতীকী লক্ষণ। এছাড়া অন্য কোনো লক্ষণ লেখক আমাদের জানান নি। একটানা বারো বছর অসুস্থ মাধবানন্দ ; ষোল বছর ধরে শ্যামরূপাগড় থেকে দূরে আছেন। শুধু এইটুকুই তথ্য তিনি জানিয়েছেন, ফলে উপন্যাসের শেষাংশে প্যারেজীকে দেখে মাধবানন্দর উচ্ছ্বাস একটু অসংগত মনে হয়। বাঁশরীওয়ালী ওরফে মোহিনীকে চিনতে পেরে তাঁর উপলব্ধি—

> আজীবন নিবারিত জীবনসত্যের এ কী মহাপ্রকাশ। আঃ! জীবনের সেই মর্মান্তিক নাস্তিত্ব আনন্দে আশায় সুখে দুঃখে সাধনায় কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।
>
> (রাধা/১৫শ পরিচ্ছেদ/ পৃঃ ৩১৩)

মাধবানন্দের জীবনের সেই 'মর্মান্তিক নাস্তিত্ব' কেন এভাবে পূর্ণ হলো, হওয়া উচিত কিনা, এইসব প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। আর তখনই মনে হয় যে দ্বন্দ্ব চেতনা গল্প-উপন্যাস-নাটকের প্রাণস্বরূপ এখানে তারাশঙ্কর তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারেন নি। প্রসঙ্গত আমরা ভাবতে পারি বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনের' কথা যেখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শাশ্বত সৌন্দর্য, প্রেম অধরা থেকে যায় বলেই, নদীস্রোতে কপাল-কুণ্ডলা ভেসে গেছে। তাকে ঘরে বাঁধা যায় নি। আবার প্রথালালিতর রঘুপতি কিভাবে প্রথা ভেঙে প্রকৃত ধর্মের চিন্ময়রূপ চিনে নিলেন, তাও অস্পষ্ট থাকে না। দুটি ক্ষেত্রেই 'মৃত্যু' জীবনের হিরণ্ময় আচ্ছাদন খুলে দিয়েছে। 'রাধা' উপন্যাসে মাধবানন্দর আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে সর্বপ্রথম। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে যখন তিনি "অকলুষ আনন্দে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মতো নতজানু হয়ে বসলেন, ততক্ষণে কথা বের হলো, তুমি রাধা, আমার রাধা,—তখনই বুঝতে পারি চৌদ্দপরিচ্ছেদ ধরে আমরা যে মাধবানন্দকে চিনি, ইনি তিনি নন। অতঃপর হাতীর পায়ে পিষ্ট হয়ে সর্ব অর্থেই মাধবানন্দর মৃত্যু ঘটেছে। অথচ এই মৃত্যু কিন্তু 'জীবনসত্যের মহাপ্রকাশ' নয়। নয় এই কারণেই, যে মাধবানন্দ প্রেমিক কৃষ্ণকে মানেন নি; স্বকীয়াবাদকে চরম বলে মেনে ছিলেন; এবং তাতে যে সিদ্ধি আসতে পারেনা তা নয়। কারণ শ্রীগীতায় স্বয়ং কৃষ্ণ বলে গেছেন: 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহম্' তাকে যেরূপেই ভজনা করা হোক না কেন, তিনি একই। অথচ তারাশঙ্কর যতক্ষণ পর্যন্ত মাধবানন্দকে মোহিনীর আসনে নতজানু করতে না পারছেন, ততক্ষণ নানাভাবেই মাধবানন্দর জীবন যাপনকে বিড়ম্বিত করেছেন। মাধবানন্দর দৃঢ়তা, সততা, কৃচ্ছ্রতা, বলিষ্ঠতা সমস্তই মূল্যহীন হয়ে গেছে যেন রাধার অভাবে। এটা কখনোই জীবনসত্য হতে পারে না। আসলে 'প্রেম' সম্পর্কে আমাদের মনে যে দ্বৈতমন্ত্রণা, যে যুগল সম্মিলনের ধারণা আছে, তারাশঙ্কর তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। মোহিনী যদি একাই মাধবানন্দকে ভালোবেসে বেসে ক্ষয়ে যেত, ক্ষতি কী ছিল? আর মাধবানন্দ তার ধ্যানে জাগরণে যে মুখ ভুলতে পারেন নি, অথচ ভুলতে চেয়েছেন—এই কঠিন দ্বন্দ্বে বিক্ষত হলেই বা তাঁর গৌরব কম হতো কি? আসলে তারাশঙ্কর একটি ধর্মীয় প্রেরণাকে বলবতী করতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণদাসীর অভিশাপ। সর্বোপরি লেখকের বৈষ্ণবীয় প্রেম সম্পর্কে ধারণা ও এই ট্রাজিকমেডির সৃষ্টি করেছে। মহাকাব্যের সুর ও গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে।

'রাধা' উপন্যাসের মধ্যে মহাকাব্যত্ব রয়ে গেছে, বলে কারো মনে হতেও পারে। কেননা, এই উপন্যাসের আয়তন নগণ্য নয়। অন্যদিকে অজস্র ঘটনার সমাবেশ, অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনা, চরিত্রগুলির অকৃত্রিমতা ইত্যাদি অনেক সময় একে মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রান্তসীমায় নিয়ে গেছে। অন্ততঃ 'রাধা' উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠককে বারংবার বিস্ময়ের সম্মুখীন হতেই হয়। ঠিক যেমনটি বলেছেন ওয়াল্টার স্কট—

The epic poem and romance of cbivalry transport us to the world of wonders, where supernatural agents are mixed with human characters. [4] ইত্যাদি। সাধকদের নানা অলৌকিক ক্রিয়া কাহিনী, শেরিনাবেগমের আত্মবিসর্জন, কৃষ্ণদাসীর 'বাট' বওয়া, উন্মত্ততা, এমন কি মাধবানন্দ-মোহিনীর মৃত্যুও বিস্ময়রসের আকর। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক জীবন ও নিসর্গ চিত্রের সুন্দর, মহৎ রূপও এই উপন্যাসকে মহাকাব্যিক মাত্রা দিয়েছে। তথাপি এই উপন্যাস 'মহাকাব্যিক' নয়। কেননা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু কখনোই মহান, ভাবগম্ভীর নয়। সমগ্র উপন্যাস পাঠের পর তার মধ্যে আমরা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা কখনোই পাব না। বরং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেড়ানেড়ী সমাজের একটি জীবন্ত আলেখ্য বলেই মনে হয়। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ যদি 'রাধা' উপন্যাসের অবলম্বন হতো, তাহলে অন্ততঃ মহাকাব্যিক উপাদান হিসেবে তা' গ্রহণ করা যেতো, এখানে তা' হয়নি। এই উপন্যাসে অজস্র চরিত্র ও ঘটনা আছে ঠিকই ' কিন্তু মূল কাহিনী অর্থাৎ মাধবানন্দ ও মোহিনী কাহিনীকে' তারা পুষ্ট করে নি। আপন স্বভাবধর্মে-ই মাধবানন্দ ও মোহিনী বিকশিত হয়েছে। 'নায়কগৌরব' যদি মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে মাধবানন্দ সেই নায়ক। কিন্তু মোহিনী কি যোগ্য নায়িকা? সংশয় থেকে যায়, তবে মাধবানন্দের জন্য মোহিনীর নিষ্ঠা, প্রতীক্ষা, সাধনা ও আরাধনার ঐকান্তিকতা স্বীকার করতেই হয়। 'রাধা' উপন্যাসের নামকরণ সম্ভবতঃ এই আরাধনার জোরেই। অথচ মাধবানন্দ চান দেহ নয় আত্মা, প্রেমের তারল্য নয়, জ্ঞানের কাঠিন্য; মত্ততা নয়, বীর্যবত্তা। এরই সঙ্গে যুদ্ধ করেছে মোহিনী এবং এই অসমযুদ্ধে বিজয়িনী সে। বারংবার "মহাভারত" ও "কুরুক্ষেত্রে"র উল্লেখ করা সত্ত্বেও রাধা, ঈপ্সিত মর্যাদা পায় নি।

(4) Novelists on the novel by Miriam Allott' p. 49

একটি সুখপাঠ্য প্রেমের উপন্যাস রূপেই তার আদর। ঐতিহাসিক ঝঞ্ঝা শুধু দোলা দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তার জন্য এই প্রেমের কাহিনী বিচলিত হয় নি, অন্যান্য বৈষ্ণব জীবনকেন্দ্রিক গল্প বা উপন্যাসে তারাশঙ্কর যে ভাবে প্রেমের, জীবনের জয়গান করেছেন, আনন্দকে বরমাল্য দিয়েছেন, 'রাধা' উপন্যাস তার ব্যতিক্রম নয়।

...৩...

তথাপি 'রাধা' উপন্যাস চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে মাধবানন্দের জন্যেই। মাধবানন্দের চারিত্রিক দার্ঢ্য, আত্মবিশ্বাস, আত্ম-বিক্ষোভ, প্রবল পৌরুষ—পাঠককে অভিভূত করে। একা কুম্ভের মতো স্বকীয়াবাদের 'নকলবুঁদিগড়' রক্ষার জন্য তাঁর প্রাণপণ প্রচেষ্টা আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। হয়ত এই জন্যই 'রাধা'-র কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ আমরা মেনে নিতে পারিনা; 'ঝড়ে ভগ্নশীর্ষ বনস্পতির মতই মনে হয় তাঁকে।' এক অসম দ্বৈরথের পরাস্ত সৈনিক তিনি।

চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণদাসীও যথেষ্ট মনোহর। তার দাপট, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, যৌবন-বিলাস 'রাধা' উপন্যাসে বারংবার আলোড়ন এনেছে। ঝোড়ো মেঘের মতই কৃষ্ণদাসী এই উপন্যাসকে গতি দিয়েছে। একটি ক্ষীয়মান এবং ভ্রান্ত প্রথাকে, বিশ্বাসকে যেভাবে সে আঁকড়ে ধরেছে, পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছে এবং শেষপর্যন্ত উন্মাদ হয়েছে, তা রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতই। তার নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও কর্তা মোহিনীকে দিয়ে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছে; মাধবানন্দকে রাধা ভজনায় প্রবৃত্ত করতে চেয়েছে এবং পেরেছে। শাস্ত্রচর্চা কামকলা, সঙ্গীত, রূপচর্চা সব কিছুতেই সে তার মেয়েকে নিপুণিকা করে তুলেছে। তার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য "তপস্বী ও তরঙ্গিনী"-তে লোলাপাঙ্গী তার কন্যাকে যা বলেছিল সেই কথা কৃষ্ণদাসীরও—*

> শোন ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্বী হতে পারেন, কিন্তু তাঁরও দেহ রক্ত মাংসে গড়া...
>
> অনাবৃষ্টির আকাশে যেমন মেঘ, তেমনি হবে তাঁর হৃদয়ে তোর উদয়।
>
> একটি মাত্র আঙুলে যদি স্পর্শ করিস তা হবে তপ্ত পৃথিবীর বুকে

---

* দ্র. 'রাধা' উপন্যাস, পৃ. ৮৭-৯২।

জলবিন্দুর মতো। ধীরে ধীরে তুই বৃষ্টি হয়ে নেমে আসবি, তাঁর ধ্যানের পাষাণ গলে যাবে, আর তখন—তিনি একদিন তপস্যা করে যা পান নি, তুই তাঁকে দিবি সেই ব্রহ্মানন্দস্বাদ।

[প্রথম অঙ্ক। পৃঃ ২৭]

আমরা জানি, মাধবানন্দর প্রতিজ্ঞা ও সাধনার পাষাণ মোহিনীই গলিয়ে দিয়েছে। অবশ্য একদিনে তরঙ্গিনী যা পেয়েছে তার জন্য মোহিনীকে ষোল বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু সার্থক হয়েছে।

যুঁইফুলের মতো স্নিগ্ধ, অপাপ সুন্দর কিশোরী এই মোহিনী। মায়ের পাপ পঙ্কিলতা তাকে স্পর্শ করেনি। কখনো সে ভাবেনি নবীন গোঁসাই তার মৃগয়া। মাধবানন্দকে সে তার কুমারী হৃদয়ের প্রথম ভালোবাসা অর্পণ করেছে যা দেবভোগ্য। এই জন্যই কয়ো-র সঙ্গে তার বিবাহ হতে পারে, মাধবানন্দের এই প্রস্তাব তার কাছে অশুচি মনে হয়েছে। কেননা, সে জেনেছে মাধবানন্দ সেই পুরুষ—নারীর যাকে কামনা করে; যে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে লাভ করার জন্যই মোহিনীর দুশ্চর তপস্যা, কঠোর আরাধনা প্রাপ্তির মুহূর্তেও তাই সে উচ্ছল নয়, কামার্ত নয়। অথচ মাধবানন্দ সেখানে বিহ্বল, বিবশ। মাধবানন্দর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে-ও প্রাণত্যাগ করেছে। এই ঘটনার মধ্যে যতখানি অলৌকিকত্ব আছে, তার চেয়ে বেশি আছে প্রেমের পবিত্রতা। যে আশা, যে স্বপ্নকে নিয়ে মোহিনীর প্রতীক্ষা, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রয়োজনও তার কাছে ফুরিয়ে গেছে। 'রাধা' উপন্যাসের ধর্মীয় প্রচ্ছদ মোহিনীর মানুষী প্রেমের কাছে হৃতগৌরব।

বৈষ্ণবজীবন-কেন্দ্রিক তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে 'কয়ো'র মতো একটি অদ্ভুত চরিত্র ঘুরে ফিরেই আসে—যারা না মানুষ গোছের। অথচ এক আদিমতা, ভালোবাসার স্বচ্ছতা এদের স্বতন্ত্র করেছে। 'রাইকমল' উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক। সেখানে কমলও তার মা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুদর্শন রসিকদাস বাবাজী ওরফে 'বগ বাবাজী' এই বগবাবাজীর আচরণ বকের মতো বলেই, এই অদ্ভুত নামকরণ। 'রাধা' উপন্যাসেও মোহিনী-কৃষ্ণদাসীর ঘরে ঠাঁই পেয়েছে 'কয়োবোরেগী'—যার স্বভাব কাকের মতো। সে খাবার ও খবর দুইই খুঁটে খায়। মোহিনীকে ঘিরে কুদর্শন কয়োর মনে অদ্ভুত মমতা। সর্বদা তাকে ঘিরে রাখে সে। কয়ো জানে মোহিনীর প্রতি তার এই মমতা কেবলই বাৎসল্য নয়; তা ভালোবাসা, কিন্তু বেল পাকলে কাকের কিছুই লাভ নেই, এই সত্যও তার অজানা নেই, তারাশঙ্করের অদ্ভুত সৃষ্টি এই কয়ো;

যে শুধু প্রতিদানহীন, শর্তহীন ভালোবেসে যায়; ভালোবাসার জন্য মরতে পারে; অথচ সেই ভালবাসা জানাতে চায় না আভাসেও, রবীন্দ্রনাটকে এই ধরণের নিঃশর্ত প্রেমিকের চিত্র-আমরা পেয়েছি; যেমন 'শ্যামা'র উত্তীয়; 'রক্তকরবী'-র কিশোর, এরা অবশ্য প্রেমিকার উদ্দেশ্য সাধনে নির্জিত হয়েছে। কিন্তু মোহিনী কখনোই কয়োকে স্বার্থ-পূরণের কাজে ব্যবহার করেনি। বরং কয়ো-র জন্য তার মনে বিপুল সহানুভূতিই লক্ষ্য করা যায়। কয়ো জানে,মোহিনী তার জন্য নয়; তাই মাধবানন্দর কাছে বারংবার সে মোহিনীব প্রসঙ্গ তোলে, যাতে নবীন গোঁসাই মোহিনীকে গ্রহণ করে। মাধবানন্দের মনে মোহিনীর জন্য যদি কোনো দুর্বলতা এসে থাকে, তবে তার জন্য কয়োর ভূমিকাই প্রধান। অন্যদিকে নবীন গোঁসাই-এর জন্য মোহিনীর মনে স্বপ্ন গড়ে তোলার কাজটিও কয়োবোরেগীই করেছে। অথচ কয়ো-র পরিণতি অত্যন্ত করুণ। 'রাধা' উপন্যাসে 'জীবনের অন্তর্লীন গভীর বিষাদ অনুভূতির কথা'[৫] আছে বলে কোনো কোনো সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন, মনে হয়, কয়োর চরিত্র সেই বিষাদের অন্যতম প্রকাশ, এই উপন্যাসের একমাত্র শুচিশুদ্ধ গোপন প্রেমিক কয়ো। সে দিয়েছে অনেক; পায় নি কিছুই।

চরিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব ছাড়াও 'রাধা' উপন্যাস প্রকৃতির আলেখ্য রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম, পঞ্চম ও দশম—অন্তত: এই তিনটি পরিচ্ছেদে প্রকৃতির বিধুব-মধুর ছবি তিনি এঁকেছেন। 'রাধা' উপন্যাসের পটভূমি তৈরী করাব ব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদের প্রকৃতি বর্ণনার গুরুত্ব যথেষ্ট। সকালবেলার সুরটি যেন সেই বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে; আর তারই প্রতিনিধিত্ব করেছে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী। প্রকৃতির মনোহারিতা শেষপর্যন্ত রূপ পেয়েছে নবীন-গোঁসাই-এর দীপ্র অবয়বে। দশম ও ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রকৃতি সৃষ্টির তথা মিলনের মহোৎসবে মত্ত। সেই কামনার্ত প্রকৃতি মাধবানন্দের উদাসীনতাকে ছিঁড়ে দিয়েছে কাম ও আনন্দের যুগলপ্রকাশ তাঁর মনে এনেছে 'একটি কিশোরীমুখ' ধিক্কার দিয়েছেন নিজেকে; তবু চোখ ফেরাতে পারেন নি। মোহিনী যে মাধবানন্দ-কে জয় করতে পেরেছে, তার মূলে প্রকৃতির মন্ত্রণা-ও যথেষ্ট ছিল। উপন্যাসের শেষে অসুস্থ মাধবানন্দ মোহিনীর কাছে যা পেয়েছেন—'সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত, শুশ্রূষার অমৃত'—আর আয়োজন

(৫) তারাশঙ্কর—হরপ্রসাদ মিত্র, পৃ. ২১৫

এই নিসর্গ প্রকৃতিরই। প্রেমসাধনা তথা পরকীয়াতত্ত্ব প্রসঙ্গে মোহিনী যখন শেষমুহূর্তে মাধবানন্দ-কে নানা কথা বলে, তার ভিতরেও প্রাকৃতিক উপমা এসে পড়ে।

দেহের মধ্যেই যে বেঁচে থাকা গোঁসাই দেহ
আমার মূল, পরমাত্মা আমার কূল! [পৃঃ ৩০৯]

তার সত্তার তৃষিত শিকড়ে মোহিনী যে জল চেয়েছে, সেই তৃষ্ণাহারীর নাম মাধবনান্দ। একদিকে থেকে দেখতে গেলে 'রাধা' উপন্যাস দেহ আর মনের মিলনেতিহাস। কর্তা ভজারা (সহজিয়া বৈষ্ণবদের শাখা) যেমন ভাবেন: রাধা = তনু; কৃষ্ণ = মন,[৬] এখানে ও দেখি মোহিনী (দেহ) চেয়েছে তার ইষ্ট-কে, মাধবানন্দকে (মন)। দেহী মোহিনী 'মনোময়' হয়েছে; মনোময় মাধবানন্দ 'দেহী' হয়েছে। মাধবানন্দের চারিত্র্য গৌরবের দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে, এই মিলন বুঝি গোষ্পদে আকাশের প্রতিবিম্ব। তবু অস্বীকার করা তো যাবে না, আকাশ গোষ্পদেই ধরা দিয়েছে।

তারাশঙ্করেব ভাষাব্যবহার নিয়ে অনেক সমালোচকই ক্ষুব্ধ। এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে এইটুকু বলা যেতে পাবে, আগাগোড়া একটি কবিত্বের আমেজ তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছেন ভাষার মধ্যে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বর্ণনা শিথিল, অসংলগ্ন, কখনো বা অব্যয়ের ব্যবহার দৃষ্টিকটু (১০ম পরিচ্ছেদে 'ওঃ' অব্যয়ের ব্যবহার ও বর্ণনারীতি দ্র.)। এইসব অনতিলক্ষ্য ক্রটি বাদ দিলে আগাগোড়া উপন্যাসটির ভাষা ললিতে কঠোরে উপভোগ্য; বর্ণনা আন্তরিক, স্বাদু। উপন্যাসটির রীতিবিচারে অনেক সময় পূর্বসূরীদের প্রভাব অসহ্য লাগে। যেমন, ১৭৭ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণদাসীর অভিশাপ—মাধবানন্দকে রাধাবাদী হতেই হবে—এবং উপন্যাসের সমাপ্তিতে মাধবানন্দর রাধাস্বীকৃতি কেবলই বঙ্কিমচন্দ্রের টেকনিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার শিষ্য কেশবানন্দকে হানাহানি থেকে মুক্ত হতে বলে মাধবানন্দ যখন উপদেশ দেন: "আর অন্ধকার নয়— আলো জ্বালো, জীবনে জীবনে আলো জ্বালো; আলোয় আলো হয়ে উঠুক;" তখন শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে বিশ্বেশ্বরীর আর্তি মনে পড়ে যায়। উপন্যাসে অলৌকিকতার সমাবেশেও তারাশঙ্কর সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই ঋণী।

তবু 'রাধা' উপন্যাস তারাশঙ্করের বলিষ্ঠ হাতেরই রচনা তাঁর বর্ণনাকৌশল, কাহিনী বয়নের চমৎকারিত্ব, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্য সংশ্লেষ

(৬) কর্তা ভজা ধর্মমত ও ইতিহাস—সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত।

পাঠককে বিস্মিত, নীরব করে রাখে। প্রেমের উপন্যাস হয়েও 'রাধা' ছকবাঁধা, গতানুগতিক নয়। এক বিচিত্র জটিল কামনা কিভাবে ধর্মের আচ্ছাদনে লেলিহান হলো, কিভাবে একটি মানুষ ব্রত পালনের কৃচ্ছ্রতা থেকে ব্রত ভঙ্গের দুর্গমতা পার হলো—তারই ইতিহাস আর ভাষ্য এই 'রাধা'। কামের তীব্রতাকে প্রবল প্রেমে, আলিঙ্গনের আনন্দকে আশীর্বাদ ও প্রণামে রূপান্তর করেছেন তারাশঙ্কর। হয়ত এই রূপান্তরের স্তরবিভাজন স্পষ্ট কার্যকারণযুক্ত হয়ে ওঠে নি সবসময়; তবুও সব মিলিয়ে 'রাধা' সুখপাঠ্য; চিত্তাকর্ষক। মাধবানন্দের ব্রত ভঙ্গ আর মোহিনীর ব্রতপালনের সাক্ষ্য একই সঙ্গে পাঠকের দুই চোখে হাসি ও কান্নাকে ফুটিয়ে তোলে। 'রাধা'-র পাঠকের কাছে এটাই বড় পুরস্কার; সান্ত্বনা ॥

গণদেবতা পঞ্চগ্রাম ঃ কালের মন্দিরা ও ব্যক্তির ছন্দ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস তার সার্থকতম শিল্পসিদ্ধির কালে যে পরিমাণে কল্পনা সমৃদ্ধ সে পরিমাণেই বাস্তবসম্বন্ধ। যে কোনো উপন্যাসের নির্ভুল অভিজ্ঞান এই সূত্রের আলোকেই অনুধাবনীয়। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে তারাশঙ্করের সমাজ-দৃষ্টি আলোচনাকালেও মনে রাখি, এখানে সমাজদৃষ্টি সমাজতত্ত্বের খোঁজ খবরে তৎপর নয়, এখানে সমাজদৃষ্টি শিল্প উপাদান মাত্র। তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাস-গুলিব সঙ্গে পরিচয় একথাই জানায়, তিনি সামাজিক বিবর্তনের তথ্য ও সূত্র দুই সম্বন্ধেই যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হল এই সব সম্বন্ধ সম্পাতের ভিতর দিয়ে যে সব ব্যক্তিপাত্র 'ইমার্জ' করেছে তাদের বিষয়ে লেখকের সচেতনতা। এই জন্যই 'চরিত্রসৃষ্টি' কথাটি অপেক্ষা আমরা 'চরিত্র-কল্পনা' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে পটপাত্র বিশ্লেষণ করে আমরা দেখব তারাশঙ্কর কী ভাবে কতটা সে কল্পনা ও বস্তুজ্ঞানের অন্বয় ঘটালেন।

(২)

'গণদেবতা', শুধু তারশঙ্করেরই নয়, বিংশশতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা, তথা, ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস। একটা দেশে একটা জাতির মোড় ফেরার আশ্চর্য আলেখ্য এই উপন্যাস। আশ্চর্য এই ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ, ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান। এই ছন্দের নায়ক দেবু ঘোষ শুধু অব্রাহ্মণ নয়, চাষীর ঘরের ছেলে। গ্রামীণ এলিটদের সম্বন্ধে, গ্রাম-অর্থ-নীতির তৎকালীন প্যাটার্ণ সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান তীক্ষ্ণ। ছিরে ঘোষের মতো চরিত্র-কল্পনার সাহায্যে তারাশঙ্কর আমাদের ঠিকই ধরিয়ে দেন যে,ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সত্ত্বেও গ্রামীণ হিন্দুসমাজে একটা open status group-এর সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও গ্রামে 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেনি। 'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর মহৎ ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত নিরপেক্ষতায় ও নিরাসক্তিতে ছিরু পালের শ্রীহরি ঘোষের রূপান্তরের কথা এবং তার নবার্জিত শ্রেণী চরিত্রে চিহ্নিত হওয়ার চলচ্ছবি বর্ণনা করেছেন। অদূরবর্তী কঙ্কণার ব্রাহ্মণ বাবুদের শ্রেণী চরিত্র কথাও বাদ যায় নি। সময়চাকার ঘূর্ণনে ইতিহাসের

প্রাণ পুরুষ পরিবর্তনের চাপে চাপে নতুন নতুন মূর্তি রচনা করছিলেন কুম্ভকারের মতো। খুব শিথিল ভাবে একথা বলা হয় যে, তারাশঙ্করের লেখবার বিষয় অনেক ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন না কীভাবে লিখতে হয়। 'গণদেবতা' উপন্যাসের structure বা কাঠামো লেখকের বিষয়বোধ ও শিল্পজ্ঞান দুয়েরই নিদর্শন। আন্তরিক স্বোপার্জিত জীবনবোধ ছাড়া এমন কাঠামো-গড়া স্বতঃই অসম্ভবই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছদটির তাৎপর্য অশেষ। যা দীর্ঘকাল ধরে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়িত, বাইরের ছোটোখাটো আঘাতেই তার অঙ্গাবরণ কেমন ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে, উন্মোচিত হয়েছে তার দৈন্যদশা। গ্রামীণ অর্থনীতির পুরাতন প্যাটার্ন বিদায় নিচ্ছে—পরিচ্ছেদের পঞ্চায়েত মজলিসে বিদায়ের পদ-ধ্বনিটি স্পষ্ট। দ্বারিককে শ্রীহরির অপমান নিষ্ঠুর অনিবার্যতা।

"নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার সবাই আমাদের (গিরিশ-অনিরুদ্ধের) ধুয়ো নিয়ে ধুয়ো ধরেছে—ওই অল্প ধান দিয়ে আমরা কাজ করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জুন তলায় খান কয়েক ইট পেতে বসেছে বলে পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও"—এ শুধু গ্রামীণ পুরাতন সমাজে ধাতব মুদ্রামানের প্রতিষ্ঠা নয়, একটা যুগসন্ধির মুখোমুখি প্রাচীন গ্রামসমাজের রূপান্তর-উদ্যত চেহারা? চার্লস মেটকাফ্ প্রশংসিত সেই গ্রামসমাজ—(they seem to last where nothing else last)—যে সত্যই অপরিবর্তন নয়, ঐ মন্তব্যে যে ইতিহাসের ভুল পাঠ, গণদেবতা উপন্যাসের প্রথমার্ধ তার প্রমাণ। মনে রাখি আমরা তারাশঙ্কর সমাজ বিজ্ঞানী নন—ঔপন্যাসিক, শিল্পী কাজেই সমাজ-তথ্যের অনুপুংখ বিশ্লেষণ যেমন Elite conflict in a plural society Twentieth Century Bengal-এর মতো গ্রন্থে J. H. Broomfield-এর মতো লেখকরা দিয়েছেন, তা তাঁর গ্রন্থে মিলবে না। কিন্তু তারাশঙ্কর জীবন সন্নিহিত মহৎ ঔপন্যাসিক বলেই তিনি যা দেখেছেন, বুঝেছেন, তা আরও বেশী অন্তরময় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। ঔপন্যাসিক তো সমাজ তাত্ত্বিক নন—তিনি শিল্পী।

সেটেলমেণ্টে বাধা দিয়ে দেবু ঘোষের কারাবরণ পর্যন্ত উপন্যাসটি চলেছে এক লয়ে। লয় বদল হয়েছে এই কারাবরণের ঘটনার পর থেকে। কারা-বরণের আগে পর্যন্ত গ্রামের ঘটনাগুলির একটাই ব্যাখ্যা—বর্ণপেশাভিত্তিক গ্রামসমাজ অদূরের উঠতি জংসন শহরের ধাক্কায় কেমনভাবে আলোড়িত হচ্ছে, কেমনভাবে আর্থিক সম্পর্কগুলির রদবদল হচ্ছে, রূপান্তর হচ্ছে, তীক্ষ্ণতা পাচ্ছে

বিরোধগুলি। দেবু ঘোষের কারাবরণের কালে,—'ওয়েট! চণ্ডী-মণ্ডপের নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করিল হরেন ঘোষাল! তাহার হাতে একটি অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা।' মালাখানি সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিল—'জয় দেবু ঘোষের জয়। মুহূর্তে ব্যাপারটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।' শুধু এই ব্যাপারটাই নয়, গোটা গ্রামটির চেহারাও পালটাতে শুরু করল। সামাজিক ঘটনাধারা এবারে সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাধারার রূপ নিতে চলল। সেটেলমেন্টের কানুনগো যেন ভারতবর্ষের বিপুল গতিবেগের সঙ্গে গ্রামটির গ্রন্থিবন্ধনের ঘটক। 'তুই আপনি'র ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, লক্ষণীয় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তেও করালীর সঙ্গে বাবুদের এমন তুই-তোকারির ঘটনার ব্যবহার করা হয়েছে। তুচ্ছার্থক 'তুই' সম্বোধনটিকে তারাশঙ্কর সামাজিক তাৎপর্যে প্রয়োগ করলেন।

শ্রীহরি পালের 'ঘোষ মশায়' হয়ে ওঠা উপন্যাসের এক দিক, ন্যায়রত্নের মহিমার অস্ত-গমন উপন্যাসের আর একদিক। উপন্যাসে অন্তর্জগত ও বহির্জগতের টানা পোড়েনে দুর্গার ভাবান্তর এক আশ্চর্য অথচ অনিবার্য ঘটনা। যতীন যথাযথ বাস্তবতায় প্রক্ষিপ্ত চরিত্র। দ্বারকা চৌধুরী গ্রাম জীবনের ভাঙ্গা-চোরার ভেতর দিয়ে একটা সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকলেন। চরিত্রটিকে লেখক আরেকটু বেশী মাত্রা দেবেন এটা প্রত্যাশিত ছিল।

অনুবর্তী উপন্যাসে 'পঞ্চগ্রাম'-এ তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকাকে আরো বিস্তৃতি দিয়েছেন ভৌম অর্থনীতিক সম্পর্কের জট ও জটিলতাকে আরো প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। ঈদ সামনে। রহম শেখ একটা তালগাছ কেটেছিল, বিক্রি করে দেবে বলে। 'গাছটা তাহাদের সংসারের বড় পেয়ারের গাছ। তার দাদু গাছটা লাগাইয়া দিয়াছিল।' 'এ গাছ বেচিবার কল্পনাও কোনোদিন রহমের ছিল না। কিন্তু এবার সে বড় কঠিন ঠেকিয়াছিল।' 'একটা কথা কিন্তু রহমের মনে হয় নাই। সেইটাই আসল কথা। তিন পুরুষের মধ্যে ওই গাছটার স্বামীত্বের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কথাটা তাহার মনেও হয় নাই।' 'তাহার বাপ শেষ বয়সে ঋণের দায়ে ওই জমি বেচিয়া গিয়াছে কঙ্কণার মুখুয্যে বাবুকে।' 'রহমের বাপ বিক্রি করিবার পর—বাবুর কাছে জমিটা ভাগে চষিবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার বাপ জমি চষিয়া গিয়াছে—রহমও চষিতেছে। কোনদিন একবারের জন্য মনে হয় নাই, জমিটা তাহাদের নয়।' 'গাছটা তাদের নয়' একথা শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'-রচনায় রসিক বা

কাঙালীরও মনে হয় নি। ঘটনাংশের এই সামান্য মিলটুকু মনে রেখে একটা কথা এখানে বলার আছে। তারাশঙ্কর এ জাতীয় ঘটনা চিত্রণের বেলায় ব্যাপারটিকে দিতে চেয়েছেন 'বাবু, এবং 'অ-বাবু'-দের সংঘাতের রূপ। গ্রামীণ উচ্চশ্রেণী আর শহুরে উচ্চশ্রেণী তাঁর জনতার কাছে 'বাবু' অভিধার মধ্যে এক হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র যেমন 'মহেশ' বা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে গ্রামীণ পুরোধা (রুর‍্যাল এলিট)-দের শ্রেণী ও বর্ণীয় ভূমিকা দুয়ের ওপরই সমান জোর দেন তারাশঙ্কর সেক্ষেত্রে 'বাবু' 'অ-বাবু'-র প্রশ্নকেই সামনে আনেন। এতে তারাশঙ্কর কিছু ভুল করেন না। শুধু সওয়ালের তীক্ষ্ণতা একটু কমে যায় বলে মনে করি। হেলে বলদের সঙ্গে বাঙালী চাষীর সম্পর্ক কতটা বাস্তব মানসিকতার ওপর স্থাপিত, ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে সে সম্পর্ক যে মাত্র প্রথাগত সংস্কার—'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্র সেটাও দেখিয়েছেন। আমাদের মনে পড়েই 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের তিনকড়ি-রহম শেখের গরুরা ঘটনা। তিন-কড়ির গরু কঙ্কণার বাবুরা ধরে বেঁধে রেখেছিল। তিনকড়ি এবং রহমশেখ দুজনে ছুটেছিল সে গরু ছাড়িয়ে আনতে। রহম বাবুকে বলে—'গরুটাকে, মেরা্যা যখম কর‍্যা দিছ শুনলাম? হিন্দু বেরাম্ভণ তুমি?' কিন্তু উক্ত বাবুদের ব্রাহ্মণত্বের বিষয়টিকে সামনে আনার চাইতেও তারাশঙ্কর রহম আর তিনকড়ির সামনে আনতে চাইছেন এক নোতুন ব্যবসায়ী চরিত্র—এঁরা কলকাতায় থাকেন। ধান বেচে দিতে মফঃস্বলে এসেছেন। সুতরাং গরীব গ্রাম্য—চাষির কাছে কসুর কবুল করতে তার বাধে না। তা বলে তিনি চাষিদের ধান ধারও দেবেন না—সুদ পেলেও না—'ওসব ফেসাদের মধ্যে নেই আমি।' চাষি হিন্দু মুসলমান অবাক হয়ে যায় নোতুন এই বাবু মানুষকে দেখে। বাবুর উপকারের পুণ্যে লোভ নেই, সুদের টাকায় লোভ নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মণটির মতো বাবুটির কোনো স্কুপলও নেই—'ভালোতেও সে নেই; মন্দতেই সে নেই. এই ভদ্রলোকই ক্ষতিকর বেশি।' 'গণদেবতা' অংশে আমরা জেনেছি আলি-পুরের রহমৎ শেখ আর কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্যে একযোগে ভাগাড় দখল করেছে চামড়ার ব্যবসা করবে বলে। 'বামুনের মেয়ে'-তে গোলক চাটুজ্যে গরু চালানের ব্যবসায়ে টাকা খাটানো সঙ্গত হবে কিনা একথা দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করছে তার একদশক পরেই 'রমন্দ চাটুজ্যে'-রা চামড়ার ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। বর্ণীয় মহিমা নয়, শ্রেণী-মহিমাই তখন হয়ে উঠেছে কাম্য লভ্য। এবং তারা আর স্বগ্রামবাসীও থাকছে না। 'গণদেবতা'র অনিরুদ্ধ

কামারদের অনেক আগেই তারা-ই বেরিয়ে পড়েছে গ্রাম ছেড়ে, শহরের দিকে। গ্রামীণ অর্থনীতিক প্যাটার্নের রূপ বদলের ব্যাপারে তাদের ভূমিকাও কম নয়। তারাশঙ্কর দ্বান্দ্বিক সমগ্রতায় পরিবর্তমান পট ও পাত্রকে ধরতে চেয়েছেন।

আগেই বলেছি তারাশঙ্করের গল্পে বর্ণাভিমানের বিষয়টি সামনে আসে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বটে; কিন্তু পটকে সেটাই মুখ্যভাবে অধিকার করে না। তারাশঙ্করের গল্পে প্রধান হয় নিচের তলার মানুষের একক ব্যক্তির আত্মমর্যাদার অভিমান। এটাকে তার—ব্যক্তি অভিমান বলা যায়—তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বীজ রূপও বলা যায়। তাই 'আপনি-তুমি-তুই'-এর ব্যাপারটিকে তারাশঙ্কর খুব চমৎকার ব্যবহার করেন। এতদিন পর্যন্ত 'আপনি-তুমি'-র হেরফের বাংলা গল্পে প্রেমের ঘনীভবন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই কাজে লেগেছে—তারাশঙ্কর এটাকে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্যে প্রয়োগ করলেন। প্রেমের ঘনীভবনে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে অবতরণ কাহিনীকে কতখানি ভেতরের দিকে থেকে গতিশীল করে তোলে, কতখানি তা নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের সাতান্ন সংখ্যক পরিচ্ছেদটি তার নিদর্শন। তারাশঙ্করের 'আপনি···তুই'-এর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে। দেবুর সঙ্গে সেটেলমেণ্টের কানুনগো 'তুই-তোকারি' করেছিল। এর জবাবে দেবুও কানুনগোকে 'তুই তোকারি' করে জুতসই জবাব দেয়। কানুনগো সরকারী কর্মচারী, হয়তো ইংরেজী শিক্ষিত—দেবু গ্রাম্য পণ্ডিত হলেও চাষীর ছেলে কানুনগো ইংরেজী শিক্ষিত এবং শহরবাসী বলে দেবুর ঘরে জল খেতে পারে—কিন্তু দেবুকে সে 'আপনি' বলতে পারে না। গাঁয়ের 'বাবু' ক্লাসটাই পারে না। দেবুই কি পেরেছিল গ্রাম্য পুরোভাগীদের 'বাবু' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে? সময় লেগেছে তার সংস্কার থেকে মুক্ত হতে। কানুনগো-ঘটনাই তো তার অভিজ্ঞতায় প্রথম দাগ ফেলে নি। তার আগে পুলিশের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর তাকে 'তুই তোকারি' করেছিল। চাষির ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম—কাজেই সে তার ব্যক্তিত্বের অধিকারে সমানাচরণ দাবী করে—পায় না। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে 'আপনি' বলেন বটে—কিন্তু সেটাও ব্যতিক্রম। কিন্তু এ বিড়ম্বনার বীজ তো দেবুর মনের মধ্যেই। সে যখন নিজের চাষি-বাবার জমিদারের হাতে লাঞ্ছনার কথা ভাবে তখন সে জমিদারকে 'বাবু' বলেই অভিহিত করে। অর্থাৎ সে বিশ্বনাথের সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও—ইংরেজীতে দরখাস্ত লিখতে সক্ষম হওয়া

সত্ত্বেও সে জানে জমিদার—এবং হয়তো ব্রাহ্মণ—'বাবু' অভিধার জন্মগত অধিকারী। এবং সে আর সকলের মত অ-বাবু। এখান থেকে দেবুর চেতনা বলয় ধীরে ধীরে বাড়তে থেকেছে।

তবু আত্মসম্মানের দাবীতে মাথা চাড়া দিচ্ছিল গ্রাম-সমাজ! কিন্তু সেটাও পুরনো আর্থিক বাঁধন ছিঁড়তে পারার আগে নয়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য় করালী-হেদো মণ্ডল ঘটনা এখানে স্মরণীয়। হেদো মণ্ডল যেই বলেছে করালী সম্বন্ধে 'তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে'—'করালী ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হলে হয়তো ভুরু কুঁচকেই মাথা হেঁটে করে চলে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—উকি? বেটা বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দর লোকের উকি কথা!' বনওয়ারীর নিজের ভাষাতেই করালীর এই প্রকার বিস্ময়কর আচরণের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাটি মেলে—'ওই চন্ননপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ করে দিলে।' 'মাথাখারাপ' শব্দটি পুরাতন মূল্যবোধের ভাঙনের প্রতিক্রিয়াকেই স্পষ্টতা দেয়।

তবু 'বাবু' একটা অর্থনৈতিক পরিচয়ই বটে। শ্রীহরি পাল 'ঘোষ' হবার জন্য সচেষ্ট ছিল—বাবুত্বের দিকেই তার অভিলাষ। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে ন্যায়রত্নের কাছে শ্রীহরি ঘোষ গিয়েছিল দেবুকে পতিত করার ব্যাপারে—ন্যায়রত্ন শ্রীহরিকে বলেছিলেন—'কঙ্কণার বাবুদের কাছে যাও তাঁরাই তোমাদের মহামহোপাধ্যায়; তুমি পাল থেকে ঘোষ হয়েছ—নিজেই তো একজন উপাধ্যায় হে!' ন্যায়রত্ন সামাজিক মর্যাদায় কোনো 'বাবুর' চেয়ে নিচে নন। কিন্তু তিনিও নতুন কালের গ্রাম-নাগরিক এলিটদের প্রসঙ্গে 'বাবু' শব্দটিই ব্যবহার করেন। পৌত্র বিশ্বনাথ একটু কটুভাবে হলেও এক দিক দিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা মন্দ দেয়নি 'দেশে' নতুন পঞ্চায়েত সৃষ্টি হলো, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কোর্ট, বেঞ্চ; তারা ট্যাক্স নিয়ে বিচার করছে, সাজা দিচ্ছে। তবু লোকে যখন সমাজপতির বংশ বলে আমাদের তখন যাত্রাদলের রাজার কথা মনে পড়ে।' কিন্তু পুরো ব্যাখ্যা বোধ হয় মেলে না ন্যায়রত্নের ট্রাজিক প্রস্থানের মধ্যে। তারাশঙ্করের ট্র্যাজিক চেতনা আরিস্ততলীয় ট্র্যাজিত চেতনার ফল। তা ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে অনুধাবনের ফল নয়। তবু তারাশঙ্করের পক্ষে একটা কথা বলার আছে। শরৎচন্দ্রের গ্রামসমাজ অনুধাবনের অপূর্ণতা কোথায় ন্যায়রত্ন চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তা দেখিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক-সামাজিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে তার খাপ খাওয়াতে না-পারার-বিষয়ও পরিষ্কার

করে তুলে ধরা হলো। গোড়া কেটে দেওয়া বটগাছের অথবা নিজ বাসভূমি নির্বাসিত রাজার আত্মস্থ অন্তরাগ মূর্তি ধরেছে ন্যায়রত্ন। নিঃসন্দেহে প্রস্থানের করুণ অর্থ গৌরবে লেখক সে মূর্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অথচ এ অভিযোগ আমাদের যায় না যে, তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' (এবং পূর্বগ রচনা 'গণদেবতা'-তেও) ন্যায়রত্ন উপবৃত্তকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন নি। শ্রীহরি ঘোষ দেব-বৃত্তই এ উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রধান বৃত্ত। ন্যায়রত্ন-বিশু-বৃত্ত বেশ খানিকটা দূরগত এবং পরোক্ষও বটে। সে বৃত্তটা দেবুকে মাঝে মাঝে গিয়ে ছুঁয়ে আসতে হচ্ছিল। তবে কি তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন সে বৃত্তটা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণ সংযোগে অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক? তা হলে তো দেবু নিজেও খানিকটা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে।

৩

এ উপন্যাসের নায়ক দেবু। দেবু ঘোষকে সবাই 'পণ্ডিত' বলে ডাকে। লক্ষণীয় গ্রামে কারু জীবিকা সংলগ্ন সম্বোধন সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। কুলোপাধি—যেমন বাঁড়ুজ্যে মুখুজ্যে ঘোষ বা পাল—এই জাতীয় উল্লেখ বা সম্বোধনেরই চল সেখানে বেশী। কিন্তু দেবুর ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে সে তার ঘোষ উপাধিকে নিরর্থক করে তুলেছে। গ্রামের সকল মহলেই সে তার 'পণ্ডিত' অভিধাটিকে চালু করে দিতে পেরেছে। তার শিক্ষকতার সূত্রেই এ অভিধাটি লব্ধ। সুতরাং এক হিসাবে দেবুর 'পণ্ডিত' অভিধা দেবুর নিজের রচনা। পরিবর্তনের মুখে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গ্রামীণ বাঙালী সমাজে যেটুকু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ ছিল দেবুর পণ্ডিত অভিধা সেই অবকাশের দাম।

লক্ষণীয় যে দেবু গ্রাম সমাজকে একই সঙ্গে দুইভাবে দেখেছে। যে অর্থে পঞ্চগ্রাম প্রাচীন গ্রাম সমাজের একটি বিরাট ধ্বংসাবশেষ দেবু সেই অর্থটিকে বুঝে নিতে চেয়েছে কোথায় ছিল গ্রাম সমাজের সেই শক্তি, যে শক্তি সুদূর রাজধানীর সিংহাসনের পালা বদলকে উপেক্ষা করে অটুট থাকতে পারে, দেবু ঘোষ তা বুঝে নিতে চেয়েছিল সরেজমিনে যেটা ন্যায়রত্ন দেখেছিলেন সেটা আসলে দেবুরই দেখা। ন্যায়রত্ন শুধু দেবুর অনুভূতিকে রূপ দিয়েছিলেন এই ভাষায়—

> দেখবার বস্তু আর কিছু নাই—দেশেও নাই মানুষেও নাই। প্রকাণ্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চোখেই তো দেখছেন। ......তাই মধ্যে মধ্যে যখন দুর্যোগে, বজ্রবাতের আঘাতকে প্রতিহত

করতে দেখি সেই সৌধের কোন অংশকে তখন আনন্দ হয়।

ন্যায়রত্নের এই মূল্যায়ন থেকে আমরা দেবুকে উপলব্ধি করতে পারি। ঐতিহ্য সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ দেবু চরিত্রের একদিক। ন্যায় ধর্মের জন্য সংগ্রাম সেই ঐতিহ্যবোধেরই দান! সেই বোধের কারণে দেখতে দেখতে দেবু হয়ে ওঠে নতুন কালের মানুষ। তারাশঙ্করের দেবু চরিত্র পরিকল্পনার তাৎপর্য এটাই। সেটেলমেণ্টের ঘটনার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল দেবু আর গ্রামবাসী কথিত পণ্ডিত নয়, ন্যায়রত্ন কথিত মণ্ডলও নয়, সে একদিন শাল গাছ হতে চেয়েছিল কিন্তু বোঝা গেল এবার সে বটগাছ হতে চলেছে। কারাবাসের আগের দেবু আর কারাবাসের পরের দেবুর পার্থক্যটি এই সূত্রে অনুধাবনীয়। কারাবাসের ভিতর দিয়ে দেবু বৃহৎ ভারতবর্ষের নতুন কালের ছন্দকে বুঝে এসেছে। গ্রামে যখন সে ফিরে এল তখন সে সেই নতুন ছন্দের দূত। বস্তুত দেবুর জন্য অপেক্ষা করছিল আরও একটা বড় মুক্তি—তার স্ত্রী পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু তাকে সেই মুক্তির সন্ধান দিল। লক্ষণীয়, বিলু এবং খোকার মৃত্যুর সঙ্গে যদি আমরা শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবনের পুত্রের মৃত্যুর তুলনা করি তাহলে আমরা দুই লেখকের জীবন ব্যাখ্যার পার্থক্যটা বুঝতে পারি। শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল এটা দেখানো যে বৃন্দাবনকে দুঃখের অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হল। তারাশঙ্কর দেখালেন দেবুর উত্তরণ পূর্বেই ঘটেছিল। কিন্তু মূল্য শোধ না করলে অর্জিত বস্তু নিজের হয় না। দীর্ণ হৃদয় দেবুর চারিদিকের মানুষগুলির বাস্তব শূন্যতার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে। ন্যায় ও ধর্মের পথে দেবু সনাতন ভারতীয় পুরাণ পুরুষের মতো আত্মগত ক্ষয়ক্ষতি লাঞ্ছনা সয়ে তার সংগ্রামকে নির্দিষ্ট করে তুলেছে। উপন্যাসের ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে ন্যায়রত্নের কথিত গল্প সম্পূর্ণতা পেল উপন্যাসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে গিয়ে। এই দুটি গল্প অকারণ কথিত হয় নি। গল্প দুটি যেন দেবুর জীবনের ভাষ্য। তারাশঙ্কর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এই গল্পটি দুবারে বলে তার নায়ক পরিকল্পনার মাত্রাটি আমাদের পরোক্ষে জানিয়েদিলেন। এখানেই তারাশঙ্করের এ নায়ক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। ন্যায়রত্নের গল্পের প্রথমার্ধ যখন বলা হচ্ছে তখনো দেবু ভাগ্যের হাতে প্রচণ্ড মার খায়নি। তখনো সে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করছে। গল্পটির দ্বিতীয়ার্ধ যেদিন বলা হচ্ছে সেদিন দেবুর জীবনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। উপেন রুইদাসের শব সৎকার করতে গিয়ে দেবু যে আত্মানারায়ণকে উদ্ধার করেছে—ন্যায়রত্নের এই ভাষ্য দেবুর

জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

দেবু চরিত্র পরিকল্পনায় তারাশঙ্করের ব্যক্তিজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞানের, পটজ্ঞান ও পাত্রজ্ঞানের পরিচয় মেলে। সে কথা বিচারের পূর্বে উপন্যাসের পট-পাত্রের অন্বয় সূত্রটি একবার স্মরণ করা দরকার। সকল শিল্প বস্তুর মতো নভেলের প্যারাডক্স এখানে যে, উপন্যাস যে-বাস্তবতার অভিব্যক্তিময় রূপসৃষ্টি উপন্যাসের বাস্তবতাকে সেই উৎস দিয়ে বিচার করা চলে না, সেখানকার মাপে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও যায় না। এখানেও পটপাত্রের দ্বৈত লীলা ঔপন্যাসিকের যতটা বস্তুজ্ঞান সাপেক্ষ ততটাই কল্পনার মুখাপেক্ষী। তারাশঙ্করের হাতে বিষয় ছিল—একথা বলার পর অর্থহীন এ উক্তি যে তিনি জানতেন না কী করে লিখতে হয়। ঔপন্যাসিকের সমাজজ্ঞান সমাজতাত্ত্বিকের সমাজজ্ঞান নয়। তা আর্টিস্টেরই সমাজদৃষ্টি। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে দেবু চরিত্রের বিকাশ ছন্দ উদ্‌ঘাটনে লেখকের শৈল্পিক দৃষ্টির পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে তাঁর কালের মাত্রা সম্বন্ধীয় চেতনার প্রমাণ। কালের রূপান্তর আর ব্যক্তির গভীরের ধারাবদলকে লেখক কীভাবে বুঝেছিলেন আমাদের নান্দনিক প্রত্যাশা এখানে সেটাই। গোটা উপন্যাসটি ধরে রাঢ়ের গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তৎকালীন বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করা যায়। লোকায়ত ভারতবর্ষের একটা অতি বিশ্বস্ত ছবি এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ঐ অঞ্চলের গ্রামের মানুষের নিজস্ব জীবনযাত্রার প্যার্টাণটিকে মূলে স্থূলে অনুভব করা যায়। পৌষ আগলানো, গ্রামের প্রধান ঘটনা নিয়ে লোক কবির গান বাঁধা, ন্যায়রত্নের কথকতাসম্ভব গল্প বলা, এ সবই উপন্যাসে এসেছে কিন্তু দেবুকে ধরে। দেবুর নায়কত্ব ও নেতৃত্ব এই ভাবে একত্রে গ্রথিত হয়েছে। ন্যায়রত্ন বিশ্বনাথের প্রজন্ম পার্থক্য এবং জীবানার্থের ব্যবধান জনিত সংঘাতই মাত্র দেবুবৃত্তের সঙ্গে পরোক্ষে স্পৃষ্ট। কিন্তু যতীন ও বিশ্বনাথ দুদিক থেকে যেন দেবুকে সেই ধ্রুব ডায়ালেকটিক্‌সের সন্ধান দিল যা ভারতেতিহাসে অতঃপর প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর জানেন দেবুকে এগোতে হবে তত্ত্ব বা পুঁথির দিকে থেকে নয়, মৃত্তিকাশ্রয়ী তথ্যের ধাক্কায় ও টানে। যেমন ওদেশের প্রত্যেক প্রধান ঔপন্যাসিক বুর্জোয়াসমাজের প্রতিনিধি হয়েও সেই সমাজের অসঙ্গতির তীক্ষ্ণ উদ্‌ঘাটক, এদেশের প্রধান ঔপন্যাসিককে অনিবার্য ভাবে তেমনি হতে হয়েছে আধাফিউডাল আধা বুর্জোয়া সমাজের পরিবেশেরও পরিস্থিতির অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তার অষ্টাবক্র অসঙ্গতির নিঃসঙ্কোচ উদ্‌ঘাটক। গণদেবতা

পঞ্চগ্রামের দেবু সেদিক থেকেই হয়ে উঠেছে লেখকের ঈপ্সিত চরিত্রকল্পনা। প্রথম পরিচ্ছেদে দেবু গ্রামসমাজের সচেতন ধারারক্ষকের ভূমিকা নিতে চেয়েছে। দেখা যায় সময়-নিয়তির নির্ভুল নির্দেশ সে অনুমান করলেও মানতে পারছে না। কানুনগো ঘটনায় তার আত্মমর্যাদার সংগ্রাম ব্যক্তিবলয়কে ছাড়িয়ে গেছে। কারাবাস তাকে ভারতীয় জীবনের চলচ্ছন্দের সঙ্গে অন্বিত করেছে। কলেরার দুর্যোগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে হারায় স্ত্রী পুত্র। ময়ূরাক্ষীর বন্যায় আমরা তার বীরোচিত আত্মদানের সঙ্কল্প দেখেছি। প্রজা আন্দোলনে তার সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় পেয়েছি। শ্রীহরি তাকে পতিত করা সত্ত্বেও সে সাধারণ মানুষেব কাছে উন্নীত হয়েছে। গ্রামের মানুষ কারখানার শ্রমিক হতে চলেছে—প্রথম পরিচ্ছেদে যা ছিল মাত্র ব্যক্তিগত পদক্ষেপ, পঞ্চগ্রামের শেষে তা হয়ে উঠল সামাজিক সত্য। পরিবর্তমান জীবনকে স্বীকৃতি জানিয়েই যেন দেবু বিধবা স্বর্ণকে, তার যোগ্যা শিষ্যাকে, বিয়ে করল। প্রারম্ভিক বিন্দু থেকে দেবু যত অগ্রসর হয়েছে তত সে বুঝে নিয়েছে নিজ অস্তিত্ব যে বিরাট জটিলতার অংশ তার স্বরূপ। একটা ব্যাপার স্বতঃস্বীকার্য যে, কানুনগো ঘটনা বা সেটেলমেন্টের ঘটনার পরে দেবু যত এগিয়েছে তত তার বলয়-বিস্তৃতি ঘটেছে—কিন্তু গভীরের দিকে সে কতটা গেল সে প্রশ্নটা থেকেই যায়। দৈগন্তিক চেতনা বিস্তার ও অভিলম্বী আত্মখননের সমন্বয়ে চলিষ্ণু ব্যক্তি সত্তার যে সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, দেবুর ক্ষেত্রে তা ঘটেছে নিশ্চয়—কিন্তু তার বহিরবয়ব যদি বা কিছুটা স্পষ্ট তার অন্তরবয়ব প্রায় দুর্লক্ষ্যই থেকে গেল। এটাই তারাশঙ্করের দেবু চরিত্র কল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন সত্ত্বেও প্রধান দুর্বলতা। কিন্তু তাই বলে একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে তারাশঙ্কর দেবুকে গতিশীল করতে গিয়ে তার ত্রিমাত্রিকতা কিছুটা নষ্ট করেছেন।

চলিষ্ণু দেবু এবং সময়ের চাকার গতিবেগটি তারাশঙ্কর ঠিকভাবেই রেখায়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছা করে দেবুব চেতনায় যত সঞ্চয় বাড়ল, সেই চেতনার সে পরিমাণে গুণগত মৌল পরিবর্তন কতটা হ'ল? জেলখানায় দেবু শুনেছিল কারার ভিতরে বিশ্বনাথের মৃত্যুর কথা। দুই রাত্রি সে কেঁদেছিল। জেলের বাইরে এসে দেবু দেখেছিল গ্রামের অধিকাংশ জমি নানা বাঁকাচোরা পথে শ্রীহরির ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। এই দুটি অভিজ্ঞতা দেবুকে কি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপক্ষ নির্ণয়ে সাহায্য করল? আসলে শ্রীহরিকে দেবুর প্রতিপক্ষ রূপে তারাশঙ্কর যতটা দাঁড় করিয়েছেন তার চেয়ে বেশী শ্রীহরি হয়ে

উঠেছে দেবুর প্রতিযোগী। দেবুর মত শ্রীহরিরও একটা অভিপ্রায় ছিল। সে বর্ণীয় এলিট হবার জন্যও সচেষ্ট হয়েছে এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসেও উপর দিকে উঠতে চেয়েছে। এককথায় শ্রীহরির মধ্যেও রয়েছে 'ভদ্রলোক' অভিধার জন্য অভিপ্রায়। দেবু ভূমি সংলগ্ন গরীব কৃষক প্রজাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। তারা যে কলকারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে চলেছে, উপন্যাসের উপসংহারে দেখা যায় তাতে দেবুর সায় আছে। তাদের জন্য দেবুর নানা তৎপরতাতেও তার আপত্তি নেই। সুতরাং 'গণদেবতা'র প্রথম অধ্যায়ের দেবু ভারতীয় গ্রাম সমাজের বিবর্তনের ধাক্কায় অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার সক্রিয় ভূমিকাটি তারাশঙ্কর স্পষ্ট করেননি। শ্রেণী স্বার্থের দিক থেকে শ্রীহরির সক্রিয়তা আমাদের নজরে পড়ে। পক্ষান্তরে দেবুকে আমরা শুধু দেখলাম হৃদয়বান মানববাদী প্রজাহিতৈষী রূপে। অথচ যতীন এবং বিশ্বনাথ তার বন্ধু। সুতরাং শ্রেণী স্বার্থও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দুই তার তুল্যমূল্য উপলব্ধি করবার কথা। সে যে তা করেনি সে কথাও বলা যাবে না। কেন না ১৯৩০-এর গণ আন্দোলনের জোয়ার যখন এসেছে তখনই রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন ও কৃষক প্রজাদের অর্থনৈতিক অধিকারের আন্দোলন দেবুর কাছে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। এমনটাই তো হবার কথা। কিন্তু তবু যেন মনে হয় সে অগ্নিবলয়ের মধ্যে থেকেও দেবু থেকে গেল আগুনের দ্বারা অস্পৃষ্ট। আমরা দেবুর মধ্যে অনেক সৎ উদ্দেশ্যের ও সঙ্কল্পের দেখা পেয়েছি। সেদিক থেকে এই মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের নায়ক পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর এই জাতীয় নায়কের আদর্শ প্যাটার্ণ টি রক্ষা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় চরিত্র জীবন্ত হয় তাদের ব্যক্তি সত্তার সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। তারাশঙ্কর তো ট্রাজিক নাট্যকার নন। সুতরাং মানুষের ঐতিহাসিক প্রকৃতি বা হিস্টোরিক্যাল নেচার-কে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক প্রকৃতিকে উপন্যাসে প্রযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ও নবজন্মের বিষয়টি-কেও তুল্য মর্যাদা দিতে হয়। দেবুর ভিতর দিয়ে আমরা সেই নবজন্মের বার্তাটা শুনতে যদিবা পাই, দেখতে পাইনা। দেবু কিছু নতুন মূল্যবোধের কথা বলেছে। এবং সে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাও সে করেছে। শ্রীহরির বিরোধিতা, দুর্গার সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক, অনিরুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীন বন্ধুত্ব এবং পরিশেষে স্বর্ণকে বিবাহ করার মনোজ্ঞ সঙ্কল্প—এসবই তার সেই নূতন মূল্যবোধের প্রমাণ। গ্রামের পুরাতন সামাজিক অখণ্ডতার ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, শতধা

খণ্ডিত পুরাতন মূল্যবোধের ভিতরে থেকেই দেবু অর্জন করেছে তার এই মূল্যবোধ। কিন্তু এগুলি সবই এসেছে দেবুর ভালত্বের প্রমাণ হিসাবে। এগুলির কোনটাই তার ব্যক্তি জীবনের নিজস্ব সংকট থেকে বিবর্তন সম্ভূত হয়নি। এজন্যই তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে উন্মুক্ত উপসংহার কোন নূতন কালের উপযুক্ত জীবন জিজ্ঞাসার দ্যোতক হয়ে দেখা দেয় না। এখানে কালের মন্দিরা যদিবা ধ্বনিত হল, ব্যক্তির ছন্দোমুক্তি, পর্বের ও পর্বাঙ্গের অসম সংঘাত ও ভাঙচুর ততটা প্রত্যক্ষ হল না।

প্রসঙ্গ সঙ্গতি হয়তো থাকবে না কিন্তু একটা তুলনার ভিতর দিয়ে আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা যায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানস উপন্যাসে আমরা ঢোঁড়াইয়ের দেশকালের পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে তার ব্যক্তি ছন্দের নিজস্ব স্পষ্টতা অর্জনের রূপরেখাটি প্রত্যক্ষ করেছি। এই দুই ছন্দের বিশিষ্টতাকে, এই দুই ছন্দের বিভিন্ন মাত্রা তালকে, পর্ব-পর্বাঙ্গের সম্পর্ককে লেখক এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছেন, যাতে প্রথমটিব ঐতিহাসিক বস্তুরূপেও দ্বিতীয়টির যন্ত্রণাঘন উত্তপ্ত ব্যক্তিরূপে আমাদের বিশ্বাসে কোনো ছেদ থাকেনা। দেবুর ব্যক্তি হৃদয়ের সেই 'পোয়েট্রি'র পরিচয় উপন্যাসে সংবাদ হিশাবে পরিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টিবেদ্য ও হৃদয়বেদ্য হয়ে ওঠেনি। এটুকু বলতে বলতেই আমার হাওয়ার্ড ফাস্টের 'ফ্রিডম্ রোড'-এর নায়ক জ্যাকসনের কথা মনে পড়ছে। দেবু ঢোঁড়াই বা জ্যাকসন এই দুয়ের মাপে সিদ্ধ নায়ক হল না। ঐতিহাসিক প্রকৃতির অভাববশত এমনটা হয়েছে বললে ভুল হবে। ব্যক্তি ছন্দের উপযুক্ত কোরিলেটিভের অভাবেই এটা হয়েছে। দেবু চরিত্র পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়েও একথা স্বীকার করতেই হয়।

আরোগ্য-নিকেতনে যুগান্তরের স্বরূপ

অলোক রায়

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' (১৮৯৫) উপন্যাস হিসাবে এমন কিছু মনোযোগ দাবি করে না, কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালীসমাজের যুগান্তরের স্বরূপকে কাহিনীর মধ্যে ধরে দেওয়ার প্রয়াস হিসাবে দেখলে উপন্যাসটির কিছু মূল্য আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) বইটিতেও পরিবর্তমান সমাজের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থে শুধু তথ্যের কালানুক্রমিক বিবরণ যথেষ্ট মনে হলেও উপন্যাসে 'নবযুগের আবর্ত'কে শিল্পরূপ দেওয়া সহজ নয়। 'যুগান্তর' উপন্যাসের সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের উপন্যাস লেখার সমস্যা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, "সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে সত্য এবং সরলভাবে পাঠকের মনে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনও সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়। অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে, সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে—তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।" তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে দেখা যাবে 'স্থিতি অপেক্ষা গতি' আঁকার দিকে তাঁর

ঝোঁক। কিন্তু অনেক সময়েই প্রয়াস সফল হয় নি, তার কারণ (১) 'বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা' প্রয়োগের অভাব (২) 'রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশিষ্ট' করার অক্ষমতা।

অনেকেই জানিয়েছেন 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসটি ছিল তারাশঙ্করের সবচেয়ে 'প্রিয় বই'। এক ধরনের 'অধ্যাত্মবোধ' যাকে তারাশঙ্কর 'ঐতিহ্যবোধ' মনে করতেন, 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর মধ্যে অনেকে তার প্রকাশ দেখেছেন। সমালোচকদের মনে হয়েছে, 'যে দেশে অধ্যাত্মরহস্যকে অনুভূতিগম্য করিবার জন্য সাধনার শেষ নাই, দিব্যদৃষ্টি যেখানে স্থূল বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ-প্রকৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, যেখানে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সেখানে বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক যে জীবন-বেষ্টনকারী চরম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ-গোচর কবিতে চেষ্টা করিবেন, জীবনের যে খণ্ডাংশগুলির মধ্য দিয়া ওপারেব আলো আংশিকভাবে বিকীর্ণ হইয়াছে সেই-গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন, দার্শনিকের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা লইয়া জীবন-রস-আস্বাদনে অগ্রসব হইবেন, তাহা প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক অনুবর্তন ও সম্প্রসারণরূপেই গণনীয়।' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। কিন্তু একালের পাঠক শুধু 'প্রাচীন ঐতিহ্যের সার্থক অনুবর্তনে' খুব বেশি আগ্রহ বোধ করেন না। অন্তত এপারের মানুষ 'ওপারের আলো' দেখার জন্য খুব ব্যস্ত নন। আর তাই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কারও মনে হয় 'আরোগ্য-নিকেতনে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে এটা উপন্যাসটির আংশিক ক্রটি।' অথচ তারাশঙ্কর শুধুই একটা অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য 'আরোগ্য-নিকেতন' লিখেছেন একথা মনে করা কঠিন। তাছাড়া 'আরোগ্য-নিকেতন' পড়বার সময় কোন্ কথাটার উপর আমরা প্রাধান্য দেব, তাও বিচার্য। উপন্যাস হিসাবে 'আরোগ্য-নিকেতন' সর্বাঙ্গসুন্দর বা সার্থক রচনা নয়, কিন্তু শুধু চমক সৃষ্টি করা বা পাঠক-মনোরঞ্জনের জন্যও উপন্যাসটি লেখা হয় নি। তারাশঙ্করের চরিত্র পরিকল্পনায় ক্রটি থাকতে পারে। তত্ত্বের আরোপও কখনো আপত্তিকর মনে হয়। কিন্তু দেশকালের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ সব উপন্যাসেই ধরা আছে, আর দেশকালের গতিময় রূপ তাঁর উপন্যাসকে দিয়েছে সামাজিক তাৎপর্য। 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন যদি তারাশঙ্করের উদ্দেশ্য হয়েও থাকে, তবু সেখানেই

উপন্যাসের সার্থকতা নিহিত নেই। অন্যদিকে যাঁরা মনে করেন 'আরোগ্য নিকেতনে'র বর্ণনীয় বিষয় 'আলোপ্যাথি বনাম আয়ুর্বেদের ঝগড়া', তাঁরাও মনে হয় জীবন মশাইয়ের চরিত্র পরিকল্পনার ব্যর্থতাকেই উপন্যাসের একমাত্র পরিচয় বলে গ্রহণ করায় উপন্যাসে কাল-কালান্তরের রূপকনির্মাণের প্রয়াসকে যথোচিত মূল্য দেন নি।

অথচ তারাশঙ্করের 'আরোগ্য-নিকেতন' শুধু কাল- চিহ্নিত রচনা বলে নয়, কালান্তরের তাৎপর্য বহন করে বলেই বাংলা উপন্যাসধারায় বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। জীবন দত্ত এবং প্রদ্যোৎ বোসের বিরোধ যেমন ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, তেমনি প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিরোধও নয়—প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শতাব্দীতে পরিবর্তমান সমাজজীবনে দুই স্বতন্ত্র মূল্যবোধের বিরোধ। এই বিরোধের পরিণাম, তত্ত্বের আরোপে সামাজিক কার্যকারণসূত্রের অনুসরণ করে নি, সেখানে উপন্যাসের ত্রুটি, কিন্তু বিরোধের সামাজিক কার্যকারণ লেখকের অজ্ঞাত ছিল না, তার রূপায়ণে লেখকের বাস্তবতাবোধের পরিচয়।

'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি কাহিনী-কাল নির্দেশ করছে—"উনিশ শো পঞ্চাশ সাল—বাংলা তেরশো ছাপান্ন সালের এক শ্রাবণ-অপরাহ্নে জীবনমশায় এমনি করেই তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে।" আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয় 'স্থাপিত হয়েছিল প্রায় আশি বৎসর পূর্বে।' তাহলে ১৮৭০ সালে স্থাপিত আরোগ্য-নিকেতন তথা চিকিৎসার আদর্শের সঙ্গে ১৯৫০ সালের চিকিৎসা পদ্ধতির একটা তুলনা এসে যায়। যদিও জীবন মশায়ের পিতা জগদ্বন্ধু কবিরাজ মশায় উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় নন। পুত্রের উপর পিতার প্রভাব ছিল প্রগাঢ়, কিন্তু কালান্তরে পুত্রের পবিবর্তনটুকুও লক্ষণীয়। দুই-পুরুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে তারাশঙ্কর এর আগেও লিখেছেন, তবে 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ ব্যাপকতর সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যবহারের ফলে দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক বেশি।

'গণদেবতা'য় যেমন চণ্ডীমণ্ডপ, এখানে তেমনই 'মশায়ের কোবরেজখানা'। এক'লে চণ্ডীমণ্ডপের যেমন ভগ্নদশা, আরোগ্য-নিকেতনেরও তেমনই দুরবস্থা। —"এখন ভাঙা-ভগ্ন অবস্থা; মাটির দেওয়াল ফেটেছে, চালার কাঠামোটায় কয়েক জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে—মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো। কোনো রকমে এখনও খাড়া রয়েছে—প্রতীক্ষা

করছে তার সমাপ্তির ; কখন সে ভেঙে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে।" এখানে আরোগ্য-নিকেতনের রূপক তাৎপর্য অস্পষ্ট থাকে না। আরোগ্য-নিকেতন ও জীবনমশায় দুজনেরই বিদায়ের কাল আসন্ন—'জীর্ণ পতনোন্মুখ ঘরখানি'র মতো জীবনমশায়ও আজ 'স্থবির, ধূলি-ধূসর—দিক্-হস্তীর মতো প্রাচীন।' অথচ "সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য-নিকেতন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তখন ধারা ছিল অন্যরকম। দেশেরর অবস্থাও ছিল আর-এক রকম। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, ভাঁড়ারে গুড় ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। লোক এক হাতে পেট পুরে খেত—দুহাতে প্রাণপণ খাটত। দেহে ছিল শক্তি, মনে ছিল আনন্দ। সে মানুষেরাই ছিল আলাদা। একালের মত জামা জুতো পরত না ; হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে অনাবৃত প্রশস্ত বক্ষ দুলিয়ে চলে যেত।" সেকালের জন্য এই দীর্ঘনিশ্বাস হয়তো একধরনের পিছুটানের জন্ম দেয়, লেখকের পক্ষপাত যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তারাশঙ্কর অতীত বলতে বোঝেন কতকগুলি মূল্যবোধ, যা কালে কালান্তরে অন্যভাবে অন্যরূপে সঞ্চারিত হয়ে চলে। কাজেই প্রাচীনের কাছে অতীত যতই মূল্যবান হোক না কেন তাকে ধরে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। "লক্ষ্য করে দেখবেন—গ্রামের বসতির উপরে যে গাছগুলি মাথা তুলে পল্লব বিস্তার করে রয়েছে তার অধিকাংশই প্রবীণ প্রাচীন, নতুন গাছের লাবণ্যয় শোভা কদাচিৎ চোখে পড়বে। জীবনের নবীনতার ধ্বজা হল নতুন সতেজ গাছের শ্যামশোভা।" মনে পড়বে তরুণ জীবন দত্ত প্রবীণ জগবন্ধু দত্তের কথা মতো ব্যাকরণ শেষ করে আয়ুর্বেদ পড়তে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে, কারণ 'দেশেতো ডাক্তারিরই চলন হতে চলল। কবিরাজিতে লোকের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে।' কাজেই আয়ুর্বেদকে ধরে থাকা আর সম্ভব নয়, নতুন সতেজ গাছের শ্যামশোভাকে স্বীকার করে নিয়েই আরোগ্য-নিকেতন। তাই কবিরাজি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বিরোধ নয়, জীবনমশায় যখন আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করছেন "তখন কালান্তর হয়েছে। একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থল নগরে নগরে তার অনেক আগে শুরু হলেও এ অঞ্চলে তখন তার প্রারম্ভ।" শতাব্দীর সূচনা থেকেই পল্লীবাংলার পরিবর্তনের সূচনা—"দেশে সত্যই তখন ডাক্তারি অর্থাৎ অ্যালো-প্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেনসারি, ইংরেজ সাহেব ডাক্তার,

দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাক গলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ-করা কাঠের কলবাক্স ; ঝকঝকে লেবেল-আঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো রঙীন ওষুধ তৈরির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া সব মিলিয়ে সে যেন এক অভিযান।" জীবনমশায়ের কৈশোরও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবিরাজির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কোনো ব্যক্তিগত অভিমান বা উত্তেজনার প্রকাশ নয়—এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'পুরানো কাল থেকে বাস্তব বর্তমানে' যাত্রার ইতিহাস।

অবশ্য জীবনমশায় "সে আমলের ডাক্তার, তাও পাস-করা নয়। আসলে হাতুড়ে। এখনকার চিকিৎসায় কত উন্নতি হয়েছে। সে সবের কিছুই জানে না।" "নিজের জীবনে আক্ষেপ থেকে গেল, ডাক্তারি পড়া তাঁর হয় নি। হলে—এ বয়সেও এ অস্ত্র নিয়ে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতেন তিনি।" আসলে অন্য এক কালের মানুষ জীবনমশায়—রঙলাল ডাক্তারের সঙ্গে এই এক বিষয়ে তাঁর মিল আছে—স্কুল কলেজে না পড়েও 'বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি।' জীবনমশায় ডাক্তারি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ তিনটের কোনোটাই ছাড়েন নি। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন ও মৃত্যু নিয়ে চিন্তা, তাও অনেকটা যেন রঙলাল ডাক্তারেরই পরিণাম—"এইবার শুধু পড়ব আর ভাবব। জীবন এবং মৃত্যু। লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ, তার পিছনের সেই প্রচণ্ড শক্তি—তাকে ধারণা করবার চেষ্টা করব।"

১৯৫০ সালে জীবন দত্ত 'সেকালের মানুষ'। কিন্তু এই সেকাল-একালের সীমারেখা সব সময় সালতারিখের নিরিখে বিচার্য নয়। এখানে ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে হয়। রঙলাল ডাক্তার প্রথম দিকে জীবনমশায়কে বলেছিলেন, "তুমি যদি ডাক্তারি পড়তে হে! বড় ভালো করতে। তোমার মধ্যে একজন জাত চিকিৎসক রয়েছে। কবিরাজি শাস্ত্রে কিছু নেই এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের জাতের মতো শাস্ত্রটিও কালের সঙ্গে আর এগোয় নি। যে কালে এ শাস্ত্রের সৃষ্টি—চরম উন্নতি—সে কালে কেমিস্ট্রির এত উন্নতি ছিল না। তাছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কার হয় নি। তারপর ধরো, কত দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে তাদের দেশের রোগ এ দেশে এসেছে—জল বাতাস মাটির পার্থক্যে বিচিত্র চেহারা নিয়েছে। তাছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুক ব্যাধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসা-বিদ্যা মাইক্রোসকোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার করে অনুমান ও উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে

বহুদূরে এগিয়ে।" কিন্তু জীবন দত্তের পক্ষে পুরোদস্তুর আধুনিক চিকিৎসক হওয়া সম্ভব ছিল না, শুধু মড়া-কাটা নিয়ে আপত্তিবোধ নয়, রোগ ও রোগী সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র—এখানে পিতা জগদ্বন্ধু দত্তের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। রঙলাল ডাক্তার ঠিকই বলেছেন,. "তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধহয় ঠিক হল না জীবন। ওই সব বিচিত্র অবিশ্বাস্য মুষ্টিযোগ নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারতে। কিন্তু তাও ঠিক পারতে না তুমি। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশি। কেন হল—সে অনুসন্ধিৎসা তোমার মনে নাই।"

জগৎ মশায় ছিলেন যথার্থ সেকালের মানুষ। "জগৎ মশায় শিক্ষার মধ্যে বারবার উল্লেখ করতেন অদৃষ্টের, নিয়তিব, ভগবানের ; এবং সমস্ত বক্তব্যই যেন রোগবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য একটি ভাব-ব্যাখ্যা-জড়িত মনে হত, যেন, কথার অর্থ ছাড়াও একটি ভাব থাকত।" জগৎ মশায়ের বিশ্বাসের জগৎ ভাববাদী দর্শনের সমর্থনপুষ্ট শুধু নয়, এরই মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্য তথা অধ্যাত্ম-বোধের বীজ। যে নাড়ীজ্ঞানের জন্য জীবন মশায়ের সুনাম বা দুর্ণাম, তার পিছনে আছে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এক বিশেষ ধারণা—"মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ম—কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকালমৃত্যুও আছে। নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে। আমাদের যে পঞ্চমবেদ আয়ুর্বেদ—তার শক্তি হল, কাল যেখানে সহায়ক নয় রোগের, যেখানে রোগকে প্রতিহত করা। রোগ এমন ক্ষেত্রে ফিরে যায়, তার সঙ্গে অন্ধ-বধির মৃত্যুও ফিরে যায়। কিন্তু কাল যেখানে পূর্ণ হয়েছে, সেখানে আক্রমণের বেগে নাড়ীতে যে স্পন্দন-বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় তা থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যু এখানে কালের পোষকতায় অগ্রসর হচ্ছে। এমন কি কত ক্ষণ, কয় প্রহর, কয় দিন, কয় সপ্তাহ, পক্ষ বা মাসে সে গ্রহণ-কর্ম শেষ করবে, তাও বলা যায়—এই নাড়ী পরীক্ষা করে।" বলা বাহুল্য 'কাল' কোথায় পূর্ণ হয়েছে এবং কোথায় হয় নি, সে সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের নির্দেশ প্রাচীন কবিরাজেরা একভাবে গ্রহণ করতেন ; এরমধ্যে তাঁদের ব্যাখ্যাও নিজেদের কিছুটা কাজ করতো, যেমন অতি প্রবীণ বা বৃদ্ধকে চির পঙ্গু অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। মৃত্যু যেখানে অপ্রতিরোধ্য, সেখানে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করার মধ্যে এক

ধরণের বীরত্ব আছে, ইত্যাদি। কিন্তু জগবন্ধু দত্তের বিশ্বাসের জগতের উত্তরাধিকার বহন করেও জীবন দত্ত একালের মানুষ। তাই সত্তর বছর বয়সী জীবন দত্তের সমস্যা জটিল, আর হয়তো এই সমস্যা একা জীবন দত্তের নয়, তাঁর মতো আর অসংখ্য মানুষের, যারা প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্বে জর্জর।

মতির মায়ের পা ভেঙেছে—জীবন মশায়ের মনে হলো মতির মায়ের এবার যাওয়াই ভালো। এখানেই আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা তথা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ বাধলো। প্রদ্যোৎ বোসের মনে হয়েছে এই 'নিদান হাঁকা' হলো 'ইনহিউম্যান—অমানুষিক'। কিন্তু ব্যয়বহুল চিকিৎসা, আধুনিক নানা পরীক্ষা বা সার্জারির সুযোগ গ্রামের মানুষ পায় না। তাই কিছুটা নিরুপায় হয়েই রাণার মতো মানুষেরা জীবন মশায়ের আশ্রয় নেয়।—"দরিদ্র দেশ, দরিদ্র মানুষ, টাকা পাবে কোথায়? ডাক্তারেরাই বা করবে কী? তারাই বা খাবে কী?" এমনকি প্রদ্যোৎও জানে, "দরিদ্র মানুষ—সবল গ্রামবাসী অসহায় ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে এই লোলুপতার খড়্গের নিচে ঘাড় পেতে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু দামই নয়, বাকির খাতায় বাকি বেড়েই চলে। এদের পীত পাণ্ডুর চোখের দৃষ্টি দেখলে প্রদ্যোতের করুণাও হয়, রাগও ধরে। এক এক সময় মনে হয়—মরুক, এরা মরুক, মরে যাক। শেষ হয়ে যাক। নির্বোধ মূর্খেরা নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা নির্বুদ্ধিতা কিছুতেই স্বীকার করবে না।" জীবন মশায় এদের ছাড়তে পারেন না, এরাও জীবন মশায়কে ছাড়বে না। মতির মাকে নিদান হাঁকার জন্য প্রবল আলোড়ন হয়, জীবন মশায় ভাবেন,—"কী বলবেন? আমল পালটেছে, চিকিৎসা-শাস্ত্র এগিয়ে গিয়েছে। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। নইলে—আগের চিকিৎসা অনুযায়ী তাঁর নিদান ভুল নয়, বুড়ির যাওয়ার কথা, নিশ্চয় যাওয়ার কথা এই আঘাতের ফলে। তবে একালের সার্জারির উন্নতি, এক্সরে আবিষ্কার এ সব তাঁর অজানা নয়; কিন্তু সে চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য। তাই সে হিসেব তিনি করেন না। আর একটা কথা,—বুড়ির এই সময় যাওয়াটা ছিল সুখের যাওয়া, সমারোহের যাওয়া। স্বেচ্ছায় যাওয়াই উচিত। তাঁর বাবা বলতেন—।"

গ্রামে মানুষ অনেক অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে জীবন কাটায়—কবচ-মাদুলি জটি বুড়ি চরণামৃতের উপর একান্ত নির্ভরতা। এর মধ্যে নির্বুদ্ধিতা থাকতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনেক সময় আত্মপ্রতারণার কারণ। (রাণা কেন হাসপাতালে যায় না তার কারণ কিছুটা সবিস্তারেই বর্ণনা করা হয়েছে)।

অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসক নব্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে কবিরাজের দেওয়া 'নিদান' কে ব্যর্থ করতে সক্ষম—"নতুন কাল। বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ—অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে। একালে অনেক আয়োজন চাই। অনেক কিছুর আয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন—এই লোকগুলির নির্বাসন। এই জীবনমশায়দের। নিদান! নিদান! মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটা প্রেম করে বসে আছে এদেশ! গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জলে দেহ ডুবিয়ে মরাই এখানে জীবনের কাম্য। মতির মায়ের এক্সরের রিপোর্ট পেয়ে প্রদ্যোৎ যেন প্রেরণা পেয়েছে একটা।...সেই রিপোর্ট পড়ে প্রদ্যোতের মুখে ব্যঙ্গ হাস্য ফুটে উঠেছিল—তার সঙ্গে বিরক্তিও জমা হয়েছিল। পড়ে গিয়ে বুড়ির একটা পায়ের গাঁঠে আঘাত লেগেছে, খানিকটা হাড়ের কুচি ভেঙে সেখানে থেকে গিয়েছে, সেই হেতুই বৃদ্ধার এই অবস্থা। ওই জায়গাটা কেটে হাড়ের কুচিটাকে বের করে দিতে হবে এবং হাড়ের যদি আর কোনো বাদ দিতে হয় দিতে হবে, দিলেই বুড়ি সেরে উঠবে। এতে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।"

অন্যান্য অনেক পদ্ধতির মতই চিকিৎসাপদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়। এদিক থেকে মানবজ্ঞানের অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানও সমাজতত্ত্বের অঙ্গ। একশো বছর আগের চিকিৎসাপদ্ধতি একশো বছর পরে অচল। কিশোর যখন বলে, "ইনিই আমা'দর মহাশয়। তিন পুরুষ ধরে এখানকার আতুরের মিত্র। আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং। এই ভাঙা আরোগ্য-নিকেতনই একশো বছরের কাছাকাছি আমাদের হেল্‌থসেণ্টার ছিল", তখন তারমধ্যে শুধু অতীত-প্রীতির প্রকাশ নয়, সমাজেতিহাসের একটি দিক ধরা পড়ে। অন্যদিকে জীবনমশায় কৈশোরে একদিন যেমন পৈতৃক কবিরাজি চিকিৎসা ছেড়ে আধুনিক অ্যালোপাথিক চিকিৎসা শিখতে চেয়েছিলেন, তেমনি জীবনের প্রান্তভাগে পৌঁছেও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে বার বার তাঁর মুখে শুনি—"সে নাড়ি দেখার আমল চলে গিয়েছে রতন। এ আমল এ কাল আলাদা। আজ কত ওষুধ কত চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে। এখন কি আর সে আমলের বিদ্যেতে চলে? ধরো ম্যালেরিয়ার জ্বর, আমার বিদ্যেতে ন দিনে জ্বর ছাড়বে, কিন্তু এখন ইনজেকশন বেরিয়েছে, প্যালুড্রিন এসেছে, তিন দিনে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

টাইফয়েড দেখে আমরা বলব আঠারো দিন, একুশ দিন, বত্রিশ দিন, আটচল্লিশ দিন। অথচ নতুন ওষুধে দশ-বারো দিনে জ্বর ছেড়ে যাবে। আজ নাড়ি দেখে আমি কী বলব? আজ তো ডাক্তারেরা আসছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করো।" "কীর্তিমান যোদ্ধা প্রদ্যোৎ ডাক্তার। এযুগের আবিষ্কার বিচিত্র বিস্ময়কর। আর না। তাঁর কাল গত হয়েছে। আর না। কালকের সংকল্পটা মনে মনে দৃঢ় করলেন তিনি। আর না।" "মৃত্যুকে জয় করা যাবে না, কিন্তু মানুষ অকাল মৃত্যুকে জয় করবে। নিশ্চয় করবে। ধন্য আবিষ্কার! ইউরোপের মহাপণ্ডিতদের প্রণাম করেছিলেন। হ্যাঁ—আজ বেদজ্ঞ তোমরাই।"

প্রদ্যোৎ ডাক্তার ও জীবন মশায়ের বিরোধ তাই এক হিসাবে নবীন ও প্রবীণের বিরোধ। লক্ষণীয়, এই বিরোধ কিন্তু কখনোই অনতিক্রম্য নয়, কারণ তারাশঙ্কর এই বিরোধকে সমাজতত্ত্বের সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এক অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। বিশ শতকের শেষ পাদেও সমাজতাত্ত্বিক কারণেই অতীত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিলুপ্তি ঘটেনি, অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ভারতবর্ষের মাটিতে এখনও দৃঢ়মূল হলো না (মাদুলি কবজ পাথরের হাত থেকে মুক্তি কোথায়?)। আসলে জীবনমশায় বয়সে প্রবীণ হয়েও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কখনো অগ্রাহ্য করেন নি ("এ চিকিৎসা-শাস্ত্র বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র খুলে দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। বীজাণুর পর বীজাণু আবিষ্কৃত হচ্ছে। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুক ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। সবেরই মূলে বীজাণু। বীজাণু, জীবাণু, কৃমিজাতীয় সূক্ষ্ম কীট—তারপর আছে ভাইরাস। খাদ্যে জলে বাতাসে তাদের সঞ্চরণ। ...অতিরমণ দোষই যক্ষ্মার আক্রমণের বড় কারণ বলে ধরতেন। আজ, খাদ্যাভাব যক্ষ্মার প্রধান কারণ। প্রতিটি জ্বরের কারণ আজ ওরা অণুবীক্ষণে প্রত্যক্ষ করছে। কত নূতন জ্বর। এই তো কালাজ্বর ধরা পড়লো তাঁর আমলেই। কালাজ্বরের ওষুধ ব্রহ্মচারী সাহেবের ইনজেকশন। প্রণ্টুসিল, সালফাগ্রুপ, তারপর পেনিসিলিন, টেরামাসিন, ওষুধের পর নতুন ওষুধ।")। কাজেই কবিরাজির সঙ্গে অ্যালোপ্যাথির বিরোধ বর্ণনা তারশঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসের নাম ছিল 'সঞ্জীবন ফার্মাসী', পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে নতুন নামকরণ 'আরোগ্য-নিকেতন' কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। কবিরাজি-অ্যালোপ্যাথির ঝগড়া নয়, এমন কি কোনো

অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসও নয়,—'আরোগ্য' সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার মধ্যেই বিরোধের বীজ নিহিত আছে। প্রদ্যোৎ এক সময় বলেছে, "আপনার কাছে হয়তো আমার ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে আমি ইচ্ছে করে করি নি। আপনার চিকিৎসাপদ্ধতি আর আমার পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ। আমার মত ছেড়ে আপনার মতে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। তাতে আমাকে বিব্রত হতে হয়। আমার চিকিৎসা করা চলে না। তবে হ্যাঁ— মতির মায়ের নিদান হাঁকার কথা শুনে আর ওর সেই কান্না দেখে আমার রাগ হয়েছিল। আজ অবশ্য দেখলাম— মতির মা মরলেই ওর পক্ষে ভালো হত। কিন্তু আমরা তো ঠিক ওই চোখে দেখি না।" এখানে চিকিৎসাপদ্ধতির কথা বলা হলেও সেটা বড়ো কথা নয়, রোগ ও রোগীকে চিকিৎসক কোন্ চোখে দেখেন সেটাই বড়ো কথা। জীবনমশায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে একালের ডাক্তার মানতে পারেন না—"আমরা সেকালে ওই চোখেই দেখতাম। বিশেষ করে পরিণত বয়সের রোগী হলে, আর রোগ কঠিন হলে রোগের যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টাই করতাম, মৃত্যুর সঙ্গে কাড়াকড়ি করে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম না। বলে দিতাম, ইঙ্গিতেও বলতাম, স্পষ্ট করে বলতাম, আর কেন? অনেক দেখলে, অনেক ভোগ করলে, এইবার মাটির সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে উপরের দিকে তাকাও। সাধারণ মানুষ আকাশের নীলের মধ্যে তো ধরবার কিছু পায় না, তাই বলতাম তীর্থস্থলে যাও, সেখানকার দেবতার মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাক। তবে অবশ্য যে প্রবীণ, যে বৃদ্ধ বয়সেও বহুজনের আশ্রয়, বহু কর্মের কর্মী, তাকে বাঁচাতে কি আর মরণের সঙ্গে লড়ি নি? লড়েছি।"

"মশায়ের সাহায্যের চেয়ে ভালোবাসা বড়"—প্রদ্যোৎ ডাক্তারের মনে হয়েছে ওটা বোধহয় প্রবীণের ধর্ম।" এই ভালোবাসা দিয়েই গড়ে উঠেছিল জীবন-মশায়ের আরোগ্য-নিকেতন। কিন্তু আরোগ্য-নিকেতন ভেঙে চ্যারিটেবল ডিস-পেনসারি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, তারপর হাসপাতাল—সমাজবিবর্তনের এই অনিবার্য প্রক্রিয়া তারাশঙ্কর জানেন—"এ সব দেখে থমকে দাঁড়াবেন না। নতুন গঠনের মধ্যে আশা আছে,ভবিষ্যৎ গড়ছে—সুতরাং মনে মোহের সঞ্চার হবে। স্বপ্ন জেগে উঠবে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে; সেই স্বপ্নে ভোর হয়ে পড়বেন, আরোগ্য-নিকেতন পর্যন্ত যেতে আর মন উঠবে না।" কিন্তু যুগান্তরের গতিপ্রবাহে তারাশঙ্কর নিজেকে মিলিয়ে দিয়েও তাকে যথোপযুক্ত নাট্যরূপ দিতে পারেন না।

রূপকধর্মী রচনার এই সীমাবদ্ধতা 'আরোগ্য-নিকেতন'-এর মতো উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেই সঙ্গে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর দূরত্ব রক্ষা—আরও কঠিন কাজ। এ যেন লেখকের নিজেরই দীর্ঘশ্বাস—"দিন যায়, ফেরে না। দিনের সঙ্গে কাল যায়। কালের সঙ্গে গতকালকার নূতনের বয়স বাড়ে, পুরনো হয়, জীর্ণ হয়, যা জীর্ণ তা যায়। তাঁর খ্যাতিও গিয়েছে। তাতে আক্ষেপ নেই, কিন্তু দুঃখ একটু হয় বৈ কি। উপেক্ষা সহ্য হয় না। তাঁকে উপেক্ষা করলেও তিনি দুঃখ পেতেন না। এ যে বিদ্যাকে উপেক্ষা!" কিন্তু বৃদ্ধ জীবনমশায়ের এই পরিণাম কালান্তরের অনিবার্য পরিণাম, এ নিয়ে ট্রাজেডি রচনা করা যায় না। অথচ তারাশঙ্কর জীবনমশায়ের ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডির মধ্যে সামাজিক ট্রাজেডিকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, "সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি অরণ্য গজের মতো বেরিয়ে পড়েন মৃত্যু গহ্বরের সন্ধানে। জনহীন দিকহারা প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে, অথবা গভীর নিবিড় মহা অরণ্য থম থম করছে; অসংখ্যকোটি ঝিল্লীর ঐকতান ধ্বনিত হচ্ছে; মৃত্যুর মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ চলেছে জন্ম থেকে জন্মান্তরে; সেইখানে উল্লাসধ্বনি করে সেই মহাগহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নবজন্মের আশায়।" বলাবাহুল্য এ প্রয়াস সার্থক হয় নি। মৃত্যুরূপী নায়িকার সঙ্গে নায়ক জীবনমশায়ের মিলন যেন আরোপিত তত্ত্বের ভারে ইতোভ্রষ্ঠ ততো নষ্ট। 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে যুগান্তরের স্বরূপসন্ধান তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে পাঠকের অতৃপ্তির কারণ।

গল্পকার তারাশঙ্কর

রথীন্দ্রনাথ রায়

তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার কথা ভাবতে গেলে এক অবিকম্পিত নির্ধূম অগ্নিশিখার কথাই মনে পড়ে—দুঃখ-বেদনা-প্রতিকূলতার উর্ধ্বে যার দিগন্তস্পর্শী স্বর্ণদীপ্তি!

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও, বলিষ্ঠ শিল্পপ্রত্যয় ও অসাধারণ শক্তির জন্য স্বল্পদিনের মধ্যেই অগ্রণী সাহিত্যিকের মর্যাদা তিনি পেয়েছেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়; পরের বছর ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় আর একটি গল্প—'হারানো সুর'। তারাশঙ্কর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের কালগণনা শুরু করেছেন।[1] এর আগে তাঁর সাহিত্যসাধনা চলেছে লোকচক্ষুর অগোচরে। কবিতা লিখতেন তখন। ১৩৩২ সালে বীরভূমে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে তিনি অভ্যাগতদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। লাভপুরে তখন নাটক-রচনার ঢেউ চলেছে। তারাশঙ্করের মনেও নাট্যকার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। গ্র্যাণ্ড ডফের মারাঠাদের ইতিহাস অবলম্বন করে এক নাটকও তিনি লিখলেন। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে নাটকখানি 'আশ্চর্য রকম জমে গেল'।

আর্ট থিয়েটারের তখন সুবর্ণযুগ। সেখানকার অধ্যক্ষ মহাশয় নাটকখানি না পড়েই ফেরত দিলেন। সেদিন নাট্যকার-যশোলিপ্সু তারাশঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হয়ে 'মারাঠা-তর্পণ' নাটকের পাণ্ডুলিপি আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় পাবক-শিখাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জীবনে ঘটনাটির একটি বিস্ময়কর তাৎপর্য আছে। তিনি ভুল করেছিলেন। তাঁর অলিখিত কাহিনী তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সংঘাতময় ভারত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত ছিল না, গ্র্যাণ্ড ডফের তিন ভল্যুম মারাঠা ইতিহাসের তথ্যপঞ্জীতেও তা চিহ্নিত ছিল না, কিংবা ঐতিহাসিক রোমান্সের

---

১. 'আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম পর্ব), পৃ ৯।

কারুকার্য-খচিত মর্মর-প্রাসাদের মধ্যেও তা নিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক যে, নাট্যকার তারাশঙ্করের সেদিন মৃত্যু হয় নি, রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র। কেননা তাঁর গল্পে নাটকীয়তার অভাব নেই, এবং পরবর্তীযুগে তিনি নাট্যকার-খ্যাতিও লাভ করেছেন।

রহস্যময় মানবজীবনে গল্পের অভাব নেই। কিন্তু সে গল্প চোখে দেখা চাই, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা চাই, সেই রহস্য-সমুদ্রের গভীরে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে নিমজ্জিত হওয়া চাই। তারাশঙ্করের সেই দৃষ্টি, হৃদয় ও জিজ্ঞাসা ছিল। তাই দীর্ঘকালব্যাপী তাঁকে সন্ধান করতে হয় নি, সহজেই তিনি স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে গল্প খুঁজে বেড়াতে হয় নি, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে সহজেই শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। যে জীবনকে তিনি দেখেছেন, সেই জীবনেরই মর্মস্থলে তিনি প্রবেশ করেছেন। তাঁর দেখার মধ্যে যেমন কোনো ফাঁক ছিল না, তেমনি তার অনুভবের মধ্যেও ছিল না কোনো ফাঁকি। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠকের চিত্তজয় করলেন।

তারাশঙ্কর যখন বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপ করেছেন, তখন শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের চূড়ান্ত শীর্ষে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রাচুর্য তখনও নূতন নূতন রূপ ও রীতির সন্ধানে মুখর। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তখন নব নব বক্তব্য ও আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই দুই অধিনায়কের সৃষ্টিপ্রাচুর্যের যুগেও সাহিত্যেক্ষেত্র দেখা দিল অন্য এক অগ্নিময় সঙ্কেত। 'কল্লোল' পত্রিকা হল সেই বিদ্রোহের বাহন। ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের পদপরিবর্তন শুরু হল। একদল সংস্কারমুক্ত বিশ্লেষণী মন সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সাহিত্য তার শুচিশুভ্র অভিজাত্য ও নীতিবোধের গজদন্ত-মিনার থেকে নেমে এল অখ্যাত ও অনাবিষ্কৃত গলিপথে। জীবনের যে অংশ আদর্শবাদ, নীতিবোধে ও সুলভ ভাবালুতার রঙীন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, তার উপরে পড়ল কৌতূহলী দৃষ্টির তীক্ষ্ণ রঞ্জনরশ্মি।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বদিগন্ত যখন 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' উদ্‌ঘাটনের প্রহর গণনা করছে, তারাশঙ্কর তখন সমাজসেবা ও রাজনীতির মধ্যে নিজেকে

ডুবিয়ে দিয়েছেন। নাট্যকার-যশোলিপ্সু তারাশঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হয়ে কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু অবরুদ্ধ বাসনার মৃত্যু হল না। স্থানীয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় তিনি দু-হাতে লিখে চললেন। নানাধরনের লেখা—কবিতা, গল্প, সম্পাদকীয়,—সব কিছুই। কিন্তু তাঁর কিছুতেই যেন মন ভরে না। তারাশঙ্করের মনোভূমি তৈরি ছিল, শুধু উপযুক্ত বীজের প্রত্যাশায় তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত। আকস্মিকভাবেই তিনি স্বপথের সন্ধান পেলেন। তারাশঙ্কর নিজেই সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন :

ঠিক এই সময়েই একদিন—সিউড়ীতেই হবে, এক উকিলের বাড়িতে উঠেছি কংগ্রেসেরই কাজে।...রাত্রে ঘুম আসে না। হয় গরম, নয় শীত, দুটোর একটা হেতু বটে। তার উপর ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ...জেগে বসে থাই আর গুনগুন করে গান গাই। এমনই অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা। এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতার মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়![২]

'কালিকলম' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তারাশঙ্কর পেলেন পথনির্দেশ, পেলেন অবিচলিত সাধনার যথার্থ বীজমন্ত্র। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি সারস্বত মুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মফঃস্বল শহরের সেই বিনিদ্র রাত্রি ভাবীকালের শক্তিধর শিল্পীর সামনে তুলে ধরল এক অলিখিত

২. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃ ১৯-২০।

জীবনভাষ্যের জ্যোতির্ময় পাণ্ডুলিপি। কমলিনী বৈষ্ণবীর প্রত্যক্ষচিত্রের সঙ্গে জীবনের সদ্যজাগ্রত রসপিপাসা মিলে রচিত হল 'রসকলি' গল্প।

তারাশঙ্কর বলেছেন :

গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিত পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্পলেখার ওইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয়, কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী—তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন—আর মন্ত্রই বলুন—এটা কারুর কাছ থেকে শিখেছেন কিনা—অথবা শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কি না। তবে আমার মনে হয়—ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন করে জানি না, শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে—ফুটে ওঠে।[৩]

তারাশঙ্করের এই স্বীকৃতিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনে 'নির্ঝরের 'স্বপ্নভঙ্গ' বলা যায়। তিনি সাহিত্যিকের 'তন্ময়তার যোগ' বিশ্বাস করেন। তিনি স্বভাবকবিদের মতোই বিশ্বাস করেছেন 'সোনার কাঠি'র আকস্মিক স্পর্শ—যাতে ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে ওঠে। কিন্তু পুরনো 'কালিকলমে'র বিবর্ণ পৃষ্ঠায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্পে ছিল এমন এক ইঙ্গিত, যা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। তারাশঙ্করের উৎকণ্ঠিত শিল্পীমন সেদিন অঞ্জলিভরে সেই অভিনব জীবনরস আস্বাদন করেছিল। রাঢ়ের পল্লীজীবনের চিত্র শৈলজানন্দের গল্পে নিপুণ রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা বীরভূম। শৈলজানন্দের গল্প তারাশঙ্করের সুপ্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে জাগিয়ে দিল। তিনি উত্তর রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর মাটির মধ্যে আবিষ্কার করলেন এক অনাবিষ্কৃত মহাকাব্যের শিলালিপি, সেখানকার প্রত্যহের ধূলির মধ্যেই খুঁজে পেলেন চিরায়ত ঐশ্বর্য। তিনি সেই

৩. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব) পৃ ২১-২২

পটভূমির উপরেই দেখলেন সুখ-দুঃখে বিচিত্রিত মানবজীবন—আদিম অন্ধ জৈববৃত্তির নাগপাশ যাদের বন্ধন, অথচ সেই বন্ধনকে ছিন্ন করে যাদের জরা-মৃত্যুজয়ী অমৃত পিপাসায় অভয়মন্ত্র! শৈলজানন্দের 'বেনামি বন্দর : জনিও টনি' গল্পটির মধ্যে [৪] বীরভূমের কোনো ছাপ নেই, কিন্তু জৈবজীবনের একটি বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র সেখানে উদ্‌ঘাটিত ছিল। তারাশঙ্কর এখানেও নূতন আস্বাদন পেয়েছিল। জীবনজিজ্ঞাসার মূলসূত্রটিকে তিনি চমৎকারভাবে রূপ দিয়েছেন ,পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' গল্পটি তাঁর মতো 'জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত'। গল্পটির ভারসাম্য সেখানে বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তরকালে তারাশঙ্করের প্রৌঢ়-জীবনোপলব্ধি এক শান্তস্থির ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত। তারাশঙ্কর বলেছেন :

জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই তা নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হেরেছে।[৫]

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই হল তারাশঙ্করের উপলব্ধি! মাটি ও মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষ—আদিম প্রকৃতির ভীষণসুন্দর মহিমা ও মানবপ্রকৃতির সহজ বলিষ্ঠ অন্ধ আদিমতা এখানে যেন একই মহাশিল্পীর রচনা। সেই অরুগ্ন অমার্জিত অথচ সহজ জীবন-উৎসের অতল-গভীরে কত নিষ্ঠুর সত্যের নির্মম বিলাস, কত দুর্লভ ঐশ্বর্যের অভাবনীয় দীপ্তি!

আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর দেখেছেন—মানুষের আদিম অপরাধ-প্রবণতা, দেহ-মনের কুৎসিত ব্যাধি, পতনোন্মুখ জমিদারকুলের অস্তগামী গরিমা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ, এবং তার পাশাপাশি আদিম মানুষ বেদে-বাউরী-সাঁওতাল-রাজবংশীর দল।

বাংলা সাহিত্যে এ কাহিনী নূতন, জীববোধের স্বরূপটি আরও নূতন।

৪. 'কালিকলম' : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩। এই গল্পটির কথাই তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন।

৫. 'আমার সাহিত্য-জীবন (প্রথম পর্ব), পৃ ২০।

রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনলগ্নে 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা' আস্বাদনের পিপাসা জেগেছিল, জেগেছিল 'আরব বেদুইন' হাওয়ায় রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা দু-একটি লিরিকের ক্ষণজীবী ইন্দ্রধনু মাত্র ;—কবিমানসের স্বর্ণ-মেঘস্তরে কদাচিৎ তার সন্ধান পাওয়া যায়। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পমালায় ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবনযাত্রা ও পল্লীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রসোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করেরই গল্পে। এই ধরনের জীবনচিত্রণ তথা আঞ্চলিকতার সূত্রপাত করেছিলেন শৈলজানন্দ। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খনি ও সেখানে সাঁওতাল কুলি-মজুরদেব নিয়েই শৈলজানন্দ তাঁর 'কয়লা-কুঠি'র গল্পগুলি লিখেছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। শৈলজানন্দ পথের সন্ধান দিলেও কয়েকটি নিপুণ খণ্ডচিত্রের মধ্যেই তা নিবদ্ধ রইল, আর 'কয়লাকুঠি'র গল্প বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করল। শৈলজানন্দ যার আভাস মাত্র দিলেন, তারাশঙ্কর তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবন-রহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন। প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারো প্রতিধ্বনি নন—প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।

(২)

তখনকার কালেব সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা ছিল 'প্রবাসী'। আত্মপ্রকাশেচ্ছু তরুণ সাহিত্যিকেরা লেখা পাঠাতেন, এবং সেখান থেকে না পড়েই লেখাগুলি ফেরত পাঠানো হত। এই বিড়ম্বনা তারাশঙ্করকেও ভোগ করতে হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকাই তাবাশঙ্করকে আবিষ্কার করেছিল। 'প্রবাসী'র কৌলীন্যের দুর্গদ্বার তরুণদের জন্য ছিল অবরুদ্ধ। সেখানে তরুণদের স্পর্ধিত বিদ্রোহের কোনো প্রশ্রয় ছিল না 'কল্লোলে'র সুর ছিল বন্ধন-মুক্তির, সংস্কারের নাগপাশ বন্ধন-মুক্ত করাই ছিল তার দুঃসাধ্য ব্রত। সাহিত্যের যুগ-জীর্ণ সংস্কারকে আঘাত হানতেই চেয়েছিলেন এই পত্রিকার সাহিত্যিক-ব্রতচারীরা। তাই তাঁরা চাইলেন সংস্কারমুক্ত নূতন দৃষ্টি, বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ও জীবনের সব কিছুকে স্পষ্ট করে বলার স্পর্ধিত দুঃসাহস। অভিজাত পত্রিকায় যাদের জীবনের স্থান হয় নি, সেই নোংরা বস্তিবাসী ও অসংস্কৃত নরনারীর আদিম জীবনযাত্রা এখানে

সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল। নরনারীর প্রেমসম্পর্কের উপর দীর্ঘকালব্যাপী যে নীতি ও আদর্শবাদের রঙীন কুয়াশা মণ্ডিত হয়ে ছিল, তাকে ভেদ করে অতির্যক রেখায় বর্ষিত হল বুদ্ধিদীপ্ত মননের রঞ্জনরশ্মি। অকুণ্ঠ সত্যভাষণ ও সংস্কারসাহিত্য নরনারীর যৌনজীবনকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু করে তুলল। 'কল্লোল' দুঃসাহসী তারুণ্যের যৌবনদ্রোহ—উদ্ধতকণ্ঠে তাই ঘোষিত হল :

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু, সুকঠোব হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোব পথ আরো দূর![৬]

'কল্লোল' ছিল নবীনের বাণীবাহক। তাই তারাশঙ্করের নূতন সুরও 'কল্লোলে'র কলধ্বনিতেই স্বীকৃত হল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এ কথা স্বীকার করেছেন।[৭] 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক হলেও তিনি 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ হতে পারলেন না। কেন পারলেন না, তার হেতু নির্ণয় করতে গেলে তাঁর মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুদ্ধোত্তর বাংলার জীবনচর্যা তখনকার কালের শিক্ষিত তরুণ-মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা-ই 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় বিদ্রোহেব বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। জীবনের সবগুলি পথই যখন রুদ্ধ, কোনো দিকেই যখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ নেই, তখন এই ব্যর্থতাবোধ ও নৈরাশ্য চিত্তবিক্ষোভে পরিণত হল। তাই বাংলা সাহিত্যের এই ক্ষণদীপ্ত ও স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টির মধ্যে যতখানি আঘাতপ্রবণতা ছিল, ততখানি নূতন মূল্য-সন্ধানের প্রচেষ্টা ছিল না। 'কল্লোল' পুরাতনের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে, তার জীর্ণ

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ১৪৭।

৭. 'কল্লোল'-'কালিকলম' এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে। রাজনীতির পথে।—'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৮২।

কবাটে ফাটল ধরিয়েছে সত্য, কিন্তু নূতন-মূল্যকে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন মূলত নাগরিকমানস। কিন্তু তারাশঙ্কর যথার্থই পল্লীপ্রাণ সাহিত্যিক। 'কল্লোল' পত্রিকায় যে পল্লীগ্রামকে নিয়ে গল্প লেখা হয় নি এমন নয়, কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রামীনচেতনার সঙ্গে এর পার্থক্য দুস্তর। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর অনেকেই নাগরিক চেতনা ও শহুরে মন দিয়ে পল্লীগ্রামকে বুঝতে চেয়েছিলেন। তাই সে বোঝার মধ্যে তন্ময়তা ছিল না, আন্তরিক সাযুজ্যেরও ছিল অভাব। সেখানে পল্লীজীবনের উপরিতলের দু-একটি ক্ষণ-বুদ্বুদ ও খণ্ডচিত্র ছাড়া তেমন কিছু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয় নি। তারাশঙ্করের গ্রামীণচেতনা তাঁর জীবন চেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ—তাই এই চেতনা যেমন সমগ্র, তেমনি সর্বঙ্কর। দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের জীবনবোধ গভীরতর, তাই তিনি মহাকালের প্রলয়লীলাকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন নি, সবার উপরে তাঁর শিব-সুন্দর আশীর্বাদকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। নাগরিক-জীবনের কুটিল সংশয় ও বিকৃতি তাঁর চরিত্রগুলিকে স্পর্শ করতে পারে নি। ব্যাধিকে তিনি নিপুণ ও অভ্রান্তভাবেই দেখেছেন, কিন্তু তাকেই তিনি চরম বলে স্বীকার করেন নি। তাই তাঁর রচনাতে ব্যাধির বিশল্যকরণীর সঙ্কেতও আছে। বিষামৃতময় জীবনের মূলে প্রবেশ করেছেন তারাশঙ্কর। একালের গ্লানিজর্জর ক্ষয়িষ্ণুতা ও কুটিল সংশয় তাঁর মানসলোক স্পর্শ করতে পারে নি, অথচ এর জন্য তাঁকে ভীরু পলায়নবৃত্তি গ্রহণ করতেও হয় নি তিনি নিজেই বলেছেন :

> বিদ্রোহ ও বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল উর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাবার মত মনের গঠন আমার ছিল না। ওই উর্মিলতার নিচে যে স্রোত-ধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরনের।[৮]

৮. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব)

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহবাণীকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের প্রভাব। রলাঁ, ভাসিন্তো বেনাভাঁতে, যোয়ান বোয়ার, ক্নুট হামসুন রবার্ট ব্রিজেস, এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেছিলেন, প্রত্যুত্তরে এঁরা আশীর্বাণীও পাঠিয়েছিলেন। হুইটম্যানের কবিতা, লরেন্স-হাক্সলির কথাসাহিত্য, হামসুন-গোর্কি প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা এই গোষ্ঠীর লেখকদের উদ্বোধিত করেছিল। এখানেও 'কল্লোলে'র সুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের সুর মেলে নি। তারাশঙ্কর কোনোদিনই ওই পথে পা বাড়ান নি। তাতে তার মহত্ত্ব কমে নি, বরং বেড়েছে। পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়ানোর জন্য পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়াকে কোনো কোনো লেখক তাঁদের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশী মরশুমী ফুল ভাল ভাবে ফুটতে পারে নি। সৌভাগ্যের বিষয় তারাশঙ্কর সুলভ-সিদ্ধির পথ বর্জন করেছিলেন। কারণ, এই তাঁর শিল্প-নিয়তির অমোঘ নির্দেশ!

তারাশঙ্করের প্রতিভা এমন আশ্চর্য রকম স্বতন্ত্র যে 'কল্লোল'গোষ্ঠী কেন, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গেই তেমন অন্তরঙ্গতা ঘটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যের পূর্বাচার্যদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়, তবু তাঁদের পথ তিনি যেমন বর্জন করেছেন, তেমনি সমকালীন কথাসাহিত্যিকরাও তাঁর উপর কোনো ছায়াপাত করতে পারেন নি। একবার স্বক্ষেত্রে আবিষ্কার করার পর নিজের অন্তর্লোকই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। পৌরুষ ও নিষ্ঠাই তাঁকে পথনির্দেশ দিয়েছে। স্বভাব কবিদের মতোই তাঁর সাহিত্যিক মেজাজ। অচিন্ত্যকুমার যথার্থই বলেছেন:

> …পুরুষকারই চিরদিন তারাশঙ্করকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। পুরুষকারই কর্মযোগীর বিভূতি। কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নি উদ্দীপিত হয় কাষ্ঠের সংঘর্ষে, তেমনি প্রতিভা প্রকাশিত হয় পুরুষকারের প্রাবল্যে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে দৈবও অকৃতী। নিষ্ঠার আসনে অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে তারাশঙ্কর—সাহিত্যের সাধনার থেকে একচুল তার বিচ্যুতি হয় নি।[১]

তারাশঙ্করের উপলব্ধি ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হল কঠিন তপশ্চর্যা। মাটিই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে, সেই সব মানুষই তাঁকে তাঁর জীবনপথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারস্থ

১. 'কল্লোল যুগ' (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৩১৫

হতে হয় নি তাঁকে। যে অঞ্চল তাঁর ধাত্রী, তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন নানা ভাষায়, বিচিত্র ভঙ্গিতে। জনশ্রুতি-কিংবদন্তী দিয়ে ঘেরা অস্পষ্ট অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের জীবনধারা ও ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি তাঁর রচনায় সমন্বিত হয়ে এক মহাকাব্যোচিত সমগ্রতা লাভ করেছে। তিনি এমন একটি মনের অধিকারী, যেখানে তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়ালদের স্বরচিত বৃত্তপরিক্রমা ও অসুস্থ মনোবিকার অনুপস্থিত। ক্ষণদীপ্ত স্ফুলিঙ্গের দু-একটি চকিত আভাস এখানে শুধুমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না, পরন্তু শাল-মহুয়ায় ঘেরা উন্মত্ত অরণ্যপ্রকৃতি, বৃষ্টিহীন দগ্ধ মৃত্তিকার জ্বালাময় অভিশাপ, ময়ূরাক্ষীর গাঢ়পিঙ্গলবর্ণ হড়পা বান,—আদিম জীবনের ভীষণ-রমণীয়তায় পাঠককে বিস্ময়-বিমূঢ় করে।

আধুনিক সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল রূপ তাঁকে কৌতূহলী করতে পারে নি, তিনি প্রবেশ করেছেন আদিমজীবনের গভীর মর্মমূলে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবের বিকৃতি ঘটেছে। তাই সভ্য মানুষ আজ আর প্রকৃতির মতো সহজ হতে পারে না, কিন্তু সভ্যতার তথাকথিত আলোক-প্রসাদ থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের জীবনের মধ্যে আজও সেই বিশুদ্ধ স্বভাবের রসটি পাওয়া যায়। নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডে স্বাভাবিক রস প্রত্যাশা করা যায় না। তারাশঙ্কর যাদের কথা বলেছেন, তাদের জীবন সভ্যতার পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও এ ভূমি কুমারী-মৃত্তিকা। তাই তারাশঙ্করকে জটিল জীবনের জটিলতর ভাষ্য রচনা করতে হয় নি, বহু-ফাটলে বিদীর্ণ জীবনের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি আহরণ করতেও হয় নি। আধুনিক সভ্যতাব প্রথম পদপাতের মুহূর্তেই তিনি শেষবারের মতো গোটা মানুষের পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছেন। স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা-হিংস্রতা-বর্বরতা—মানুষের যে কোনো প্রবৃত্তিই এখানে উঁচু সুরে বাঁধা—এবং প্রকৃতিকল্প জৈবজীবনের আদিম প্রবলতায় সে সুর উচ্চকিত। তাই ছোটখাটো বিপর্যয় ও বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে জীবনের সেই আদি ও অকৃত্রিম সুরই প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে যে সংঘর্ষ ও সংঘাতের কাহিনী আছে, তা যেমন রক্তক্ষয়ী, তেমনি মর্মান্তিক। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেতে তিনি এই বিরোধগুলিকে আভাসিত করেন না—কারণ এই সংঘাতগুলির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—এ সংঘাত একই আদিমশক্তির দুইটি বিরুদ্ধ রূপের মধ্যে।

মধ্যযুগীয় গ্রামবাংলার বিলীয়মান রশ্মিরেখা তারাশঙ্কর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণে

এঁকেছেন। প্রাচীন মাটির গন্ধে, প্রাচীন পৃথিবীর জীবনরসে কাহিনীগুলি নূতন এক আস্বাদনের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এইখানেই তারাশঙ্করের দেখার শেষ নয়, নূতনকালের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে নতুনকালের পদধ্বনি তিনি শুনেছেন। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেও তারাশঙ্কর এগিয়ে চলেছেন, কারণ তিনি মানুষের অপরাজেয় অভিযানে বিশ্বাসী এই দুই কালের দ্বন্দ্ব জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দুই কালের সত্য এক অসামান্য রূপকের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে :

> …আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কোনো কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোনো কালে এপারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার, কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সেদিন আমার মাল্যরচনা সার্থক হবে।[১০]

(৩)

সমাজের উচ্চকোটির জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আর একটি জীবনছন্দ আছে। নগর-নির্ভর সাহিত্যে তাদের স্থান নেই। এই লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারার মধ্যেই মিশে আছে যুগযুগান্তরের অকৃত্রিম ও অশোধিত জীবনরস। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তারাশঙ্করের সাহিত্যের একটি প্রধান আশ্রয়স্থল হচ্ছে রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি। জনশ্রুতি-কিংবদন্তীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়ে এই বিলুপ্তপ্রায় জীবনছন্দটি নবরূপ পেয়েছে। (লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন অনেক উপকরণ আছে, যাকে উচ্চকোটির সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলা সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে তারাশঙ্করের দাবিই অগ্রগণ্য। তিনি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকচর্যাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।)

তাঁর রচনার একটি বিরাট অংশই তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায় অধিকার

১০. 'আমার কালের কথা' পৃঃ ২২২।

করেছে। এদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের মূল কাঠামোর কোনো যোগ নেই। এদের আদিম রক্তধারা ও জীবিকার্জনের অদ্ভুত পন্থা, উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য-গীত, পণ্যানারীর জীবনচর্যা, সংস্কার-মুক্ত নীতিজ্ঞানবিবর্জিত প্রাণোচ্ছল জীবনরস তারাশঙ্করের রচনায় অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকের তথ্যনিষ্ঠা নিয়ে নয়, জীবন-রসিকের মন দিয়েই তিনি এই জীবনের গহনে প্রবেশ করেছেন।

'যাদুকরী' গল্পে বীরভূমের বাজিকর সম্প্রদায়ের এক তথ্যসমৃদ্ধ ও জীবন রসোজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে। এই বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়টির বিচিত্র তথ্য গল্পটির প্রথম দিকে পরিবেশন করা হয়েছে। এদের আচার-আচরণ, বেশভূষা ও বিচিত্র বৃত্তিকে তারাশঙ্কর নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র ভূমিকা হিসাবেও গল্পটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই সম্প্রদায়ের বিচিত্র ইতিহাস সম্পর্কে তারাশঙ্কর অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন :

যাদুকরী যাদের নিয়ে লেখা—তারা আমাদের ও-অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। বিচিত্র সম্প্রদায়। ওদের নিয়ে গল্পটি লেখার পর—এই ধরনের সম্প্রদায় নিয়ে বড় রচনার ইচ্ছা এবং সাহস পেয়েছি।...এই সম্প্রদায়টি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করি।...ওই যাদুকর-যাদুকরীদের ভালোবাসতাম। ...এদের সঙ্গে ঘুরেছি, এদের গ্রাম আমাদের গ্রামের খুব কাছে—সে গ্রামের কিছু জমিদারী অংশ আমাদের ছিল, সে গ্রামে গিয়েছি, তাদের বাড়ির দাওয়ায় উঠানে বসেছি ; ওদের সম্পর্কে প্রবাদকাহিনী ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। জেনেছি। ওদের সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন লিখেছেন ওরা রাঢ়ের সিদ্ধল নগরীর রাজা ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর হিসাবে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। সেই কাল থেকেই গুপ্তচরবৃত্তির সুবিধার জন্য পুরুষেরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করত। মেয়েরা ছিল নটীর মত নৃত্যগীত-পটীয়সী, ছলাকলায় পারদর্শিনী। সাহিত্যরত্ন বলেন—ওদের গ্রাম' শীথল গ্রামই সেকালের সিদ্ধল। ওদের কাছে ওদের সিদ্ধ যাদুকর টাকু মণ্ডলের গল্প সংগ্রহ করেছি।[১১]

এই সম্প্রদায় সম্পর্কিত তথ্যপ্রমাণের কোনো অভাব গল্পটিতে নেই, কিন্তু

১১. 'তারাশঙ্করের প্রিয়গল্পে'র ভূমিকা।

এর জন্য গল্পটি শুধু তথ্যসর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। তথ্যকে অতিক্রম করে বাজিকর মেয়েটির লীলায়িত জীবনছন্দ গল্পটির মধ্যে একটি গতি সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত সভ্য-সমাজের নীতিনিয়ম ও সংস্কারের বন্ধন সেখানে অনুপস্থিত। কনস্টেবলদের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটি অসঙ্কোচে নগ্ন-দেহে নৃত্য করেছে। প্রবল স্রোতোবেগের মতো তার জীবনের ছন্দ, তাই সেখানে আবর্জনা সঞ্চিত হতে পারে না। তাই 'এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও, তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না'। জীবনের এই সহজ ও অবিকৃত রূপকে তারাশঙ্কর পর্যবেক্ষণদক্ষ বর্ণনায় শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে পরিবারের বিরোধ কাহিনী। কাহিনীটির রস পারিবারিক। দুই পরিবারের পারিবারিক বিরোধের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছবি কৌতুক-মাধুর্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। উপকাহিনী হিসাবে বর্ণিত হলেও এই ছোট্ট কাহিনীর একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রসমূল্য আছে। বিশেষত দুই বাড়িব দুই কর্তার স্বল্পরেখ চরিত্র দুটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই পারিবাবিক বিরোধকে যাদুকরীই কৌশল-চাতুর্যের দ্বারা বিরোধমুক্ত কবেছে। যাদুকরীর তথ্যসমৃদ্ধ জীবনচর্যার সঙ্গে এই রস-মধুর স্বল্পবেখ কাহিনীটি যুক্ত না হলে সার্থক গল্প হত না—হত একখানি পর্যবেক্ষণ-নিপুণ চিত্র মাত্র। তারাশঙ্কর সুকৌশলে তথ্যকে রসমুক্তি দিয়েছেন।

'বেদেনী' গল্পের রসনিবিড়তা ও কাহিনীর ঘনবদ্ধতা বিস্ময়কর। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধিকা বেদেনী। শুধু বিশেষ সম্প্রদায়েরই নয়, এই চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর আদিম নারীমনের চিরন্তন অভীপ্সার ইতিহাসকেই রূপ দিয়েছেন। রাধিকা চরিত্রটির আপাত অসঙ্গতির মধ্যে যে সমন্বয়সূত্রটি আছে তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত। রাধিকা বেদিনীর পূর্বকাহিনীটির সংক্ষিপ্ত অবতারণার ফলে তার আচার-আচরণ ও মানস-পরিবর্তনের একটি কার্যকারণসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধিকার স্বামী ছিল শিবপদ বেদে—'শান্তপ্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ।' বেতের কাজ করে তার ভালো উপার্জন হত। তাদের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের আকাশে একদিন মেঘ ঘনিয়ে উঠল। 'উগ্র পিঙ্গল-বর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ' শম্ভু বেদের প্রথম দর্শনেই সে তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল তেমনি পাঁচবছর পরে তরুণতর কিষ্টো বেদের তাঁবুতে আগুন দিতে এসে তার পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে সে আবার আত্মসমর্পণ করেছে।

রাধিকা বেদনী কোনো সংস্কারের বন্ধনকে স্বীকার করে নি, সে তার আদিম জৈববৃত্তির আহ্বানকেই অভ্রান্তভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। 'বীরভোগ্যা ধরণী রমণী'—এই সুপরিচিত আপ্তবাক্যটি গল্পটির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবপদ ছিল শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু শম্ভু বর্বর পৌরুষের প্রতীক—তাই স্বাভাবিকভাবেই বেদেনী অকুণ্ঠচিত্তে তার কাছে আত্মদান করেছে। তবুও জোয়ান পুরুষ, ছ-ফুটেরও বেশী লম্বা, তরুণতর কিষ্টো বেদে প্রথম দর্শনেই তার মন আবার হরণ করেছিল। তারাশঙ্কর বেদেনী চরিত্র রচনায় দু-একটি তির্যক রেখা এঁকেছেন তা না হলে চরিত্রটি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। নূতন বাজীকরের আগমনে শম্ভুর মতো সেও 'হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি মতোই জ্বলে উঠেছে। মদ্যপান ও প্রগলভ রসালাপের মধ্যেও সে নূতন বেদের দিকে বিষধর সাপ ছুড়ে দিয়েছে। তারপর নূতন বেদে যখন যথার্থই 'কালিয়দমন' করেছে তখনই বেদেনীর পরাজয় ঘটেছে।

কিষ্টোর তুলনায় নিজেদের দীনতার কথা চিন্তা করে হিংস্রতায় ক্রোধে সে উন্মত্ত হয়েছে। এই দীনতার মূলে যে শম্ভু, একথাও বার বার মনে করে তার উপরেও সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নূতন বেদের উপর প্রতিহিংসা-বাসনা যখন শম্ভুর প্রবলতর সেই সময় সে সুকৌশলে মদের বোতল সরিয়ে তাকে পুলিশ-দারোগার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। আবার কিষ্টো বেদের তাঁবুতে আগুন-ধরাতে গিয়ে এই নৈশ অভিসারিকা তারই বাহুবেষ্টনে ধরা দিল, এবং শেষ পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে দিল শম্ভু বেদের তাঁবুতেই। ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রেম—বেদের, চরিত্রে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তার তির্যক ও স্বল্পাবৃত রেখা কয়টি লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। দুই বেদের দুইটি বাঘ—চমৎকার দুটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আদিম জৈববৃত্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই দুটি পশু-প্রতীক গল্পটিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে :

> রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠেতেছিল উহাদেব সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ ; অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। (পৃঃ ৮১)

পশুপ্রতীকের ঋজু আলোকরশ্মি আদিম নারীর ঘৃণা ও আসক্তিকে অসামান্য মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে !

'মেলা' গল্পটি মূলত চিত্রধর্মী। মেলার বৈচিত্র্য ও বিচিত্র মানুষের নানা আচার-আচরণকে এই গল্পে নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আনন্দ-বাজার' বা বেশ্যাপটীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও লেখকের বাস্তবনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যনিষ্ঠা ও বর্ণনার ঘনবদ্ধ রূপ গল্পটিকে বিচিত্রবর্ণ চিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এই বিচিত্র বর্ণ ও বর্ণনা গল্পটির বহিরাবরণ মাত্র। বহু-কণ্ঠের কোলাহল ও ছন্দোহীন প্রমত্ত জীবনের নিভৃতে যে একটা শান্ত-বিরল করুণ-মাধুর্য আছে, শিল্পী তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। পণ্যানারী কমলির জীবনে আজ এক মুহূর্তে বঞ্চনা ও শূন্যতার বেদনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোট্ট মেয়ে মণির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার অবরুদ্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রূপোপজীবিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের এই নিগূঢ়সঞ্চার গল্পটির সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য :

> মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী! মা তো খায় না।
>
> মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।
>
> মণি কহিল—তুমি শোও।
>
> হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।
>
> মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। (পৃঃ ১৩০-৩৩)

কমলি চরিত্রটি যেন বসন্ত চরিত্রটি পূর্বাভাষ। পণ্যানারী কমলির জীবনে যে অবরুদ্ধ বেদনা কয়েক ফোঁটা চোখের জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল 'কবি' উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় তা-ই গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আদর্শবাদের আতিশয্য ও সুলভ ভাবালুতা তারাশঙ্করকে বিচলিত করে নি অথচ তিনি কত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চিরন্তন মানব-সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

(৪)

তারাশঙ্কর রাঢ়ভূমির শিল্পীভাষ্যকার। এই ভূগোল-ভূমির কোনো অংশই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে নি। মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তিনি এই অঞ্চলের সামাজিক উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাসেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জমিদার-সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী। একে বাদ দিলে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনাই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ গত দু-তিন শতাব্দী ব্যাপী এই ভূস্বামীগোষ্ঠীই সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের এক একটি আঞ্চলিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-ব্যর্থতার কাহিনীর গড়ে উঠেছে। পাল-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, সঙ্গীত-শিল্পকলা, আশ্রিত-বাৎসল্য, দান-খয়রাত—এই ভূস্বামী সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন সম্ভব হয়েছে—তেমনি প্রজাপীড়ন, অর্থ-শোষণ ও নৈতিকাপরাধ তাদের ইতিহাসের একটি অংশকে মসীমলিন করে রেখেছে। এর সবটুকুকে নিয়েই এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস। তাই সে যুগের কাহিনী লিখতে বসে ভৌমিক-বাংলার এই কেন্দ্রশক্তিকে অস্বীকার করলে অবাস্তবতারই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। জমিদার-সম্প্রদায়ের ছবি আঁকার মধ্যে অতীতাশ্রয়ী রোমান্স-চিত্রণের অবকাশ আছে সত্য, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে অযথা বিকৃত করার মধ্যেও বাস্তববুদ্ধির কোনো পরিচয় নেই।

তারাশঙ্কর রাঢ়ভূমির জমিদারবর্গের অন্তরঙ্গ ইতিহাস বলেছেন। তার রচনায় জমিদার-সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্নদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষরশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠেছে। তারাশঙ্করের দিক থেকে এ ছবি সম্পূর্ণ বাস্তব। জমিদারপ্রধান গ্রাম লাভপুরের তাঁরাও ছিলেন জমিদার। জমিদারদের সমৃদ্ধির শেষ অঙ্কের যেমন তিনি দর্শক, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সঙ্গে নব-জাগ্রত ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের 'বিচিত্র বিরোধে'র আবহাওয়াতেই তাঁর কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর দেশ-কালের বিশ্লেষণ করেছেন :

১৩০৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদার প্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও দুটি বংশ, ঐ সরকারবাবুদের দৌহিত্র-

বংশ। ···ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। বীরভূমের জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। ···এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।[১২]

'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘর'—গল্পযুগল তারাশঙ্করের শিল্পকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'রায়বাড়ি' গল্পে রাজারামপুরে রায়-পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি আঁকা হয়েছে। রায়বাড়ির মহিমা-সুগম্ভীর পশ্চাৎপটে রাবণেশ্বর রায়ের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ স্বল্প অথচ বলিষ্ঠরেখায় আঁকা হয়েছে। চারিত্রিক আভিজাত্য, সমুন্নত মহিমা, তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, আতিথ্যনিষ্ঠা, নির্মম প্রতি-হিংসাপরায়ণতা বজ্রকঠোর দৃঢ়তা নিদারুণ শোকের মধ্যেও অবিচলিত ধৈর্য—এই বিচিত্র দোষগুণের সমন্বয়ে রাবণেশ্বরের চরিত্র অসাধারণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। এবং এই গাম্ভীর্য ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যে দু-একটি পরিহাস-তরল মন্তব্য মেঘ-স্তম্ভিত আকাশের চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তির মতোই মনে হবে। তবে এই দু-একটি মন্তব্যই রায়কে খানিকটা সহজ মানুষে পরিণত করেছে।

শ্যামপুরের প্রজাদের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় রায় গোটা গ্রামটাকেই পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। কালী বাগদীর নৈপুণ্যে রায়ের অভিপ্রায় পূর্ণ হল। কিন্তু কিছুকাল পরে রায়বাড়ির উপরে নিয়তির নির্মম অভিশাপ বর্ষিত হল। পুণ্যাহের আগের দিন জলসাঘরে যখন মজলিশ জমে উঠেছে, তখন—সেই পরিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে রায়-গিন্নীর বজরা-ডুবির দুঃসংবাদ এল দৈব দুর্ঘটনার একটি অশুভ ইঙ্গিত রায়-গিন্নীর আশঙ্কা-দুর্বল হৃদয়ে পূর্বেই সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রজাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পর 'গান্ধারীর অভিশাপে'র কথাও তাঁর মনে হয়েছিল—বিপদের পূর্বাভাস তাঁর স্বপ্নের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে রাবণেশ্বরের চরিত্রে অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই অসঙ্গতিই সে যুগের জমিদার শ্রেণীর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণে রাবণেশ্বরের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

১২. 'আমার কালের কথা', পৃ ৫-৬।

কালী বাগদী ও কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত—চরিত্র দুটি লেখকের শক্তির পরিচয় দেয়। কালী বাগদীর নিঃশব্দ পদসঞ্চার, নীরব আজ্ঞানুবর্তিতা, অব্যর্থ কর্মদক্ষতা, ভীতি-বিহ্বল পটভূমিকায় এক রোমাঞ্চিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ভগ্নদূতের মতো সে যখন দুঃসংবাদটি নিয়ে এল, তখন 'মুহূর্তে রাক্ষসের মত সে আর্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।' কালী বাগদীর রহস্য-নিবিড় ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটি অজ্ঞাত অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্তের রসিকতা গল্পটির স্তম্ভিত পরিবেশের মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

'জলসাঘর' এই রায়বংশেরই সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের কাহিনী। বিশ্বম্ভর রায় ক্ষয়িষ্ণু রায়বংশের শেষ প্রতিনিধি। প্রথম গল্পটিতে এই বংশের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের যেমন গৌরবোজ্জ্বল মধ্যাহ্নদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় গল্পটিতে পতনোন্মুখ রায়বংশের সায়াহ্ন-ম্লানিমা এক করুণ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। ক্ষয়িষ্ণুতা ও শ্রীহীনতার কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ এই অসামান্য কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করেছে। গল্পটির প্রারম্ভ অতীতস্মৃতি রোমন্থনের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে রচিত হয়েছে। বর্তমানের শ্রীহীনতা ও দারিদ্র্যের জীর্ণ ছবির পাশে অতীত-গৌরবের স্মৃতি বিশ্বম্ভর রায়ের চিত্ত আলোড়িত করে। অভিমান ক্ষুব্ধ আভিজাত্য ও বেদনাহত আত্মমর্যাদাজ্ঞান তাঁর চরিত্রে বিশালতা এনে দিয়েছে। শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায় নিজের গৃহকোণেই তাই আত্মগোপন করেছেন। শুধু তুফানের উচ্চ হ্রেষারব ও ছোটগিন্নীর গর্জন মাঝে মাঝে তাঁকে অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মূক প্রাণী দুটির ভূমিকা গল্পটির রসকেন্দ্রকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

নূতন ধনী গাঙুলীবাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে এক বসন্তবিহ্বল জ্যোৎস্নামত্ত রাত্রিতে সুরা ও বাইজীর যৌবনমদিরার মোহে কিছুকালের জন্য যেন অতীতবৈভব ও বিগতযৌবনকে ফিরে পেয়েছিলেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু দিনের আলোয় সে বিভ্রমময় মায়াস্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যায়, নির্বাপিতপ্রায় ঝাড়লণ্ঠনের আলোর প্রাচীরবিলম্বী পূর্বপুরুষদের মুখে মত্ত হাসি ফুটে ওঠে—'সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।' সাত পুরুষের মোহমত্ততা যে অভিশপ্ত

আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, তারই নিগূঢ় সঙ্কেত উপলব্ধি করেন বিশ্বম্ভর। বাতি নিবিয়ে দিয়ে জলসাঘর বন্ধ করার হুকুম দেন, আর হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া' পড়ে। শেষবারের মতো যেন অতীতের উদ্যত শাসনদণ্ড নিরুপায় বেদনায় অদৃষ্টের পাষাণ-শিলায় মাথা কুটে মরেছে।

ক্ষয়িষ্ণু অতীতের বেদনাকে তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। নূতনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পুরাতনের অন্তর্বেদনা ও ট্রাজিক রসকে যেমন তিনি নিপুণ নিষ্ঠায় রূপ দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নূতনের স্পর্ধিত পদক্ষেপ ও অব্যাহত জয়যাত্রাকেও অবিকম্পিত রেখায় দ্বিধাহীন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রায়বংশের জীর্ণপ্রাসাদের উপর যেমন নৈশনীরবতা এক মৃত্যুবিবর্ণ ছায়া বিস্তার করেছিল, তেমনি তার পাশে 'এ অঞ্চলের হালে-বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অবিকম্পিত ভাবে জ্বলিতেছিল'। তারাশঙ্কর পুরাতনের অন্তর্জীর্ণতা ও আর মহিমা-সুগম্ভীর আভিজাত্যের মধ্যে যেমন এক মর্মান্তিক ট্রাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, তেমনি নূতনের সম্ভাবনাদীপ্ত আবির্ভাবকেও তাঁর রচনায় অনিবার্য করে তুলেছেন। জগৎ-বিধান তথা সমাজ বিধানের এই সত্যকে নির্মম-নৈপুণ্যে রূপ দিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃতক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পটোত্তলিত হয়েছে গ্রামবাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের উপর—যেখানে কিংবদন্তী ও সংস্কারের মধ্যযুগীয় আবছা অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটে নি, এবং উপন্যাসটি শেষ হয়েছে আধুনিক কলকাতার নাগরিক পটভূমিতে এসে—যেখানে দেশপ্রেম ও অভিনব জীবনচেতনার শপথ উচ্চারিত হয়েছে। 'কালিন্দী'তে ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হয়ে নববলদৃপ্ত শিল্পপতি মিঃ, মুখার্জির শক্তি-বৃদ্ধি করেছে। 'পঞ্চগ্রামে'র প্রবীণ ন্যায়রত্ন নবীনের সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে দেশত্যাগ করেছেন—এবং ন্যায়রত্ন পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করে সাম্যবাদের মন্ত্র-উচ্চারণ করেছে।

পুরাতনকে জীর্ণ ও গতিশক্তিহীন ভেবে তারাশঙ্কর তার উপর নির্মম হতে পারেন নি। ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পল্লীসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত নিবিড় যে তাকে খুব সচেতনভাবে তিনি যেখানেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন, সেখানেই নানা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। যুগ-জীবনের রূপান্তর লীলাকে তিনি

ব্যাখ্যাই করেছেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু পুরাতনের পতনের মধ্যে যে মহিমা সুগোপন আছে, তার প্রতি তাঁর বেদনাময় সশ্রদ্ধ মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি স্বীকৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।[১৩]

নূতনের কাছে পুরাতনের পরাজয় ঘটেছে, জমিদারদের স্থান অধিকার করেছেন মিল-মালিকেরা, চাষীরা পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে। আর একটি প্রসঙ্গও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর শুধু যে অতীতের মোহাবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাই নয় ; তিনি অতীতের বহুজীর্ণ আভিজাত্যলেশহীন 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার'দের করুণ অথচ হাস্যকর ছবিও এঁকেছেন। সবটা মিলিয়েই যে তারাশঙ্করের অতীত, একথাও মনে রাখতে হবে।

শিল্পবিচারে 'জলসাঘর,' 'রায়বাড়ি' থেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অতীত রোমান্সের বিলীয়মান ঐশ্বর্য-বর্ণনাতেই শুধু নয়, নাটকীয় ও ট্রাজিক মহিমা-বর্ণনায় কাহিনীটি তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্ভুক্ত। চাবুকের শব্দে গল্পটির চকিত উপসংহার যেন নিষ্ফল আক্রোশে একটি যুগেরই সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

৫

প্রচলিত ধারণা এই যে তারাশঙ্কর প্রেমচিত্র অঙ্কনে দুর্বল—এই বিশেষক্ষেত্রে তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু তারাশঙ্করের রচনায় 'আদিরসে'র অভাব দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

Another respect I find Tarashankar lacking in is what our Sanskrit aestheticians called the *adirasa* or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, rasa being untranslatable) : I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite forms, but invariable

১৩. আমার কালের কথা,' পৃ ১২।

in substance: the subject, totally or partly of so large, so overwhelmingly large a body of the world's literature.[১৪]

উদ্ধৃত অভিমতটির মৌলিকতা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই নৈতিবাচক মন্তব্যটি তারাশঙ্করের মানস-বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। তাঁর রচনায় প্রেমচিত্রণ নিতান্ত বিশেষত্বহীন ও স্বভাব-শীতল, এ ধরনের অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যথার্থ কিনা এবং যথার্থ হলে এই জাতীয় অভিমত তারাশঙ্করের শিল্পীপ্রকৃতির কি পরিচয় দেয়, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্রলীলা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোছায়া, ব্যতিক্রমগুলির তীব্রতীক্ষ্ণ দ্যোতনা প্রাধান্য বিস্তার করে নি। সমকালীন লেখকদের সঙ্গে এইখানে তাঁব বড পার্থক্য সন্দেহ নেই। আদিম-বৃত্তির অন্ধলীলা অঙ্কনে তিনি দক্ষশিল্পী, কিন্তু প্রেম যেখানে বিচিত্রলীলায় ইন্দ্রধনুব বর্ণচ্ছটায় বিলসিত, সেখানে তাঁর দৃষ্টি কদাচিৎই আকৃষ্ট হয়েছে।

এর মধ্যে আবার দাম্পত্য প্রেমের চিত্র সবচেয়ে অনুজ্জ্বল। তারাশঙ্কব এই আদিমবৃত্তিটির প্রাথমিক (Elemental) রূপকে তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎরেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার পরবর্তী স্তরগুলির বিচিত্র বিচিত্র বিকাশ তাঁর রচনায় স্থান পায় নি। তারাশঙ্কর প্রেমের আদিমতম রূপটিকে বলিষ্ঠ রেখায় এঁকেছেন। অন্ধ বাৎসল্য, হিংস্র প্রতিহিংসা স্পৃহা, নির্মম ক্রূরতা, নির্লজ্জ লালসা, অসংযত জৈবক্ষুধা—এখানে অকপট ও সহজভাবেই প্রকটিত। জীবনের সমগ্রবিশাল স্থাপত্যমহিমাই তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে তিনি কানো সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। তারাশঙ্করের মনোজীবনে এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে তথাকথিত প্রেমবৈচিত্র্য চিত্রণে বিমুখী করেছে।

তবু একথা স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, তারাশঙ্কর প্রেমের গল্প লিখতে পারেন নি। তাঁর অনেকগুলি গল্প এর স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়। বর্তমান সঙ্কলনের 'রসকলি,' 'ঘাসের ফুল,' 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি গল্পে তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। 'রসকলি' তাবাশঙ্করের প্রথম গল্প এবং প্রথম প্রেমের গল্পও বটে। প্রথম পদক্ষেপেই তিনি এক নিগূঢ় রসলোকের সংবাদ দিলেন। গোটা গল্পটি মঞ্জরীর বিচিত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে

১৪. 'An Acre of Green Grass', P. 84

উঠেছে। মঞ্জরী পুলিনের বাল্যসখী। খুড়ো রামদাসের প্রথমে এ বিবাহে আপত্তি ছিল—পুলিনের আগ্রহাতিশয্য দেখে শেষে বৃদ্ধ মহান্ত এ বিবাহে রাজীও হয়েছিল। কিন্তু প্রণয়ীযুগলের প্রেমসম্পর্কটি বিবাহের মন্ত্রে বাঁধা পড়ার আগেই গোপিনীর আবির্ভাব হল। মঞ্জরী-পুলিনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বহু কটুকটাক্ষ বর্ষিত হয়েছিল। গোপিনীর ঈর্ষাতিক্ত বক্রোক্তি, মৃত্যুকালে মহান্তর অশালীন ইঙ্গিত, গ্রামের লোকদের কানাকানি—কিছুই মঞ্জরীকে বিচলিত করতে পারে নি।—গোপিনীর সর্বনাশ সাধনের সমস্ত উপকরণই তার হাতে ছিল। কিন্তু সে কখনোই সে পথে পা বাড়ায় নি।

অচরিতার্থ প্রেমের অশ্রুঘন বেদনাকে মঞ্জরী এক অপরূপ রসসত্তায় পরিণত করেছে। তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, পরিহাস-রসিকতা, গোপিনীর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক, পুলিনের প্রতি নীরব ভালোবাসা প্রভৃতির মধ্যে এমন একটি সহজ স্বাভাবিক প্রাণশক্তির পবিচয় পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। মঞ্জরী এমন এক রসধারা যা কলঙ্কের স্পর্শেও নিষ্কলুষ, বেদনায় যার বিকৃতি নেই, আনন্দেও যার সহজ চলার ছন্দ অভিভূত হয় না :

> চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপছিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না। (পৃঃ ৪)

মঞ্জরীর এই ব্যক্তিত্ব গল্পবিবৃতির ভাঁজে ভাঁজে উন্মোচিত হয়েছে। চরিত্রটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ, কিন্তু লঘু নয়। অচরিতার্থ প্রেম তার হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে মধুচক্র রচনা করেছে ; তার আভাস-ইঙ্গিতে যে বেদনা-সুন্দর লঘু বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে,—গল্পটির যথার্থ শিল্পরূপ সেখানেই নিহিত। পুলিন যেদিন মঞ্জরীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, মঞ্জরীর সেদিনকার অবরুদ্ধ বেদনা লেখক কত সংযত ভাবে রূপ দিয়েছেন। পুলিনের দাম্পত্য-সঙ্কটের সে-ই সমাধান করে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেছে। মঞ্জরী যে রসের সাধিকা, সে রস বেদনাকে সুন্দর করতে জানে। বৈষ্ণবের প্রেমসাধনা তার চরিত্রে যেন রূপপরিগ্রহ করেছে। মঞ্জরীর কণ্ঠে—

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।

সঙ্গীতটিই এই গল্পের যথার্থ ভাবরূপ।

'ঘাসের ফুল' একটি সার্থক নামা গল্প। কলিয়ারির একটি তুচ্ছ কাহিনী—ঘাসের ফুল—কত পথিকই না তাকে পদদলিত করে! কলিয়ারির লেবার রেজিষ্ট্রার বিনোদ স্বরূপ তরুণ ও সুকণ্ঠ গায়ক। কুলীমেয়ে চুড়কী তার গান শুনতে ভালোবাসে। তার আব্দার, বিনোদকে গান শোনাতে হবে, তার বদলে সে একটি করে জবাফুল দেবে। এমনি করেই কুলীদের এই মেয়েটির সঙ্গে বিনোদের একটি সহজ-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেয়েটি তার মাঝিকে গোপন করে তার গান শুনতে চায়: 'একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলবি।'

এর পরেই এল কাহিনীর চূড়ান্ত মুহূর্ত। অতুলের নেতৃত্বে খাদ বাঁচানোর আয়োজন চলছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন খাদের মধ্যে চুড়কীর প্রগল্‌ভতায় বিনোদ তার মুখে জুতো ঘষে দিল। অভিমানাহত চুড়কী কান্নায় ভেঙে পড়ে—সেখান থেকে তার নড়ার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। সেই অবকাশে চিরদিনের জন্য পনের নম্বর গ্যালারির মুখ বন্ধ হল। বিনোদের শেষ প্রতিবাদের উত্তরে একঘণ্টার জন্য কালিয়ারি ছেড়ে যাওয়ার কঠিন নির্দেশ এল। যন্ত্রের নির্মম পেষণে এইভাবে প্রকৃতির মতো সহজ 'ঘাসের ফুল' চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হল। ছোটগল্পের সংযম ও সংক্ষিপ্ততা এখানেও লক্ষ্যণীয়। এখানে প্রেমের কোনো পূর্ণায়ত ছবি আঁকা হয় নি—দু-একটি সংক্ষিপ্ত রেখায় আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র। যান্ত্রিক জীবনের নির্মম আবর্তনের বৈপরীত্যে এই ছোট্ট বেদনার্দ্র কাহিনীটি ঘাসের ফুলের মতোই রক্তরেখায় জেগে থাকে।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পটির মধ্যেও একটি মৃদু সৌকুমার্য আছে। 'ঘাসের ফুলে'র মতো এখানেও তেমন কোনো জোরাল নাটকীয় ঘটনা নেই—কিন্তু গল্পটি ঘিরে একটি দৈববিড়ম্বিতা নারীর ব্যর্থজীবন করুণ-লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সৎবাপের তাড়নায় জেলেদের ছেলে পশুপতি পুরীর পাণ্ডাদের দলে ভিড়ে যায়। তারপর নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সে জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে নানাদেশ ঘুরে এসেছে। দেশে ফিরে এসে সে জেলেপাড়ায় মদ-মাংসের ভোজ দিয়েছে। ভোজের আসরে বিদেশের 'জোড়া মিলকে নাচে'র

কথা তার মনে পড়েছে। নবীন জেলের যুবতী মেয়ে রামদাসীকে সে নৃত্যসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করেছে। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট ভালো না—এই বয়সেই সে তিনবার বিধবা হয়েছে। পশুপতির মা তাই এই বিয়েতে আপত্তি করেছে।

পশুপতি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম—সে কোনো নীতি-নিয়মের শাসন মানে না। বিয়ে তার ঠিক হল। পাড়ার প্রান্তে ঘরও তৈরী হল। জিনিসপত্র কিনতে পশুপতি চলে গেল কলকাতায়। যাওয়ার সময় রমা মা-চণ্ডীর কবচ তার হাতে বেঁধে দিয়ে বলেছিল: 'আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে নয়, রণে বনে অরণ্যে মা তোমায় রক্ষা করবেন।' কিন্তু পশুপতির আর ফেরা হয় নি, কিছুদিন পরে তার সেই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একটি জাহাজ ধ্বংস হয়—পশুপতিই একমাত্র রক্ষা পেয়েছিল। রমার কবচই যে তাকে রক্ষা করেছে, পশুপতি একথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেছিল।

রমা-পশুপতির সম্পর্কটি বিচিত্র। দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির নরনারীর এই প্রেম-সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত দৈবাহত হয়েছে। পশুপতি উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরে ও বেপরোয়া। রমার সান্নিধ্যে এসে ক্ষণিকের জন্য তার নীড় রচনার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মাত্র। কিন্তু তার বন্ধনহীন উদ্দাম জীবনে দেশ-বিদেশের বিদেশিনীদের আকর্ষণ তার সমস্ত সঙ্কল্প ভুলিয়ে দিয়েছিল। কাহিনীর মধ্যে রমার ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। ভাগ্যবিড়ম্বিতা মেয়েটি হয়ত তার অতীত দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেই পশুপতির হাতে কবচ বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হতভাগ্য মেয়েটি পশুপতির নূতন ঘরেই আত্মহত্যা করেছে। এই শান্তস্নিগ্ধ মেয়েটির কোনো দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করা হয় নি—সহৃদয় পাঠকচিত্ত যাতে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সেই অপরিমেয় বেদনাকে পূর্ণতর করে তুলতে পারে, লেখক সে অবকাশ দিয়েছেন। চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে এই মেয়েটির চরিত্র-রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—'কাঁচ ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির, ধীর।' একটি সাধারণ মেয়ের নীরব-প্রেম গল্পটির মধ্যে এক বেদনাঘন সূক্ষ্ম সুরভি সঞ্চারিত করেছে।

'নারী', গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক। বিচিত্ররূপিণী নির্মলার জটিল চরিত্র অঙ্কনে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্বের এমন জটিল চরিত্র যথার্থই দুর্লভ। তাঁর চরিত্রগুলি সাধারণত সরল, সহজ ও বলিষ্ঠ। কিন্তু রহস্যময়ী নির্মলা চরিত্র রচনায় তিনি স্বতন্ত্র শিল্পপদ্ধতি প্রয়োগ

করেছেন। বিধবা নির্মলা রমেনের রুগ্না মাকে সাহায্য করতে এসে রমেনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হয়ে সন্তানসম্ভবা হয়। রমেন তাকে বস্তির একটি ঘরে রেখে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়েছিল। এই উপলক্ষেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয়। দীর্ঘকাল পরে ডাক্তারের কাছে যখন সে আবার এল, তখন সে বেশ্যা—রক্তে তার উপদংশের বিষ। যে ধনবান ব্যক্তির সে রক্ষিতা তার অর্থানুকূল্যেই নির্মলা ক্ষয়রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তার খেয়াল খুশি মেটাতে গিয়ে নির্মলাও মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়। কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনার অভিযোগে কণ্ট্রাক্টার ভদ্রলোকটির জেল হয়। এই অবকাশে নির্মলা হাসপাতালের নার্স হল। কিছুকাল পরে বিষ খেয়ে সে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে ডাক্তারের কাছে সে যা লিখেছিল, তা থেকেই তার মানসিক জগতের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

নির্মলার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছে। প্রথম দর্শনের দিনে এই শান্তস্তব্ধ ধৈর্যময়ী মেয়েটিকে ডাক্তারের ভালো লেগেছিল। তার সঙ্গে তিনি নৈশ নদীর নিথর রূপের মিল দেখতে পেয়েছিলেন:

> নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ, দিন রাত্রির মধ্যে তার অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না। মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা। (পৃ ৪৩৪)

এই অসামান্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে মেয়েটির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। 'রাত্রির অস্পষ্টতা' ও 'নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি'—এই দুটি বাক্যাংশ নির্মলার চরিত্ররূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। নির্মলার জীবনের দ্বিতীয় পর্বে সে অসঙ্কোচে ডাক্তারবাবুকে জানায় যে, সে বেশ্যা, এবং মদ্যপানে সে অভ্যস্ত। তৃতীয় পর্বে এই রহস্যময়ী নার্স হয়। সেখানে তরুণ ডাক্তারদের গুঞ্জন তিক্তবোধ হওয়ায়—সে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খায়। আপাতদৃষ্টিতে নির্মলার জীবনের এই তিনটি পর্বের কোনো মিল নেই। কিন্তু একটি নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক সূত্র এই তিনটি পর্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। নির্মলাই তার মৃত্যুকালীন চিঠিতে এর সঙ্কেত দিয়েছে—'বেঁচে কি লাভ? ভালো লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তারবাবু, মানুষ তা বুঝতে পারে

না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে কি চেয়েছিল।'

নির্মলার দোলাচলবৃত্তি কোনো একটি বিশেষ আশ্রয়ে তাকে দীর্ঘদিন থাকতে দেয় নি। তার অর্থ এ নয় যে, মেয়েটি স্বভাবেই বহুবল্লভ। বরং তার চরিত্র থেকে উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রধর্ম একটি মৌলিক এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে সে বৈচিত্র্যবিলাসিনী নয়, প্রেম-সন্ধানী। প্রেমই তার প্রার্থিত বস্তু। বহুপুরুষকে আশ্রয় করেও সে প্রেম পায় নি। কখনো কখনো ভালো লাগলেও, ভালোবাসতে সে কাউকেই পারে নি। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সত্যই মৃত্যুর আগে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'—রবীন্দ্রোপলব্ধির এই চরম সত্যই নির্মলা চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। কাম্যবস্তু অনুসন্ধানে মেলে না, হঠাৎ পাওয়া যায়। গল্পের শেষে ডাক্তারবাবুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নির্মলার প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেয়েছে। ভক্তি থেকে প্রেম—নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু নির্মলার জিজ্ঞাসা চিরকালের একটি জটিল প্রশ্ন। মনোবিজ্ঞানী এর যথার্থ সদুত্তর দিতে পেরেছেন। নির্মলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে দেহকে বিক্রয় করেও তার মনের উৎকণ্ঠা দূর হয় নি—সেখানে কোনো মালিন্য ছিল না, ছিল প্রেমনিয়তির একটি অগ্নিজ্বালাময় প্রশ্ন। দেহ-মনের এই দ্বন্দ্ব, এই দুঃসমাধেয় প্রশ্ন, পূর্ণতর পটভূমিকায় ও বলিষ্ঠতর প্রতিশ্রুতিতে আর একবার রূপ পেয়েছে 'সপ্তপদী'র রীনা ব্রাউন চরিত্রে। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেতে ও প্রেমরহস্যের জটিল জিজ্ঞাসায় 'নারী' গল্পটি তারাশঙ্করের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।

তারাশঙ্কর এক সময় লিখেছিলেন: '…আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন—প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।'[১৫] তারাশঙ্কর প্রেমের গল্প বেশী লেখেন নি, একথা সত্য, কিন্তু প্রেমের গল্প রচনায় তিনি 'আড়ষ্ট', একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলে প্রেমের গল্পের সংজ্ঞাকেও নূতন করে ভেবে দেখতে হয়। প্রেমের গল্পকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে দেখলে তারাশঙ্করের এই অভিমতটিকে সত্য বলে মনে হতে পারে। একথা সত্য যে, তাঁর গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বিরহ-মিলন নেই, ট্রামে-বাসে কলেজে-কর্মক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীরচটুল প্রেমাভিনয় অনুপস্থিত, উচ্চশিক্ষিত

১৫. 'স্ব-নির্বাচিত গল্প', গোড়ার কথা।

বুদ্ধিজীবী সমাজের ড্রইংরুমে নিম্নকণ্ঠ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়-বিনিময়ের পালাও এখানে চলে না, দাম্পত্য-জীবনের রঙীন রোমান্স-চিত্রণের দিকেও তাঁর আগ্রহ নেই। তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার স্বরূপই স্বতন্ত্র। প্রেমের স্বরূপটিকে তিনি গভীর ভাবেই অনুধাবন করেছেন। তরল ও চটুল প্রেমাভিনয়ের চিত্র চিত্রণে তাঁর কোনোই আগ্রহ নেই।

তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে। প্রথমত, তিনি তথাকথিত 'বিশুদ্ধ প্রেমে'র গল্প লেখেন নি। কেননা তাঁর রচনায় প্রেমানুভূতি একাধিক ভাবানুষঙ্গে বিচিত্রিত হয়েছে। কখনো তা জৈববৃত্তির সঙ্গে মিশেছে, কখনো বা কোনো বৃহত্তর আইডিয়ার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে, আবার কদাচিৎ মনস্তাত্ত্বিক রহস্যে জটিল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে তারুণ্যের রসোচ্ছলতার চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের ভাবস্থির অনুভবই প্রাধান্য লাভ করেছে। তৃতীয়ত, তাঁর প্রেমের গল্পের পরিণতি মিলনাস্তক হয় না—সুলভ রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। প্রেমনিয়তির বিয়োগান্তক পরিণতি তাঁকে জীবনরহস্য চিত্রণের নূতন সুযোগ দিয়েছে। তিনি প্রেমচেতনাকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে পারেন না। প্রেমের কথা ভাবতে গেলেই তাই তাঁর গোটা জীবনের কথাই মনে পড়ে। তারাশঙ্করের প্রেমানুভূতির ধরনটাই আলাদা, এটা তাঁর আড়ষ্টতা নয়—তাঁর শিল্পী-প্রকৃতিরই এই বৈশিষ্ট্য। প্রেমচিত্রণে 'আড়ষ্ট' হলে 'কবি' বা 'সপ্তপদী' রচনা তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব হত না।

৬

তারাশঙ্করের অনেকগুলি গল্পে আদিম জৈবজীবন ও পশুকল্প মানুষের যে কাহিনী আছে, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অসাধারণ। মানবসভ্যতার অনেক-গুলি স্তর অতিক্রম করে তিনি সেই জৈবানুভূতি-সর্বস্ব জীব-জীবনের গহনে প্রবেশ করেছেন। কয়েকটি গল্পে পশুকল্প মানুষের পাশে সত্যিকারের পশুকেও দাঁড় করানো হয়েছে, তাদের সগোত্রীয়তা দেখানোর জন্য। পশুর চেয়েও পশুকল্প মানুষ বীভৎস। তারাশঙ্কর পশুকল্প মানুষ চিত্রণে প্রবৃত্তির আদিম প্রবলতাকেই এক বিশাল ও মহিমান্বিত রূপ দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তির সমুদ্ধত তরঙ্গশীর্ষে কখনো ঈর্ষার অসহ্য নীলাভ রূপ, কখনো বা লালসার পিচ্ছিল ফেনপুঞ্জ, কখনো বা স্নেহের করুণলাবণ্য, আবার কখনো বা সৌন্দর্যতৃষ্ণার

পদ্মরাগদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়। তারাশঙ্করের আদিম জীবন-চিত্রণের একটি বিশেষ ফিলোজফি আছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের সুরপরিবর্তন ও পটপরিবর্তন দুই-ই ঘটেছে। সভ্যতার কৃত্রিম আচ্ছাদনের আড়ালে মানুষ যে আসলে পশু, এই বিষয়টি নবযুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হল। তারাশঙ্করের বক্তব্য ঠিক তা নয়। আদিম-জীবনের একটি নিজস্ব রূপ আছে—যেখানে সে কারও বিকৃতি নয়, বিকল্প নয়। তারাশঙ্কর সেই আদিমকেই দেখেছেন, যা সমগ্র জীবনরসের গঙ্গোত্রী।

'নারী ও নাগিনী' গল্পটির মধ্যে জৈব আসক্তির এক অসামান্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাপের ওঝা খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তি বিস্ময়কর। তার জীবনের একদিকে স্ত্রী জোবেদা, অন্যদিকে এক সর্পিনী। পশুকল্প মানুষটির পাশব আসক্তির ভূমিকা রচনা করেছে তার বীভৎস দেহ—'শুধু পা খানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারেব ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।'

খোঁড়া অলঙ্কার পরিয়ে সিঁদুর দিয়ে সেই সর্পিনীকে নিকা করেছে। সে তাকে গলায় জড়িয়ে রাখে, চুমু খায়। আবার জোবেদার উপরও তার আসক্তি কম নয়। তাকে সে ভাবাবেগের প্রাবল্যে চুমু খেয়ে বলে—'তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশী।' তারপর খোঁড়া শেখের এই দ্বিধাবিভক্ত প্রেমিক-সত্তার উপরে দুর্বিপাক নেমে আসে। জোবেদা সর্পিনীকে দুচোখে দেখতে পারে না—তাকে সে আঘাত করেছে, সর্পিনীও জোবেদাকে দংশন করে তার প্রতিহিংসা নিয়েছে। খোঁড়ার প্রতিক্রিয়াটিও এই যুগ্ম আসক্তির মধ্যে অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করেছে :

> বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল শুধু—তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না। (পৃ. ২৯)

এর চেয়ে ভালো উপসংহার গল্পটির হতে পারত না। খোঁড়া তার অসংস্কৃত স্থূল জৈববৃত্তি দিয়ে যা বুঝেছিল, তারই আলোকে গল্পটির মর্মমূল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের এই গল্পপ্রসঙ্গে ব্যালজাকের 'A Passion in the Desert' গল্পটির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। সেখানেও একটি পাশব আসক্তির

অসামান্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মরুচারিণী বাঘিনী রূপমুগ্ধ তরুণ সৈনিকটির কাছে সামান্য বাঘিনী মাত্র নয়—আদিম নারীর বন্যসৌন্দর্য ও খরদীপ্ত বাসনা যেন তার দেহে-মনে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে। সৈনিকটির রূপমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাঘিনী—

It was a Female. The fur upon her breast and thighs shown with whiteness. The number of little spots like velvet looked like charming bracelet around her paws···The presence of the panther even sleeping, made him experience the effect which the magnetic eyes of the serpent are said to exercise upon the nightingale.[১৬]

ব্যালজাকের গল্পটির সেটিং অসামান্য। গল্পটির পটভূমি মরুবেষ্টিত আফ্রিকা। বালুকা সমুদ্রের উপর সূর্যের খররশ্মি, আফ্রিকার দগ্ধদিগন্তের জ্বালাময় উত্তাপ, জনহীন প্রান্তরের ভীষণরমণীয় সৌন্দর্য গল্পটির পরিবেশকে রোমান্টিক করে তুলেছে। এই বিবৃতি-প্রধান পটভূমির চিত্রণ, কাহিনীকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তারাশঙ্করের গল্পে খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তি, নাগিনীর প্রতি আকর্ষণেই রূপায়িত হয়েছে। নারী ও নাগিনী একই পুরুষের আসক্তির জন্য পরস্পর প্রতিযোগিনী হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্পটিতে মানবী ও নাগিনী দুয়েরই আবির্ভাবে বিশ্লেষণটি শাণিতদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই গল্পের উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁকে কিন্তু অপরিচিত পৃথিবীতে যেতে হয় নি, তিনি রাঢ়ের মৃত্তিকার মধ্যেই এই অলজ্জ জৈব-কামনার ছবি খুঁজে পেয়েছেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতা সত্ত্বেও ব্যালজাক রোমান্টিক যুগের সাহিত্যিক। অপরদিকে মনোধর্মের দিক থেকে তারাশঙ্কর রিয়্যালিষ্টিক। কত সামান্য উপকরণকে আশ্রয় করে তিনি বাংলাসাহিত্যের একটি বিস্ময়কর গল্প রচনা করেছেন, ভাবলে বিস্ময় হতে হয়। তীক্ষ্ণতায় ও অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে তারাশঙ্কর ব্যালজাককে এখানে অতিক্রম করেছেন।

'কালাপাহাড়' গল্পে দেখতে পাই পশুর সঙ্গে মানুষের নিবিড় আসক্তির

16. The world's Thousand Best Short Stories (Vol. III) Edited by Sir J. A, Hammerton, p, 169,

এই গল্পটির কথা অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। (বাংলা গল্পবিচিত্রা, পৃ, ১২০)

আরেক রূপ। এখানে জৈব আসক্তির আর একটি দিক দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। গল্পটিতে জৈব আসক্তি পরিশেষে সুস্থ মানবিক মমতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

রংলাল অবস্থাপন্ন চাষী। চাষকে ভালোবেসে সে তার গরুগুলির সঙ্গেও একাত্ম হয়ে উঠেছে :

বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয় এই কারণেই গরুর উপরে তাহার প্রচণ্ড শখ! তাহার গরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গরু তাহার পছন্দ হয় না। গরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোনোদিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে—আহা কেষ্টর জীব! (পৃ. ৪৭)

গল্পের শুরু থেকে রংলালের চরিত্র এমনভাবে আঁকা হয়েছে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সে পশুদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে এক করে তুলেছে। গরু কিনতে গিয়ে সে একজোড়া অতিকায় মোষ কিনে আনল, তাদের নাম দেওয়া হল 'কালাপাহাড়' ও 'কুম্ভকর্ণ'। এই অতিকায় মোষ দুটির কল্যাণে রংলালের কৃষিকর্মের সমৃদ্ধি হল। কিন্তু একদিন চিতাবাঘের হাত থেকে প্রভুকে রক্ষা করতে কুম্ভকর্ণ প্রাণ হারাল। সঙ্গীর বিরহে কালাপাহাড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কালাপাহাড়ের উপর রংলালের মমতা কম নয়, তবু বাধ্য হয়ে তাকে বিক্রয় করে দিতে হল। রংলালকে না দেখে সে উন্মত্তের মতো ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলল। এবং অবশেষে শহরের শান্তি বিঘ্ন করার অভিযোগে পুলিশ সাহেবের গুলিতে কালাপাহাড়ের বিশাল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'নারী ও নাগিনী'তে খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তিই তার নিয়তি। কিন্তু 'কালাপাহাড়' গল্পের কেন্দ্রীয় ভূমিকা কালাপাহাড়। তাই এই গল্পে অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কালাপাহাড় রংলালের অনুসন্ধানে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছিল, রংলালকে না দেখে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। প্রভুর প্রতি প্রবল আসক্তিই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। পশুসঙ্গী কুম্ভকর্ণ ও মানবসঙ্গী

রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের আসক্তি সমসূত্রে আবদ্ধ। কালাপাহাড় যেমন পশুসঙ্গীর মতো মানবসঙ্গীর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে, তেমনি রংলালও পশু-চেতনার সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব করেছে।

'কামধেনু' গল্পটিতে পশুর প্রতি মানুষের আসক্তি মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেত ও নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে; হত্যার অপরাধে ফাঁসির আসামী নাথুর পূর্বস্মৃতি পর্যালোচনা দিয়ে গল্পাংশ রচিত হয়েছে। সাধারণ বিবৃতিমূলক কাহিনী নয়। জেলের সেলে আবদ্ধ নাথুর বর্তমান অবস্থা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে, তার পূর্বস্মৃতির ছায়াছবিগুলি যেন একে একে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে কাহিনী-বিবৃতির নাটকীয়তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পটুয়াদের ছেলে নাথু। তারই ঘরে আবির্ভূত হল কামধেনু। বর্ণনার চাতুর্যে কামধেনুর বিশিষ্টতা রূপ পেয়েছে:

> গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই বলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়। সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং এক রাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে, তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে, কামধেনু সাড়া দেয়, ডাকতে থাকে; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জমে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনই ভাবে ডাকে কামধেনু···এতেও যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে, তবে কামধেনু তখন বসে পড়ে; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত করে দেখিয়ে দেয়। (পৃ, ২২০)

নাথুর কপাল ফিরে গেল। চড়া দামে কামধেনুর দুধ সে বিক্রয় করে। 'সুরভিমঙ্গল গান করে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা করে পায় দু-আনা চার আনা বকশিস।' তারপর দুবছর পরপর হল দৈব-দুর্বিপাক, অজন্মা ও মহামারী। 'পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হল কাঠ, তেতে হল আগুন, আকাশ গেল ঘন কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে।'

এ পর্যন্ত গল্পটির মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব নেই। বিবৃতিধর্মী এই গল্পটি এই অংশে নাটকীয় হয়ে উঠল, দেখা দিল অব্যর্থ-লক্ষ্য গতি ও কেন্দ্রসংহত

তীক্ষ্ণতা। ভূমিকম্পে যখন নাথুর স্ত্রী-পুত্র মারা পড়ল, তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি।' ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী।—পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে সে পাইকারের কাছে বিক্রয় করার মতলব করছিল; সেই অবস্থায় ফুলমণির চোখের নেশা নাথুকে পেয়ে বসল। কিন্তু ফুলমণিকে পেতে গেলে টাকার দরকার। অতএব, রাজবাড়ির গিন্নীমায়ের কাছে সে কামধেনুকে বিক্রি করে ফুলমণিকে কিনে নিল।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখের মনের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না বিরোধ ছিল নারী ও নাগিনীর মধ্যে। কিন্তু 'কামধেনু' গল্পে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে নাথুর নিজের মনেই। মাসখানেক পর ফুলমণির নেশা ক্রমশ ফিকে হয়ে এল। ভালো-মার বাড়ি গিয়ে তখন সে তার সুরভিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়:

> সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। এক মাসেই গায়ে ভরে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিকচিক করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুসে ফেটে পড়ে, তেমনই চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।
>
> সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ। (পৃ. ২৩১)

এই মুহূর্তটি নাথুর জীবনের চরমতম সঙ্কটের মুহূর্ত। প্রলোভন জয় করতে পারে নি নাথু। বিষধর সাপের মতো লোভ ও লোলুপতা—'লিকলিক করছে তার জিভ।' সুরভির সুচিকণ চামড়ার জন্যে সে তাকে বিষ খাইয়ে সুকৌশলে হত্যা করেছিল। মুচীদের কাছ থেকে সুরভির চামড়াখানাও সে কিনেছিল। ইচ্ছা ছিল চামড়াখানি নিয়েই সে ফকিরী নেবে। কিন্তু এবার লোভ এল আর এক মূর্তিতে। এক পাপ থেকে আর এক পাপের উদ্ভব হল। হেফাজদ্দি পাইকারের প্ররোচনায় সে শুধু চামড়ার ব্যবসাই শুরু করল না, তার কাছে সে ফুলমণিকে দুশো টাকায় বিক্রি করে ব্যবসার মূলধনও সংগ্রহ করল। এখানেও দেখা দিল আর এক দ্বন্দ্ব—'ফুলমণির জন্য সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্যে সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে।'

হঠাৎ একদিন এক গো-হত্যাকারীর কণ্ঠে গরুর মতো শব্দ শুনে নাথু আত্মসম্বরণ করতে পারল না—সে তাকে গলা-টিপে হত্যা করল। লেখক নাথুর চরিত্রকে বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ও মনস্তত্ত্বসম্মত করে তুলেছেন। নারীর আকর্ষণ ও পশুর আসক্তি—দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রথমে নারীর

আসক্তিই জয়ী হয়েছে। নারীর আসক্তি ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পশুর আসক্তি অর্থলোলুপতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তার অর্থলোলুপতা ঐখানেই থেমে থাকে নি। যার জন্য ফুলমণিকেও সে পাইকারের কাছে বেচে দিয়েছে। গো-হত্যাকারীকে মেরে তার ফাঁসি হয়েছে। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়েও সে যেন এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। 'তবে ফাঁসিটা গরুর আঁতে হলে তার আর কোনো খেদ থাকত না।'

নাথুর জীবনের দ্বন্দ্ব মানব-জীবনেরই এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব। একদিকে লক্ষ্মীরূপিণী কামধেনু, যার লাবণ্যমণ্ডিত স্তনভাণ্ড অমর সুধাভাণ্ডের প্রতীক; অন্যদিকে কামনারূপিণী ফুলমণির মোহমদিরা, যা চিরদিনই মানুষকে তার কল্যাণপথ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। নাথুর জীবনসমুদ্র মন্থন করে বিষামৃতময় জীবনের যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে, লেখক অসাধারণ দক্ষতায় তাকে রূপ দিয়েছেন। গল্পটির উপসংহারের মধ্যেও মানুষের বিষামৃতময় জীবনের রহস্যলীলা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়েও নাথু এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারে নি। মানব-নিয়তির এই নির্মম রহস্য গল্পটির যথার্থ রস-পরিণাম:

> কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে এপাশে ওপাশে চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ ক'দিন? কি নিয়ে থাকবে? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল। ফুলমণির চোখ তো হয় নাই। এ যে গরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ। তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি আঁকবে। ও-চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু। (পৃ. ২৩৫)

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের উদ্দাম রূপ ও মানুষের জৈবসত্তার আদিম প্রকাশ অনেক ভঙ্গিতেই রূপ পেয়েছে। তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনের নির্মম নিয়তি-লীলাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়।

তারিণী ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাটে যাত্রী পারাপার করে। সে নিঃসন্তান, স্ত্রী সুখীই তার একমাত্র আশ্রয়, সুখীও এই ছোট্ট সংসার নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত। গল্পটির মধ্যে ময়ূরাক্ষী নদী প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই নদী শুধু গল্পটির পটভূমিকাই সৃষ্টি করে নি, পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। তারিণী ও ময়ূরাক্ষীর মধ্যে যেন একই জীবনছন্দ প্রবাহিত। ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবিকার সংস্থানই করে না, তার জীবনের ছন্দও গড়ে তোলে।

ময়ূরাক্ষী রাঢ়ের শুষ্ক নদী, কিন্তু বর্ষায় তার রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবিশ্রান্ত বর্ষণে, বাতাসের অট্টহাসি ও নদীর গর্জনে আদিম প্রকৃতির ক্রুর কুটিল রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। অকস্মাৎ উদ্ধত পিঙ্গলবর্ণের জলধারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর দোসর হয়ে ওঠে। ময়ূরাক্ষীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি গল্পটির মধ্যে এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে :

গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘর-দুয়ার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চিৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ। লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে। (পৃ. ২৭৭)

ময়ূরাক্ষীর ভয়াবহ বন্যায় সমস্ত গ্রাম যখন ডুবে গেল, তখন তারিণী মাঝি সুখীকে পিঠে করে সাঁতার দিয়েছে। কিন্তু ক্রমশ তারিণীর শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসে, তার উপর সুখী তাকে নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরে। ঠিক এই সময়েই এল সুকঠিন পরীক্ষা—একদিকে তারিণীর একমাত্র আশ্রয় তার স্ত্রী সুখী, অন্যদিকে তারিণীকে বাঁচার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তারাশঙ্কর তীক্ষ্ণতায় ও নির্মম নৈপুণ্যে উপসংহারটিকে প্রদীপ্ত করে তুলেছেন :

> বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণীর জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি। (পৃ. ২৭২)

গল্পটির উপসংহারের মধ্যেই লেখকের মূল বক্তব্য নিহিত। বাঁচার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রেমকেও গলা-টিপে ধরতে কুণ্ঠিত হয় নি। মানুষ জীবনের এমন একটি সঙ্কট মুহূর্তে এসে কখনো কখনো উপস্থিত হয়, যেখানে অত্যন্ত

প্রিয় বস্তুকেও বর্জন করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। মানবজীবনের এই নির্মম সত্যই কেন্দ্রসংহত হয়ে গল্পটির শেষবিন্দুতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ছোটগল্পের উপসংহার হিসাবেও এই অংশটি চমকপ্রদ।)

৭

তারাশঙ্কর যেমন রুদ্রের দক্ষিণপাণির আশীর্বাদ ও পরমকল্যাণময় স্পর্শ অনুভব করেছেন, তেমনি তাঁর ধ্বংসকরাল রূপকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। জীবনরসের বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত লীলারূপের চেয়ে তিনি অনেক বেশী আকর্ষণ অনুভব করেছেন ঐ জীবনেরই অন্য এক রূপে। যেখানে জীবন প্রবৃত্তির উন্মাদনায় অন্ধ, যেখানে মানুষ বন্য মহিষ ও বিষধর সর্পিনীরই সমগোত্রীয়, রাঢ়ের প্রাচীন দগ্ধ মৃত্তিকায় যেখানে জীবন প্রবাহের আদিম ছন্দ—তারাশঙ্কর সুন্দরের সেই রূপকেই নির্মম বলিষ্ঠতায় রূপ দিয়েছেন।

জীবনের এই দিক আপাতদৃষ্টিতে-কুৎসিত ও বীভৎস। পশুকল্প মানুষের দেহ-মন সভ্য মানুষের পরিশীলিত রুচিতে পীড়াদায়ক মনে হতে পারে। তারাশঙ্করের গল্পের বহু উপকরণই এই জগৎ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু সেই আপাত-বীভৎস উপকরণের মধ্যে মানবের চিরন্তন জীবনরহস্যকে যখন তিনি উন্মোচন করেন, তখন বীভৎসও সুন্দর হয়ে ওঠে। এই ভীষণ রমণীয় ও বীভৎস-সুন্দর তাঁর সাহিত্যকে একটি অভিনব রস-রহস্যে মণ্ডিত করেছে। তাঁর সৌন্দর্য-দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সুন্দরের বিশুদ্ধ কোমল-মাধুর্যের চেয়ে তিনি বেশী আকর্ষণ অনুভব করেছেন সুন্দরের বিচিত্র-বীভৎস ছদ্মবেশে। আপাত-অসুন্দরের মধ্যেই তিনি তাঁর সুন্দরের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। তারাশঙ্করের সুন্দর—ফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্নার লাবণ্যে, মেঘমুক্ত শারদাকাশের লঘু আনন্দছন্দে আসেন নি, তিনি এসেছেন তৃণচিহ্নহীন দগ্ধ প্রান্তরের রুক্ষতায়, ময়ূরাক্ষীর পিঙ্গলবর্ণ বন্যার খরতর আবর্তে, কুৎসিত-কদাচারী মানুষের প্রবৃত্তি-তাড়িত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে। তারাশঙ্কর বীভৎসকে সুন্দর করতে জানেন। বাংলা সাহিত্যে এই রসের রসিক খুব বেশী নেই। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এ পথে পদক্ষেপ করেন নি। তারাশঙ্কর অনাসক্ত দৃষ্টিতে আপাত-অসুন্দরের মধ্যে সেই সুন্দরকেই দেখেছেন।

'মতিলাল' গল্পে তারাশঙ্কর এক কুৎসিত দর্শন দম্পতির মধ্যে বাৎসল্যরসের

সহজ ধারা প্রবাহিত করেছেন। মতিলাল গাজন উৎসবে সঙ সাজে, সেবার সেজেছিল ভালুক। ভালুক যখন তার খোলসগুলি ছাড়িয়ে হাত পা ধুয়ে নিচ্ছিল, তখন তার বিকট মূর্তি দেখে গ্রামের বালক পার্বতী চমকে উঠেছিল :

> হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মত কালো রঙ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মত গোল এবং মোটা দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখ-গহ্বরের পরিধি আকর্ণ-বিস্তৃত। সেই মুখ-গহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। (পৃ. ১৭৯)

এই বীভৎস বর্ণনাটি পড়ে একটি অতিকায় কদাকার জানোয়ারের ছবিই আমাদের সম্মুখে জেগে ওঠে। আবার তার 'ভোবন' বা ভুবনমোহিনীর 'ওই লোকটির যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পরিধিতে।' শুধু আয়তনের বিশালত্বই নয়, ভুবনও তার স্বামীর মতোই কুৎসিত ও কদাকার। এই পরিবারটাই উপযুক্ত এক বিশালকায় কুকুর জুটেছে—এই গোবর-গণেশ 'খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক ডাকাত আসুক—কোনো আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।' মতিলাল পাঁচালীর দলে তামাক সাজে, কলকাতায় যাত্রার দলে তার চাকরি হবে—এই প্রত্যাশায় সে দিন গোনে। ভুবনই পরিশ্রম করে সংসার চালায়।

মতিলাল ও ভুবনের এই স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে একমাত্র দুঃখ যে তারা নিঃসন্তান। এইজন্য তারা মন্ত্রঃপূত মাদুলি ধারণও করেছে। মতিলাল ছোট ছোট ছেলেকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা ভয়ে তার কাছে আসে না, দেখলেই 'ভূত' বলে পালায়। মতিলালের এতে কম আপেক্ষ নয়। বুদ্ধ-পূর্ণিমার পরের দিন যে শোভাযাত্রা হয় ; তাতে মতিলাল কালো রঙ মেখে পরচুলা পরে, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে এক বিকট মূর্তি সেজেছিল। এই মূর্তি দেখে পার্বতী নামে ছেলেটি মূর্ছিত হয়ে পড়ে, সেজন্য মতিলালকেও প্রহার করা হয়। গল্পটির উপসংহারে এই কদাকার নর-রাক্ষসটির অন্তস্তল অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে—তার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা সেদিনকার আকস্মিক আঘাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এক স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের বেদনাদীর্ণ প্রকাশ কদাকার মানুষটিকে চিরসুন্দর করে তুলেছে। সামান্য কয়েকটি মিতাক্ষর সংলাপেই তারাশঙ্কর এই সত্যটিকে উন্মোচিত করেছেন :

ভুবন প্রশ্ন করিল, কে মেলে কে তোকে ?

—পেসিডেনবাবুর চাপরাসী ; গাঁ ঢুকতে বাবণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে। —কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই ?

পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদের মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন ! কাজ নাই। (পৃ. ১৫৯)

কুৎসিত আবরণের অন্তরালের আহত মানবাত্মার আর্তকণ্ঠকে ফুটিয়ে তুলে তারাশঙ্কর তার মানবীয় সহানুভূতিকেই শিক্ষিত করে তুলেছেন। কদাকার দেহ, অথচ অন্তরে সুস্থ স্বাভাবিক মানবীয় আকুতি—এই বিপরীতের দ্বন্দ্বে পীড়িত তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি তীক্ষ্ণরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মতিলালের চরিত্রটি ভিক্তর হুগোর নত্রদামের সেই বিখ্যাত কদাকার কুব্জ চরিত্র 'কোয়াসেমাদো' চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু 'মতিলাল' গল্পে নয়, সন্তান বুভুক্ষা ও বাৎসল্যরসের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি তারাশঙ্করে কয়েকটি গল্পেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রকে আশ্রয় করে এই রসের কতকগুলি তির্যক অভিব্যক্তিকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। 'সন্তান' গল্পের গোবিন্দ 'প্রকৃতির বিকৃত মনোবিলাসের সৃষ্টি'। গোবিন্দ যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় তাব উন্মাদিনী মা বিষ খেয়েছিল—সেই বিষের বিষই গোবিন্দর জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। বিকৃত বিকলাঙ্গই সেই অভিশাপ। এইদিক দিয়ে সে মতিলালের সগোত্রীয়। কিন্তু মতিলালের মতো সে শান্ত মানুষ নয়, তার মধ্যে এমন একটি চাপা বিক্ষোভ আছে, যা কদাচিৎ কখনো প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। গোবিন্দর বহিরঙ্গই শুধু কুৎসিত নয়, সে কিছু অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ। উন্মাদিনী মাতার সে বিষ-জর্জরিত সন্তান। এইটুকু পূর্ব-ইতিহাস দিয়ে লেখক চরিত্রটির দেহ-মনকে একটি কার্যকারণ সম্পর্কেব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গোবিন্দর প্রতিবেশী একদিন এক সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে নিল এল দেখে তার মনও একটি সুন্দরী বধূর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘটক নরহরি পাল তাকে পরামর্শ দিল যে সে মেয়ের খোঁজ দিতে পারে, কিন্তু তাতে অন্তত তিনশো টাকা লাগবে। টাকার জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে সে কাজে লেগে গেল। লক্ষ্মীবাবুর গৃহিণী সূচনাতেই কর্তাকে বললেন—'রোগীর ঘরে ও ঢুকলে রোগী চমকে উঠবে যে!' গোবিন্দ

পরিশ্রমী, তার বিকৃত হাতের কর্মনৈপুণ্যও চমৎকার। বিশেষ করে বাড়ির শিশুদের সঙ্গে সহজেই তার ভাব জমে ওঠে—সে তাদের সঙ্গে বিকৃত দেহে নাচে। একদিন লক্ষ্মীবাবুর দৌহিত্র মানিক নাচতে নাচতে মাটিতে পড়ে যায়। গোবিন্দ তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—'আমার ছেলে হবা মানিক। হবা? বল কেনে, একবার বাবা বল কেনে? বলবে না? কেনে? ভিখারীকে তো বাবা বলে লোকে। বল কেনে!' বলাবাহুল্য, এরপর গোবিন্দর জবাব হয়ে গেল। তার অন্তরের ক্ষুধাকে কেউ বুঝতে পারে নি:

> ...কয়েক বৎসরে বাসনাটা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছিল। আবার সেটা প্রবল হইয়া উঠিল। সেটা তাহার জীবনে নারীর প্রয়োজনের জন্য নয়, তাহার অন্তর একটি সুন্দর শিশুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ওই মানিকের মত একটি শিশু। (পৃ. ১৩৮)

আবার পাত্রী অন্বেষণের চেষ্টা চলল। যেদিন গোবিন্দ শুনতে পেল যে হাম হয়ে মানিকের মৃত্যু হয়েছে, সেদিন 'গোবিন্দের পায়ের তলার মাটিটা যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সব যেন একাকার হইয়া গেল।' শেষ পর্যন্ত নরহরির নির্দেশে গোবিন্দ মাথা ন্যাড়া করে, গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই নিকুঞ্জ বৈষ্ণবের বালবিধবা মঞ্জরীকে বিয়ে করে ফেলল। গোবিন্দর কদাকার দেহ মঞ্জরীরও পরিহাসের বিষয় হল। মঞ্জরীর যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান হল। কিন্তু 'কুৎসিত বিকৃতাঙ্গ এক শিশু, অবিকল তাহার প্রতিমূর্তির এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব।' ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে গোবিন্দ শিশুটিকে হত্যা করেছে। তার ধারণা—'মানিক, মানিক আসিবে বলিয়াছিল, বার বার সে স্বপ্নে তাহাকে সেকথা জানাইয়াছে। না, না, ও শিশু তাহার নয়! না না না।'

গোবিন্দকে পাগলাগারদে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। এবং—

> অনেক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর পাগলাখানার ডাক্তার বহুযত্নে তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘরখানির চারিপাশে ক্যালেণ্ডার টাঙানো, সবগুলিতেই রূপ-লাবণ্যময় শিশুর ছবি। গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে নাচে।
>
> ছবিগুলির নাম—মানিক। (পৃ. ১৪২)

এখানে দেহমনের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর বাৎসল্যরসের একটি তির্যক অভিব্যক্তিকে মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় রূপ দিয়েছেন।

'শাপমোচন' গল্পটিতে কুৎসিত কদাকার দেহই নিয়তি হয়ে উঠেছে। দুর্গার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও কদাকার চেহারা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই গল্পটির বিষাদময় উপসংহার রচনা করেছে। দেবীচরণ কুৎসিত বিকৃত দেহ—

> লোমশ পশুর মত ছাই-রঙের দেহবর্ণ, অস্বাভাবিক লম্বা মুখ, তাহার উপর একটা চোখ অহরহ মিটমিট করে, আর একটা চোখ বিস্ফারিত, কে যেন চোখের উপরের কপালের চামড়াটা টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। শীর্ণ দেহ. কাঠির মত হাত পা, তাহার উপর চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, এক পায়ের শিরাগুলি নাকি অহরহ টানিয়া ধরিয়া থাকে। (পৃ. ১০৪)

দেবীচরণ নানাজাতীয় কাজ করেছে—কিন্তু তার এই কদাকার রূপই সব কিছুর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সর্বশেষে সে চিকিৎসকের কাজ করছে। আপাত-দৃষ্টিতে দেবীচরণকে অত্যন্ত সুরসিক ও কৌতুকপ্রবণ বলে মনে হয়। তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শ্লেষপ্রবণতা ও উপস্থিতবুদ্ধি খুবই উপভোগ্য সন্দেহ নেই। তবু তার দাম্পত্য-জীবন খুব সঙ্কটের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভামিনী সুন্দরী। দেবীচরণ বহু সাধ্য-সাধনা করেও তার মন পায় না। কিন্তু কদাচিৎ যদি ভামিনীর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাহলে সে অসম্বরণীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রেম নিবেদন করতে যায়। ভামিনী তার অনুপস্থিতিতে বেশ স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু স্বামীকে দেখলেই সে একটি বিবর্ণ কাঠের পুতুলে পরিণত হয়। অবশেষে তার ফিটের ব্যারাম শুরু হল। অথচ দেবীচরণ 'ভামিনীর দেহে জীবন-সঞ্চারের জন্য' উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে কিছুটা সন্দেহ-বাতিকগ্রস্তও হয়ে উঠেছে। মুখুজ্জেদের ছোকরাটার সঙ্গে তার স্ত্রী তো স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলে। মূর্ছিতা স্ত্রীর জন্য ঔষধ দিতে গিয়ে সে বিষ খেয়ে নিজের অভিশপ্ত জীবনেরই অবসান ঘটিয়েছে। এই দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্রটি যেমন নির্মম, তেমনি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল :

> ও কে? দেবী চমকিয়া উঠিল। সে নিজে? এত বর্বর ভয়াবহ রূপ তাহার! দেওয়ালে ঝুলানো আয়নাখানার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। উঃ, তাহারই ভয় করিতেছে! অভিশাপের রূপ এত ভয়ঙ্কর। না না, অপরাধ নাই, অপরাধ নাই। কন্যা কাময়তে রূপম্। সে বর নয়, সে অভিশাপ। (পৃ. ১১১)

তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পের মতো 'শাপমোচন' গল্পটির গতি মন্থর ও লয় বিলম্বিত। মন্থরগতি গল্পটি শেষপ্রান্তে এসে আকস্মিক দ্রুততাল মণ্ডিত হয়ে

উঠেছে। গল্পটির চূড়ান্ত শীর্ষ (Climax) ও উপসংহার (Catastrophe) একই বিন্দুতে ঘন-সংহত হয়ে এক নির্মম ট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

কুৎসিত, কদাকার ও বিকলাঙ্গ চরিত্র-চিত্রণে তারাশঙ্করের একটি সহজ প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু একে তিনি একটি অভিনব শিল্পকৌশল হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। কুৎসিত দেহ ও অন্তরে গভীর ও স্বাভাবিক মানবীয় তৃষ্ণা —এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের এই জাতীয় চরিত্রগুলি যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বজর্জর পীড়িত মানুষগুলিকে তিনি অসীম সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'তমসা' গল্পে তারাশঙ্কর দৈনন্দিন জীবনের গন্ধময় রুক্ষ পরিবেশের মধ্যে এক বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিখারীর পরম রূপতৃষ্ণা আবিষ্কার করেছেন। বাগদীদের বিকলাঙ্গ ছেলে পঙ্খী, অযত্নে অনাদরে সে বর্ধিত হয়েছে। বছরখানেক আগে তার মা তাকে একদিন খুব মেরেছিল। তার দিদি তাকে হাতে ধরে ব্রাঞ্চলাইনের ছোট স্টেশনটিতে রেখে গেল। অন্ধ বিকলাঙ্গ ভিখারী ছেলে পঙ্খীর বীভৎস বহিরাঙ্গের মধ্যে সুন্দরের পিপাসা লুকিয়েছিল। সে গান গায় :

হায়—হায় আমি যদি হতেম চুড়ি
কাঞ্চন নয়, কাঁচ-বেলোয়ারি
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
জেবন সফল করিতে।
হায়, হায় থাকত না খেদ মরিতে

তার সুপ্ত সৌন্দর্যতৃষ্ণা এক তরুণী খেমটাওয়ালীর পাদস্পর্শে, কণ্ঠস্বরে গন্ধবিলাসে এক রূপ তন্ময়তার সৃষ্টি করেছে। প্রখর ইন্দ্রিয় চেতনার দ্বারা এই মেয়েটির মধ্যে পরম রূপতীর্থের সন্ধান পেয়েছে। তাই প্রণাম করার ছলে পঙ্খী মেয়েটির আলতা, পরা পায়ে মুখ ঘষে মুখে খানিকটা আলতার রঙ মেখে নিল—'মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্খীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে।' তারপর সারাজীবন ব্যাপী সেই সুন্দরেরই অনুসন্ধান চলেছে এ যেন—

তোমারে পেয়েছি কোন প্রাতে,
তারপরে হারিয়েছি রাতে।

তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি,
নও ছবি, নয় তুমি ছবি।

'অন্ধকারের ওপরে চিরসুন্দরের যে রূপমূর্তি আছে, বিকলাঙ্গ পঙ্গীর মধ্যে সেই চিরন্তন গূঢ় তৃষ্ণাই এক গম্ভীর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে।' ছোট স্টেশনের নানা টুকরো ছবি, প্রাত্যহিক জীবনের শ্রীহীনতা,—এসব অতিক্রম করে বিকলাঙ্গ মানুষটির দিব্যদৃষ্টি 'গ্রামলোক' ছাড়িয়ে 'রূপলোক'-এর দিকে অভিসার করেছে। সৌন্দর্য ও বীভৎসতার সীমারেখা এখানে লুপ্ত হয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদ্মাসন রচনা করেছে। সুন্দরের গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমার এমন রূপালেখ্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। গল্পটিতে তারাশঙ্করের রস সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে।

৮

তারাশঙ্কর স্নেহ-বাৎসল্য নিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। 'পুত্রেষ্টি,' 'মালাকার', 'বাবুরামের বাবুয়া', 'স্থলপদ্ম' প্রভৃতি গল্পে বাৎসল্যরসের বিচিত্র উৎসকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। স্নেহ-বাৎসল্যের স্বাভাবিক পথগুলি দীর্ঘকালব্যাপী কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। এই বহুব্যবহারজীর্ণ পথের মধ্যে নূতন কোনো আবেদন আনা সম্ভব নয়। তারাশঙ্কর তাই ব্যতিক্রমের পথগুলিকেই শিল্পীর তির্যক দৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

'পুত্রেষ্টি' গল্পে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির মেজকর্তার বিচিত্র চরিত্র ও খেয়ালী মেজাজকে ঘিরে স্নেহ-বাৎসল্যের একটি নিগূঢ় ও দুরূহ উৎসভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ পঁচিশ বছর আগে মেজকর্তার, রসিকতার মুক্তহস্ততার ও ঔদার্যের একটি খ্যাতি ছিল। তখন নিত্য সন্ধ্যায় মেজকর্তার আড্ডায় মজলিস বসত। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। গৃহিণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বদ্যিনাথে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সন্তান-কামনায় ধন্নাও দিয়েছিলেন। ফিরে এসে ছোট ভাইয়ের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেবেন স্থিরও হল। এই উপলক্ষে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি উৎসব-আয়োজনের ফর্দও হল। কিন্তু হঠাৎ ছোট ভাইয়ের একটি তীব্র মন্তব্যে তিনি এমন ভাবে আহত হলেন, যে পূর্ণ দু'মাস শয্যাগ্রহণ করলেন। এর পরেই তাঁর চরিত্রে গভীর পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি অদ্ভুত রকমের খেয়ালী হয়ে উঠলেন। সম্পত্তি ভাগ করে নিলেন, 'জপে-তপে ধর্মে-কর্মে' দেখা দিল তাঁর গভীর অনুরাগ, আর দেখা দিল অর্থসঞ্চয়ের প্রতি মোহ।

মেজগিন্নী যখন চাটুজ্জেদের ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্র নিতে চাইলেন, তখন মেজকর্তার ঘোরতর আপত্তি দেখা দিল। অথচ তাঁর চরিত্র স্নেহ-বাৎসল্যের ধারাটি একেবারে শুকিয়ে যায় নি। পেয়ারা তলায় ছেলেদের তাড়াতে গিয়ে চার বছরের একটি ভয়ার্ত সুন্দর ছেলেকে দেখে তাঁর স্নেহ-দৌর্বল্যের আকস্মিক অভিব্যক্তি সংহত অথচ তীক্ষ্ণরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে:

> মেজকর্তা ছেলেটির দিকে চাহিয়াছিলেন—অতি সুন্দর ছেলেটি! অকস্মাৎ তিনি একান্ত-লুব্ধ আগ্রহে যেন ছোঁ মারিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার-বার চুমা খাইয়া পরমাদরে কহিলেন—ভয় কি, তোমার ভয় কি? পরমুহূর্তেই চকিত হইয়া উঠিলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ছেলেটিকে একরূপ ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে যেন পলাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় কেহ ছিল না, নির্জন ঘরে আধ আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতে ছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিকরূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। (পৃ. ৬৭৭)

গঙ্গাতীরের শ্মশানে এক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী এসেছিলেন। মেজকর্তা গভীর রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জেনে এলেন যে, তন্ত্রমতে পুত্রেষ্টি যাগ করতে হলে নরবলির প্রয়োজন। মেজকর্তা সন্ন্যাসীর কাছে নরবলি দিতে স্বীকৃত হলেন।

এবার মেজবাবুই মেজগিন্নীকে চাটুজ্জেদের ভাগ্নেটিকে এখানে নিয়ে আসতে বললেন—সে খাবে দাবে থাকবে। মেজগিন্নীর কোলের ঘুমন্ত শিশুটিকে বলির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় মেজকর্তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত চমৎকার ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। একটি মর্মভেদী চীৎকার তিনি শুনতে পেলেন—তাঁর মনে হল 'এই শিশুর অশরীরী মাতা যেন দীনভাবে সন্তান ভিক্ষা চাহিতেছে।' সন্তানহারা কুক্কুরীর ক্রন্দনধ্বনি যুক্ত হয়ে গল্পটির ব্যঞ্জনাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। গল্পটি মূলত চরিত্রধর্মী। মেজকর্তার চরিত্রের আপাত পাশবতার অন্তরালে সুপ্ত স্নেহবৃত্তি, পুত্রকামনার জন্য অপরের সন্তানকে বলি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, সন্তানহারা কুকুরীর আর্তনাদ, অমাবস্যার রহস্যাচ্ছন্ন ভীতি-শিহরণ, প্রভৃতি গল্পটিকে এক বিশিষ্ট শিল্পগৌরবে মণ্ডিত করেছে।

'মালাকার' গল্পের নায়ক রজনী মালাকার ডাকসাজ ও আতসবাজির কারিগর। তার উপার্জন আছে, সঞ্চয় নেই। অকৃতদার হলেও তার অর্জিত

অর্থ নেশায় ও নারীর আসক্তিতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কালী সিংয়ের নিম্নজাতীয়া স্ত্রী শ্যামার প্রতি তার আসক্তির ইতিহাসও সুবিদিত। প্রতিবার পুজোতে সে তার 'সেঙাতিনী'কে রঙীন কাপড় দিয়ে থাকে। এই সময় হঠাৎ বিলিতি জিনিস বর্জনের আন্দোলন এল। স্থির হল বিলিতি রাঙতা ও চুমকির কাজ চলবে না। রজনী স্থির করল যে, শুধু সোলা দিয়ে সে প্রতিমার আভরণ তৈরী করবে। কালী সিংয়ের কাছে সে টাকা ধার করে নিয়ে এল। কিন্তু মেলায় সদ্য পরিচিত রূপোপজীবিনীদের জন্য কাপড় কিনে দিতে তার সব পুঁজি নিঃশেষিত হল। এরপর একটি ছোটমেয়ের সোনার বিছে হার চুরি করে সে প্রতিমার সাজ তৈরী করল। কিন্তু চৌর্যবৃত্তির অপরাধ তার মনকে প্রতিমুহূর্তেই পীড়িত করেছে। তাই এবার সে আর মিতেনীর জন্য কাপড় আনে নি এনেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জামা! রজনী মালাকারের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে তার মানস-পরিবর্তনের সূত্রটি যুক্ত করে গল্পটির একটি কল্যাণ-সুন্দর প্রসন্ন পরিণামের নির্দেশ দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

'বাবুরামের বাবুয়া' গল্পে নিঃসন্তান বাবুরামের স্নেহ-বাৎসল্য বিচিত্র ভঙ্গিতে উৎসারিত হয়েছে। বাবুরাম জমাদারের কাজ করে, তার স্ত্রী সুখীয়া এক সময় হাসপাতালে কাজ করত। নিঃসন্তান এই দম্পতি পরের ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করে। ছেলে একটু বড় হলেই ফিরিয়ে দিতে হয়। বাবুরাম সে সময় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ওঠে। বাবুরামের চরিত্রবৈচিত্র্যের সঙ্গে বাৎসল্যরসের তির্যক অভিব্যক্তি যুক্ত হয়েছে।

'স্থলপদ্ম' গল্পে একটি নিম্নশ্রেণীর মেয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি দেখানো হয়েছে। বিধবা মেয়ে পুত্র কামনায় আবার বিবাহ করেছে, কিন্তু তার সমস্ত কামনা কি ভাবে দৈবাহত হয়েছে, তারই কারুণ-সুন্দর ব্যঞ্জনাটি গল্পের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি।

তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পে পারিবারিক জীবনের সম্পর্কবৈচিত্র্য অপূর্ব রূপে রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গল্পের একটি পূর্বতন ধারা আছে। শরৎসাহিত্যে আমাদের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও সম্পর্কবৈচিত্র্যের ছবি অসামান্য মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্কর এক্ষেত্রে ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। 'বড়-বৌ' গল্পটিতে পারিবারিক জীবনের একটি রস-মধুর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। বড়-বৌ কাদম্বিনীকে নিয়ে দুই ভাই সেতাব ও মহাতাপের বিরোধ একটি মিলনাত্মক পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

দেবর ও ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কটি একটি পরম মাধুর্যের দীপ্তিতে ভরে উঠেছে। এখানে বড়-বৌয়ের স্নেহ-পরায়ণ ব্যক্তিত্বদীপ্ত সংযত চরিত্রটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'তাসের ঘর' গল্পটিও পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী। শৈল বিনীত, নম্র। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে বাপের বাড়ির গল্প যেমন সে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলে, তেমনি বাপের বাড়িতেও শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে বাড়িয়ে বলতে তার বাধে না। নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে সে বাপের বাড়ির স্বচ্ছলতা সম্পর্কে এমন অত্যুক্তি করেছে যে, শাশুড়ী আহত হয়ে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ি এসে শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কেও তেমনি অত্যুক্তি করেছে। শাশুড়ী ব্যাপারটাকে বুঝতে পেরে বধূকে ক্ষমা করেছেন। পারিবারিক অশান্তির ধূমায়িত বিক্ষোভ, মধুর প্রশান্তির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

'সুখনীড়' গল্পটির নামকরণের মধ্যেই একটি নির্মম আয়রনি লুকিয়ে আছে। সনকা ও মণির দাম্পত্য জীবনের তুলনামূলক ছবি এঁকে তা দেখানো হয়েছে।

'রাঠোর ও চন্দাবত' গল্পে দুটি পরিবারের বিরোধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটির প্রারম্ভে দীর্ঘ ইতিহাস ধারার মধ্য দিয়ে এই বিরোধের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা বিবৃত হয়েছে। রাঠোর-চন্দাবতের বিরোধ কাহিনী মধ্যযুগের রাজপুতনার ইতিহাসের একটি সুবিদিত অধ্যায়। বাংলা দেশের অখ্যাত পল্লীর অধিবাসী হলেও তাদের রক্তধারার মধ্যে সে বিরোধের রেশ ছিলই। ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার সামন্তযুগের বিরোধ-বিসম্বাদের রক্তাক্ত কাহিনী সমন্বিত হয়ে গল্পটির উপযুক্ত পটভূমিকাই সৃষ্টি হয়েছে। চরিত্রগুলি মধ্যযুগের রাজপুত আভিজাত্যের যেন এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। 'রাঠোর ও চন্দাবত' গল্পে যেমন ইতিহাস ও রোমান্সের আবহাওয়া পারিবারিক বিরোধের পরিণতি দেখানো হয়েছে তেমনি—'ট্রিটি' গল্পে কৌতুকহাস্যের উজ্জ্বল রেখায় এই বিরোধের লঘুতার দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পটিকে তারাশঙ্করের বিশুদ্ধ কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠ গল্প বলা যায়। কালীচরণ ঘোরতর শাক্ত, রাধাচরণ পরম বৈষ্ণব। দুজন দুজনে একাধারে শ্যালক ও ভগ্নীপতি দুই-ই, কিন্তু দুজনেই দুজনের আবার পরম শত্রু মুখদর্শন পর্যন্ত নেই। শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে তারাই আসলে লাভবান হয়। গল্প বিবৃতির মধ্যেই একটি লঘু মেজাজ আছে—কালীচরণও রাধাচরণ চরিত্র দুটিও কৌতুকরেখায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর গম্ভীর রসের শিল্পী, কিন্তু জীবনের লঘুতরল বিকাশ ও অসঙ্গতিগুলিকেও যে

তিনি কতখানি শিল্প-সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারেন, গল্পটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

টাইপ চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর পর্যবেক্ষণ-নিপুণ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন চরিত্রগুলির মধ্যে এমন সমস্ত অসমতল বন্ধুরতা আছে, যা বর্ণনার আলোকে সহজেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে। অতি বিশ্লেষণ অথবা জটিল বর্ণনায় তিনি চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলেন না। তার অভাব পূরণ করেছে তাঁর চরিত্র পর্যবেক্ষণের বিশেষ ভঙ্গিটি। বিশেষ কোনো চরিত্রকে তিনি এমনভাবে উপস্থিত করেন, সেখানে দীর্ঘ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সব চরিত্র জনতার ভিড়ে মিশে থাকলেও তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না, কারণ তাদের চরিত্রে এমনই বিশেষত্ব থাকে যা তাদের চিনিয়ে দেয়। চরিত্রের অদ্ভুত, উৎকট ব্যতিক্রমের দিকেই চরিত্রস্রষ্টা তারাশঙ্করের প্রবণতা। টাইপ চরিত্র অঙ্কনের এই দক্ষতার জন্যই তাঁর উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল হয়ে উঠে অসমতল জীবনের বহুকোণবিশিষ্ট বৈচিত্র্যকে তিনি রূপমণ্ডিত করে তুলেছেন।

পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও বহুল অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টির মূলে। চরিত্র রচনার জন্য তাঁকে কল্পনার খাদ মেশাতে হয় না—জীবন থেকে সরাসরি তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেন। সমালোচকরা চরিত্র-রচনার মোটামুটি দুটি পদ্ধতি কথা বলেছেন :

> Some writers seem to snatch their characters out of thin air, with no conscious reference to anybody they ever heard of; slap any old names to them, and by a few quick casual strokes that leave most of their personalities unexpressed, make them vivid and notable. Others must document, correlate, catalogue their fictional people, laboriously selecting externals indicative of needed traits, and if not literally transcribing living humans bodily to paper, at least building composites all of whose parts are draw straight from life. [১৭]

বলাবাহুল্য, তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টি সমালোচক বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর

১৭. The Short Story, p. 206 : Kenneth Payson Kompton.

সগোত্র। জীবনের মর্মমূল ভেদ করে যে প্রাণধারা উৎসারিত হয়েছে, তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন। যেটুকু তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তার সম্ভাবনাও ঐ জীবনোৎসের মধ্যেই নিহিত ছিল।

তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পকে বিশেষভাবেই চরিত্রপ্রধান গল্প বলা যায়। সেখানে চরিত্রের বৈচিত্র্যগুলিকে কেন্দ্র করেই যেন গল্পগুলি দানা বেঁধে উঠেছে 'সনাতন', 'জটায়ু,' 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার', 'ব্যাঘ্রচর্ম' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। 'সনাতন' গল্পের সনাতন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। দশ বছর বয়সে এই হাড়ীর ছেলেটি যখন শিবনাথের প্রপিতামহের কাছে কাজ করতে এসেছিল, তখন তার বোকামি ও সরলতা সকলের কৌতুক উদ্রেক করত। ভূতের ভয়ে সে 'মোলকিনী পুকুরে'র ধারে হাঁটতে পারত না। দেবস্থান ও দেবতাদের উপরও তার 'ভয় ছিল বিষম'। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছিল তার দুর্দান্ত সাহস। গো-চারণভূমিতে সে অজস্র বিষধর সাপকে অনায়াসে হত্যা করেছে। এমন কি একবার সে একটি নেকড়ে বাঘকেও হত্যা করেছিল। সনাতনের বিবাহিত জীবনের বৈচিত্র্যও কম নয়। কারো সঙ্গেই সে ঘর করতে পারে নি—কেউ বা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে, আর কাউকে কাউকে সে-ই তাড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছর বয়সে যে বাড়িতে সে ঢুকেছিল, সেই বাড়িতে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর পরে তার মৃত্যুদিন যেদিন ঘনিয়ে এল, তখন মৃত্যুর প্রশান্ত মহিমাকে অনাসক্ত চিত্তেই সে গ্রহণ করেছে। অথচ আগে 'মর' বলার জন্য একাধিকবার সে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। বোকামি, সরলতা, প্রভুভক্তি বিচিত্র খেয়াল ও সর্বশেষে সহজ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ—সনাতন চরিত্রটিকে তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

'জটায়ু' গল্পের থিয়েটার-বাতিকগ্রস্ত জটে পাগলার চরিত্রটীকে বিচিত্র ঘটনা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিণতি রূপ দেওয়া হয়েছে। কর্মকারদের ছেলে জটে, জন্ম থেকেই পাগল। কিন্তু বাবুদের 'সীতাহরণ' থিয়েটার দেখার পর থেকে সে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। জটায়ুর আত্মদান পাগলাকে মুগ্ধ করেছিল। জটায়ুর পার্ট তার একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ 'গ্রামের মুকুটহীন রাজা।'—সেদিন সে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। তার কাছে জটে পাগলা বহুবার 'সীতাহরণ' থিয়েটারটি আবার করার অনুরোধ জানিয়েছে। এবং সেই থিয়েটারে সে জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয় করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। এইভাবে জটায়ুর কথা সব সময় ভাবতে ভাবতে জটে পাগলা

রামায়ণের জটায়ুর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু জীবনের শেষদিনে প্রথমবার ও শেষবারের মতো সে এই ভূমিকাটির সার্থকতম অভিনয় করেছে। কালা গুণ্ডার হাত থেকে শিবনাথের অসহায়া স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে সে যেমন তাকে হত্যা করেছে, তেমনি নিজেও প্রাণ দিয়েছে। এইভাবে সে তার 'জটায়ু' সাজার বাসনা চরিতার্থ করেছে। জটে পাগলার বিচিত্র সংস্কারটিকে কাহিনীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে তারাশঙ্কর একটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

'ব্যাঘ্রচর্ম' ও 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার'—গল্প দুটিও চরিত্রপ্রধান। উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি ও লঘুরস, গল্পকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পের নায়ক রতন হাড়ি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বিশাল দেহ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখমের আস্ফালন করে বেড়ায়। এই সূত্রে সে বড় বড় জমিদারদের কাছে কাজ জোগাড় করে। কিন্তু বলবীর্যের পরীক্ষাকাল যখন উপস্থিত হয়, তখন গোপনে সে পালিয়ে যায়, অন্যত্র চাকরি নেয়। মিথ্যা ভাষণকেই সে জীবিকার্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আসলে সে ভীরু কাপুরুষ। চরিত্রটির এই কৌতুককর অসঙ্গতিই গল্পটির প্রাণ। 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার,' গল্পের স্টেশনমাস্টার লোকটি গোবেচারী ছা-পোষা ভালোমানুষ। ছোট লাইনের এই ছোট্ট স্টেশনটির প্রতি তার অপরিসীম মমতা কিন্তু এই নিঃসম্বল মানুষটি অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে ওস্তাদ। দেশের চকমিলান বাড়ি ও ফলের বাগানের ফলাও বর্ণনা তার মুখে লেগেই আছে। যাত্রার অভাবে স্টেশন যখন উঠে গেল, তখন সে কাঁদাকাটি করে বড় সাহেবের কাছে তার প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়ে কয়লার দোকানের বন্দোবস্ত করেছে। তবে বিনে মাইনের টিকিট পরীক্ষা করার অনুমতিটিও চেয়ে নিয়েছে। এই সদানন্দময় কৌতুককর চরিত্রটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'প্রতিধ্বনি' গল্পটির মূল রসকেন্দ্র অদ্ভুত ধরনের পাগল রসরাজের চরিত্রটি। কিন্তু রসরাজের পাগলামির মধ্যে একটি সুগভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা ছিল। অনেকের ধারণা, যে সে সিদ্ধিলাভও করেছিল। প্লেগ যে বছর মহামারীর আকারে দেখা দেয়, তখন রসরাজ বি-এ ক্লাসের ছাত্র। প্লেগে তার মা-ভাই-বোন মারা গেল। তার বংশের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পাগলামির বীজ। হঠাৎ সে সর্বত্র দেখতে পেল মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। 'মৃত্যু কি, তার রূপ, কোথা তার বাস—এ ভিন্ন চিন্তা নেই, মৃত্যু ভিন্ন চোখে কিছু দেখতে পাই না, কান্না ভিন্ন

কিছু শুনতে পাই না। অহরহ যেন অনেক লোক একসঙ্গে কাঁদছে।'—এই হল রসরাজের বক্তব্য। এই মৃত্যুজিজ্ঞাসাই তার জীবনের একমাত্র জিজ্ঞাসা হল। চারপাশে মৃত্যু, তাই সে ফুঁ দিয়ে মৃত্যুকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। 'প্রতিধ্বনি' চরিত্র-প্রধান গল্প হলেও মৃত্যুজিজ্ঞাসা এর ভাবদেহ। এই রহস্যাচ্ছন্ন দার্শনিক অনুভূতিকে পরবর্তীকালে 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে লেখক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। সেখানে শুধু জিজ্ঞাসাই নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের মৃত্যুরহস্য-ভেদকারী সাধনার কথাও আছে। রসরাজের অসমাপ্ত জিজ্ঞাসাই জীবন মশায়ের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। একদিকে বিচিত্ররূপিণী নিঃশব্দসঞ্চারিণী পিঙ্গলবর্ণা অন্ধ বধির কন্যার অলক্ষ্য ও অব্যর্থ পদসঞ্চার, অন্যদিকে সাধকের মৃত্যুরহস্যভেদী অন্তর্দৃষ্টির ধ্রুবজ্যোতি—সেখানে এক মহিমা সুগম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৯

রাঢ়ভূমির জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ও কুসংস্কার তারাশঙ্করেব বহু গল্পেরই পটভূমিকা রচনা করেছে। এই কুসংস্কার, কিংবদন্তী ও লোকবিশ্বাসগুলিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের শিল্পরূপ দিয়েছেন। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'ডাইনী' গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রাম্য কুসংস্কার ও কিংবদন্তীর সঙ্গে ছাতি-ফাটার মাঠের তৃণচিহ্নহীন দগ্ধরূপ এক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। গল্পটির পটভূমিকায় এই বিশাল প্রান্তরের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। এই রৌদ্রজ্বালাময় নিয়তির মতো নির্মম প্রান্তরের বর্ণনায় তারাশঙ্কর অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যক্ষতায় ও ঘনবদ্ধ বর্ণনায় এই বিশাল প্রান্তর গল্পটির পটভূমিকাই শুধু রচনা করে নি, পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দগ্ধ প্রান্তরের সঙ্গে জড়িত হয়েছে মহানাগের 'বিষের জ্বালা'র ভয়ঙ্কর জনশ্রুতি।

এই অসাধারণ সেটিংটির উপরে তিনি ডাইনী কাহিনীটি বিন্যস্ত করেছেন। সে একটি অসহায় মেয়ে। দশ-এগার বছর বয়সে বামুনবাড়ির হারু চৌধুরী তার ছেলের পেট-ব্যাথার জন্য তার ডাকিনী-দৃষ্টিকেই দায়ী করেছিল। তারপর এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে সংস্কারচ্ছন্ন গ্রামবাসীর মনে অভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে যে, মেয়েটি সত্যিই ডাইনী, তার দৃষ্টিতে আছে বিষ। শুধু গ্রাম্যলোকের কুসংস্কারই নয়, সবচেয়ে বড় কথা যে, সে নিজেও ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে সে ডাইনী। বুড়ো শিবতলায় 'অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া-

ছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও। আয়নায় নিজের 'নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টি। দেখে সেও চমকে ওঠে। তাই লোকালয় বর্জন করে ছাতি-ফাটা মাঠের একটি প্রান্তে সে একখানি কুঁড়ে ঘরে দিনযাপন' করে। বাউড়ীদের ছেলেকে বাণ মারার অভিযোগে ডাইনীকেই দোষী করা হল। অবশেষে বৃদ্ধা ডাইনীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়। পরের দিন কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের তীক্ষ্ণাগ্র শাখায় ঝুলতে দেখা গেল বৃদ্ধা ডাইনীকে। ছাতি-ফাটার মাটের রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে কুসংস্কার ও কিংবদন্তী সমন্বিত হয়ে একটি অতি-প্রাকৃত ভীতি-শিহরণের সৃষ্টি করেছে। গল্পটি যথার্থই কোনো ডাকিনী বা ভূতের গল্প নয়, একটি অভিশপ্ত মানবীর বেদনাই এখানে অনাসক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। অভিশপ্ত বৃদ্ধা ডাইনীর বেদনাকে লেখক গভীর সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু কী গভীর অনাসক্তির সঙ্গেই না বলিষ্ঠ রেখায় নির্মম কাহিনীর নির্মমতম সমাপ্তিরেখা টেনেছেন!

> অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্র-রেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূণ্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।
>
> নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল। (পৃ. ৩৮১)

রাঢ়ভূমির পুরাতন মাটির সঙ্গে অতীত যুগের বহু বিস্মৃত অধ্যায়ের অভিশপ্ত কাহিনী জড়িত আছে। এই সমস্ত কাহিনী লোকের মুখে মুখে একালে পর্যন্ত চলে এসেছে। 'আখড়াইয়ের দীঘি' এই জাতীয় একটি কাহিনী। এই গল্পটিকেও পরিবেশ-প্রধান গল্প বলা যায়। দীর্ঘ পরিবেশ বর্ণনার অনেক পরে এসেছে মূল কাহিনীটি। তৃষাতপ্ত বৈশাখী অপরাহ্ন, ধূলাধূসরিত দগ্ধ আকাশ, আর 'দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছোপের মত বোধ হইতেছিল।' তিনজন রাজকর্মচারী বাদশাহী সড়ক ধরে সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। এই তিনজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পটির আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। কোনো এক বাদশাহের কীর্তিকাহিনীকে অবলম্বন করে 'আখড়াইয়ের দীঘির মাটি,বাহাদুরপুরের লাঠি ও কুলীর ঘাঁটি'র রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে। চারদিকে ঘনবদ্ধ অন্ধকার, বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন

বিকটাকৃতি দৈত্যের মতো চারপাশের গাছপালা নবাবী আমলের ভগ্নপ্রায় বাঁধাঘাট, টর্চের আলোয় চকিতে উদ্ভাসিত দীঘির গর্ভদেশের হিংস্র হাসি, সঞ্চরমাণ পদশব্দ প্রভৃতি একটি ভীতি-শিহরণপূর্ণ অতিপ্রাকৃত আবহাওয়াকে ঘনিয়ে তুলেছে। কালীচরণ বাগদী ও তার পুত্র তারাচরণের কাহিনী সেসন কোর্টের নথি থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনীটি মুখ্য নয়, মুখ্য হল আখড়াইয়ের দীঘির রোমাঞ্চ পরিবেশ। যে আখড়াইয়ের দীঘিতে কালীচরণ তার পুত্রের শবদেহকে পুঁতে রেখেছিল, সেইখানেই তার শেষশয্যা রচিত হল। নির্মম নিয়তির-মতো আখড়াইয়ের দীঘির হিংস্র মুখবিবর তাকেও গ্রাস করেছে। দক্ষ চিত্রকর তারাশঙ্কর বলিষ্ঠ রেখাবিন্যাসে এই প্রেতচ্ছায়াবিবর্ণ শ্বাসরোধকারী আবহাওয়াকে চিত্রিত করেছেন।

'বন্দিনী কমলা' গল্পটিও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর রচিত হয়েছে। রাজহাটের রায়বাড়ির বান্দনী কমলার কাহিনী শতাব্দীব্যাপী বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই বংশের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গোপীবল্লভের 'পরমা সুন্দরী সহধর্মিনী' কোজাগরী পুর্ণিমার দিন লক্ষ্মীকে বন্দিনী করেছিলেন। সে রাত্রির পরিবেশকে গল্পকার অর্থগূঢ়তায় ভরে তুলেছেন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে নেমে এল প্রবল বর্ষণ, প্রবল বাতাসে ঘৃতপ্রদীপগুলি গেল নিবে, পদ্মগন্ধে বাতাস হয়ে উঠল ভারি। সেই দুর্যোগের রাত্রিতে লক্ষ্মী রায়-বাড়ির চোর কুঠুরীতে চিরকালের জন্য হলেন বন্দিনী। বলাবাহুল্য এই অলৌকিক কাহিনীর একটি প্রবল অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে গল্পটির উপসংহারে। বাস্তবের রূঢ় আলোকে দীর্ঘকালের সংস্কারের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে—বন্দিনী কমলা পরিণত হয়েছেন নরকঙ্কালে ও একরাশ বিবর্ণ চুলে। 'ডাইনী' গল্পটির মতো এখানেও কিংবদন্তী ও সংস্কারই এর ভিত্তিমূল রচনা করেছে।

কিন্তু এই জাতীয় গল্পে তারাশঙ্করের সবচেয়ে কৃতিত্ব অলৌকিক পরিবেশের ভীতি-শিহরণ রচনায়। এই প্রসঙ্গে 'এক রাত্রি' গল্পটির কথা মনে পড়ে। জনহীন প্রান্তরে একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি প্রাচীন দেবালয় ও তার জীর্ণ নাট-মন্দির। নির্জন দেবস্থানটি ঘিরে রচিত হয়েছে নানা উপকথা—'দেবীর খলখল হাসিতে, ভৈরবের ছম ছম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক শকুনের আনন্দ-ধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও

শিহরিয়া উঠে, গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে।' এই নির্জন দেবভূমির ভীতিসঙ্কুল রহস্যাচ্ছন্ন পরিবেশটিকে লেখক কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখাবিন্যাসে ঘনিয়ে তুলেছেন :

এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দরূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁর ঝিল্লি, ছোট পেচার কুঁক কুঁক শব্দ, বড় পেচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্মর-শব্দ দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি, সকলের উপর সুদীর্ঘ গাছগুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাথার শব্দ-সমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। (পৃ. ২৪২-২৪৩)

এই রহস্যাচ্ছন্ন পরিবেশে দুই সন্ন্যাসীর বিচিত্র কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে একটি রহস্যময় গল্পের কাঠামো তৈরী হয়। গল্পটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নয়, গল্প না বলে বোধ হয় গল্পের একটি স্কেচ বলাই অধিকতর সঙ্গত। রূপলাল ও কার্তিক—গল্প বর্ণিত দুটি চরিত্র। তরুণ সন্ন্যাসী চলেছেন উত্তর মুখে—হিমালয়ের দিকে রূপলালেরই সন্ধানে। আর প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলেছেন দক্ষিণে—সমুদ্রবেষ্টিত আন্দামানের দিকে, যেখানকার জেলে আছে কার্তিক। অথচ ঐ দুজনে এক রাত্রিতে নির্জন দেবস্থলীতে কত কাছাকাছিই না এসেছিল! ছোটগল্পের অতর্কিত ইঙ্গিতময় পরিসমাপ্তি এখানে একটি অর্থগূঢ় সঙ্কেত বহন করেছে। বলার চেয়ে না বলাই এখানে বেশী। অব্যক্ত অংশটুকু পাঠকচিত্তে রচিত হতে পারে, সে অবকাশ লেখক এখানে দিয়েছেন।

তারাশঙ্করের শিল্পীপ্রকৃতির মধ্যেই কোথায় একটি গভীর অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা আছে। মানুষের প্রতি কথনো তিনি বিশ্বাস হারান নি, তাই যাদের কোথায়ও স্থান হয় নি, তারাও তাঁর সহানুভূতি পেয়েছে, কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তিনি ভাবাতিশয্যে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন না কখনো। এইখানেই তাঁর শিল্পীমনের যথার্থ পৌরুষ। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়, আপন প্রবৃত্তির জ্বলন্ত লাভাস্রোতে দগ্ধ হয়; শিল্পী তারাশঙ্কর তাদের বেদনা উপলব্ধি করেন, কিন্তু প্রতিকারহীন জীবন-নিয়তির অলজ্ঘ্য সত্যটিকেই দ্বিতীয় বিধাতার মতো তুলে ধরেন। এই অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততাই তাঁর শিল্পীজীবনের প্রত্যয়কে এত গভীর করেছে। তাই তাঁর বস্তুকে ভেদ করে জীবনের মূলে

প্রবেশ করার শক্তি অসামান্য। জীবন-নিয়তির স্বরূপ যিনি জানেন, তাঁর পক্ষেই একমাত্র সহানুভূতিশীল হয়েও নির্মম হওয়া সম্ভব।

'না' গল্পটি তারাশঙ্করের সংহত শিল্পকুশলতার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পূর্বকাহিনী বর্ণনাই এখানে দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে। ব্রজরাণীর সাক্ষ্যের দিনটিতেই গল্পটিব সমস্ত বক্তব্য যেন একটি শব্দকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎরেখার মতো প্রদীপ্ত হয়েছে। 'না'—ব্রজরাণীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরমালার উপরেই গোটা গল্পটি অপরূপ ভাবসাম্যে স্থাপিত হয়েছে। কালীনাথ-অনন্ত প্রসঙ্গ দীর্ঘতর হলেও, তাকে গল্পের বহিরঙ্গ বা পূর্বকাহিনী হিসেবে নির্দেশ করা যায়। আসল গল্প ব্রজরাণীর সুকঠিন ব্যক্তিত্বে ও অন্তর্জীবনের অবরুদ্ধ ভাববৃত্তিতে। স্বামীহন্তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে দীর্ঘ আটবছরব্যাপী প্রতীক্ষা করেছে। স্বামী হত্যাকারী মামাতো দেবরের বিচার হবে। সেইদিনের দিকে চেয়ে সে চুলে তেল দেয় নি। কিন্তু ব্রজরাণীর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই এই আটবৎসরে গভীর পরিবর্তন ঘটেছে—সদাহাস্যময়ী কল্যাণী বধূ এক নির্বাক নিস্পন্দ পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। অনন্তর পিতা ও শ্বশুরের আবেদনকে সে নির্মমভাবে প্রত্যাখান করেছে। ব্রজরাণীর ছেলের ভবিষ্যৎ সংস্থানের প্রস্তাব যখন এল, তখন সে দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছে—না।

কিন্তু আদালতে একটি বিশেষ মুহূর্তে তার মনে গভীর পরিবর্তন ঘটে গেল। ব্রজরাণীর স্মৃতিসূত্র ও অনন্তর স্মৃতিসূত্র কোনো এক বিন্দুতে সমন্বিত হয়ে এক গভীর বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। ব্রজরাণীর মমতা ও অনন্তর আবেগ-উদ্বেল সশ্রদ্ধ মনোভাব এখানে একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছে। স্বামীহন্তার সব অপরাধ অস্বীকার করে ব্রজরাণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'না'। দীর্ঘমন্থর গল্পটি ঐ একটি বিন্দুতে এসে যেন সংহত হয়েছে। সেই মুক্তা-নিটোল ভাববিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দুটি যন্ত্রনাজর্জরিত হৃদয়ের সবচেয়ে বড় সত্য ও সবচেয়ে গভীর অনুভব। এই অসাধারণ গল্পটিতে ব্রজরাণীর কণ্ঠনিঃসৃত 'না'-এর তিনটি স্তর : প্রথম স্তর—দৃঢ়তার ও সঙ্কল্পকঠোর মনের। দ্বিতীয় স্তর—ক্ষমার। তৃতীয় স্তর—গভীর প্রশান্তির। এই একটি মাত্র কথার অবিচলিত ভারসাম্যেই গল্পটির শিল্পমূর্তি রচিত হয়েছে। মন্থর কাহিনীটির চকিত পরিসমাপ্তি, রঞ্জন রশ্মির তীক্ষ্ণ আঘাতে যেন গল্পটির মর্মমূলকে পর্যন্ত বিদ্ধ করেছে।

'দেবতার ব্যাধি' তারাশঙ্করের আর একটি অসাধারণ গল্প। মানব-নিয়তির যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের প্রধান জিজ্ঞাসা, এই গল্পে তা তীক্ষ্ণতর

রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডাক্তার গরগরি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বহু আপাত-বিরোধী ভাববৃত্তির উপকরণে তার চরিত্রটি রচিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্রটি গল্পের শেষদিকে ডাক্তারের স্বীকৃতির মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবন-সাধনায় মানুষকে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এই দ্বন্দ্বে যদি সাধক তাঁর সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হন, তাহলে আর উপায় থাকে না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই তীব্র দ্বন্দ্বে একবার প্রবৃত্তির অন্ধলীলার কাছে দাসখত লিখে দিলে মানুষের আর নিষ্কৃতি থাকে না। এই অন্ধ প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ গতি ঘূর্ণিস্রোতের মতো প্রবলতম আকর্ষণে ক্রমশ নিচের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষের মধ্যে মহাশক্তিরূপিণী তমস্বিনী সরীসৃপ-প্রবৃত্তির যে মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ডাক্তার গরগরির স্বীকৃতি থেকেই তার চমকপ্রদ পরিচয় পাওয়া যায় :

> সেই যে জাগল ক্রূরপ্রবৃত্তি, তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু আর আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে বহুভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের মর্মর খণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্মপ্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা দিয়ে। মাস্টার মশাই শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে—মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহু ক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই তার আছে। দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনোক্রমেই নিস্তার নাই। (পৃ. ১৬০)

দ্বন্দ্ব জর্জরিত অসহায় মানুষের এই আর্তি তীক্ষ্ণতায় ও জ্বালাময়তায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার গরগরি তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র।

নির্মমতায় ও কুটিল আয়রনির মর্মান্তিকতায় বাংলা সাহিত্যে 'অগ্রদানী' তুলনাহীন। উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর কৌতুককর কাহিনীই এখানে নির্মম আয়রনিতে পরিণত হয়েছে। আহার সম্পর্কে চক্রবর্তীর কোনো বাছবিচার ছিল না। ছেলেরা যখন বিভিন্ন লোকের বাগানে গিয়ে আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফল আহরণ করত, লোভী চক্রবর্তী ফলের লোভে তাদের সঙ্গে যোগ দিত—মৌমাছি-বোলতার আক্রমণও তাকে নিরস্ত করতে পারত না। পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতে যত সামান্যই ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হোক না কেন, চক্রবর্তী সেখানের আবির্ভূত হবেই। কিছু জমি ও

সিংহবাহিনীর প্রসাদের বিনিময়ে সে তার সদ্যোজাত পুত্রকে বিক্রয় করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। প্রাপ্তির আশায় জমিদার-গৃহিণীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হয়ে নিজের ছেলের কাছ থেকে পিণ্ড নিতে হল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নির্মম নিয়তির কঠিন প্রত্যাদেশে মতো নিজপুত্রের পিণ্ডও তাকেই দেখতে হয়েছে—'শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল—খাও হে চক্রবর্তী।' গল্পটি তীক্ষ্ণতায় ও বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত উপসংহার নিয়তিরই অট্টবজ্রহাস্যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

'তিনশূন্য' আর একটি নির্মম-বীভৎস কাহিনী। গল্পটির প্রথমেই দুর্ভিক্ষের যে নগ্ন বীভৎস মূর্তি আছে তা যেমন বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনে সুস্পষ্ট, তেমনি গল্পটিরও একটি চিত্র-প্রতীক হয়ে উঠেছে। লোভ-লালসার এমন আদিম ও হিংস্ররূপ তারাশঙ্করের আর কোনো গল্পে নেই। অন্যত্র তিনি পশুকল্প মানুষ এঁকেছেন, কিন্তু এখানে এঁকেছেন পশুই। দুর্ভিক্ষের সন্তান, বিকৃত ব্যধি ও অসুস্থ মনোবিকারের বংশধর বিকলাঙ্গ ন্যালা—'চোখে পিচুটি, অবিরাম বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে ; মুখে ভাষা নেই, রব আছে, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা।' নিয়তির নিগূঢ় সঙ্কেত উপসংহারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে একটি অর্থদ্যোতনায় ভরে ওঠে।

১০

'তিনশূন্য' গল্পে যেমন তারাশঙ্কর নির্মম অনাসক্তির চরম পর্যায়ে এসে পৌছেছেন তেমনি 'বোবা কান্না' গল্পে মানুষের বেদনার্ত অনুভূতি আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করেছে। মহামারী ও মন্বন্তরের ব্যাপক পটভূমির উপরে গল্পটি রচিত হয়েছে। এই জাতীয় বর্ণনায় তাবাশঙ্করের দক্ষতা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য ও মিহির মুখার্জির দ্বন্দ্ব কাহিনী দিয়ে কাহিনীটির সূত্রপাত। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চণ্ডীমায়ের পূজারী, তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি ঐশ্বরিক মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে। মিহির মুখার্জি ডাক্তার, আধুনিক বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। এখানেও সেই পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব—'জলসাঘর', 'পিতা-পুত্র', প্রভৃতি গল্পে যাব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাহিনীটি বিচিত্র ভাবানুষঙ্গে বিচলিত হয়েছে। আনু ঠাকুরের তরুণীর বধূর বোবা কান্না ও শশী ডোমের আত্মহত্যা মহামারী বিবর্ণ কাহিনীর উপরে একটি অশ্রুগম্ভীর ছায়াবিস্তার করেছে। দাগী চোর শশী ডোমের হৃদয়ের অন্তস্তলে এক মমতা-মধুর গোপন উৎসকে লেখক এখানে আবিষ্কার করেছেন।

'সন্ধ্যামণি' করুণ রসের গল্প। সন্তান-বাৎসল্য সম্পর্কিত কয়েকটি গল্পের কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রসাস্বাদনে এই গল্পটির একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। কুসুম মাদুর বোনে, এই তার জীবিকা। এক ভবঘুরে স্বামী ছাড়া তার কেউ নেই। তিন-চার বছরের এক মেয়ে ছিল—সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হল তার মৃত্যু হয়েছে। মেয়েটির মৃত্যুর পর কুসুমের কাছে তার স্বামী কেনারামও বিশেষ আসে না। কিন্তু তারাশঙ্কর সুকৌশলে এই দৈবাহত দম্পতির অন্তর্বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। কেনারাম চাটুজ্জে ভবঘুরে উদাসীন জাতীয় মানুষ। শ্মশানে সে বসে, শ্মশান-চণ্ডাল পৈরুর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, কুকুরের বাচ্চাটির প্রতিও তার মমতার অন্ত নেই। কিন্তু উদাসী মনের গভীরে আছে শোকার্ত পিতৃহৃদয়:

> চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায় জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জল জল করে ভাসে। (পৃ. ৫১৮)

দুটি শোকাহত নর-নারীর মৌনবেদনাকে লেখক করুণ ও কোমল রেখায় রূপ দিয়েছেন। মানবহৃদয়ের গভীর ও নিস্তরঙ্গ শোকসমুদ্র এখানে এক অশ্রু-গম্ভীর ধ্রুপদী মহিমা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত শোকই এখানে চিরন্তন শিল্প-গরিমার করুণ-লাবণ্যে মণ্ডিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের পরিণত শিল্পপ্রজ্ঞা জীবনের জটিল জিজ্ঞাসার সমাধান করতে চেয়েছে। 'শেষকথা' গল্পে এই নতুন ভুবনে উত্তরণের সংকেত আছে। গল্পটিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। সংঘাত নয়, বিরোধ নয়—সেপথে জীবনের সত্য নেই, পরিপূর্ণতা নেই। জীবনের পূর্ণতা ক্ষমায়, ভালো-বাসায়। নিরক্ষর সনাতন এক সময় সহজে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু বুড়ির মৃত্যু এক মাধুর্যমণ্ডিত পরম পরিণাম, এ মৃত্যু যথার্থই 'শ্যাম সমান।'—

> চোখে জল টলমল করেছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ি, কি বুলছ, বল?
>
> —মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।
>
> বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়ল বুড়ির কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ি বললে, না

থাক। (পৃ. ৮৪৫)

এই উপলব্ধিই শিল্পী তারাশঙ্করের চরম উপলব্ধি। দগ্ধ-তাম্রাকাশের রৌদ্রদুঃসহ বৈশাখী চেতনা হেমন্তসায়াহ্নের নিবিড় প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। সমস্ত দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে সেখানে ক্ষমার স্নিগ্ধতা ও প্রীতির মহামন্ত্র; সেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণাজর্জর মানুষের দেহ শুধু নিয়তিই নয়, সুন্দরেরই নামান্তর মাত্র।

তারাশঙ্করের রচনা-শিল্প ও আঙ্গিকের আলোচনা করলেও তাঁর শিল্পী-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনোধর্মের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে স্বভাবকবিদের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সুন্দর-অসুন্দর সব কিছু মিলিয়ে জীবনের যে রহস্যরস উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে কোনো সচেতন শিল্পপ্রয়াস নেই। তারাশঙ্কর কাহিনী রচনার মধ্যে সেই জীবনকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনোরূপ চাতুর্য ও টীকা-ভাষ্যও সংযুক্ত করেন নি। এক বস্তুনিষ্ঠ ও অনাসক্ত দ্রষ্টার আসনেই তিনি উপবিষ্ট। জীবনের কোনো অংশকেই তিনি কলাকৌশলের যত্নকৃত আভরণে সাজাতে চান নি, কারণ তাতে এই বস্তুনিষ্ঠ জীবনশিল্পের মহিমাই ক্ষুণ্ণ হত। যে সহজ-প্রবল জীবনের তিনি রূপকার, সেই জীবনের ভঙ্গিটিই যেন তাঁর স্টাইলের কাঠামো রচনা করেছে।

আধুনিক যুগের ছোটগল্পে বাইরের ঘটনাকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সহজ বিবৃতির পথ ছেড়ে ছোটগল্প তির্যক ভাষণ ও সঙ্কেতের পথ ধরেছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি প্রধানত দীর্ঘবিন্যস্ত ও বিবৃতিধর্মী। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দীর্ঘ বিবৃত ও ঘটনা বিন্যাসের এমন অবকাশ থাকে, যা সহজেই উপন্যাসের শিল্পরূপ গ্রহণ করতে পারে। আধুনিক ছোটগল্পের অতিসূক্ষ্ম শিল্পরূপ কোথাও কোথাও ব্যাহত হলেও, জীবনকে দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিস্মিত করে। মোপাসাঁ-পূর্ববর্তী যুগের ফরাসী সাহিত্যে বিলম্বিত লয়ের বিবৃতিধর্মী 'টেল্'-জাতীয় আখ্যায়িকাই খ্যাতি লাভ করেছিল। ব্যালজাক মেরিমের মতো গল্প-লেখকরাও আধুনিক গল্পের মাপকাঠিতে 'টেল্' রচয়িতা। কিন্তু জীবন রসিকতায় ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণদক্ষতায় তাঁদের গল্পগুলি ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনা পাঠকের কাছে সেই চিরন্তন প্রশ্নটিই নূতনভাবে ধ্বনিত করেছে: 'Life is greater than Art', ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: 'তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন যতটা জীবন রসের রসিক।'[১৮]

১৮. বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (২য় সং) পৃ. ৪৫।

তারাশঙ্করের ভাষা ও স্টাইল কলাকৌশল বর্জিত—সহজ, সরল, অতির্যক ও বলিষ্ঠ। বীরভূমের রুক্ষ ধূসর মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁর ভাষার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : '...আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায়—রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হই নি। সে শক্তি বোধ হয় আমার নেই এবং সে চর্চা করার ঝোঁকও আমার জাগে নি।'[১৯] তাঁর শিল্প-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন মহাকাব্যের একটি মিল আছে। মহাকাব্যের বস্তু-নিষ্ঠতা ও সরলতা ব্যক্তিবিশেষের যত্নকৃত রচনা বলে মনে হয় না। স্বক্ষেত্রে তারাশঙ্করের রচনার মধ্যেও যেন এর কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের গল্পমালা বিশাল বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মূল মানবজীবনের সেই আদিম মহাশক্তিস্বরূপিণী ধাতু-প্রবৃত্তির উৎস কেন্দ্রে নিহিত, তাদের পত্র-পল্লবে রাঢ়ভূমির উত্তপ্ত ধূলি ; জ্বালাময় আকাশের রৌদ্ররসে তারা সমৃদ্ধ। আঙ্গিকের দুর্বলতা, শিল্পগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সেখানে বড় কথা নও—কারণ তারা বিলাসী ধনীর টবের গাছ নয়। বনস্পতির পক্ষে বিশেষ পত্র-পল্লব চোখে পড়ে না—সবটুকু মিলিয়েই তার সম্রাটসুলভ মহিমা ও আভিজাত্য। তাঁর গল্পে মানুষ বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, ক্ষত-বিক্ষত হয় বেদনায় কাঁদে, ভালোবাসে ও ভালোবেসে মরে—এ সবের বহু ঊর্ধ্বে এক অনাসক্ত দ্রষ্টার দুটি চোখ জেগে থাকে। একটি চোখে করুণা ও বেদনার ম্লানিমা আর একটি চোখে মহাকালের উদ্যত শাসন—অসহ্য ও মর্মান্তিক তার ধাতব দীপ্তি।

গল্পকার তারাশঙ্করের মর্মলোকে এই ভাবমূর্তিরই প্রতিষ্ঠা।

---

১৯. আমার সাহিত্য-জীবন (১ম পর্ব) পৃ. ২২।